নতুন

নচিকেতা অমনিবাস

পত্র ভারতী

নতুন

নচিকেতা অমনিবাস

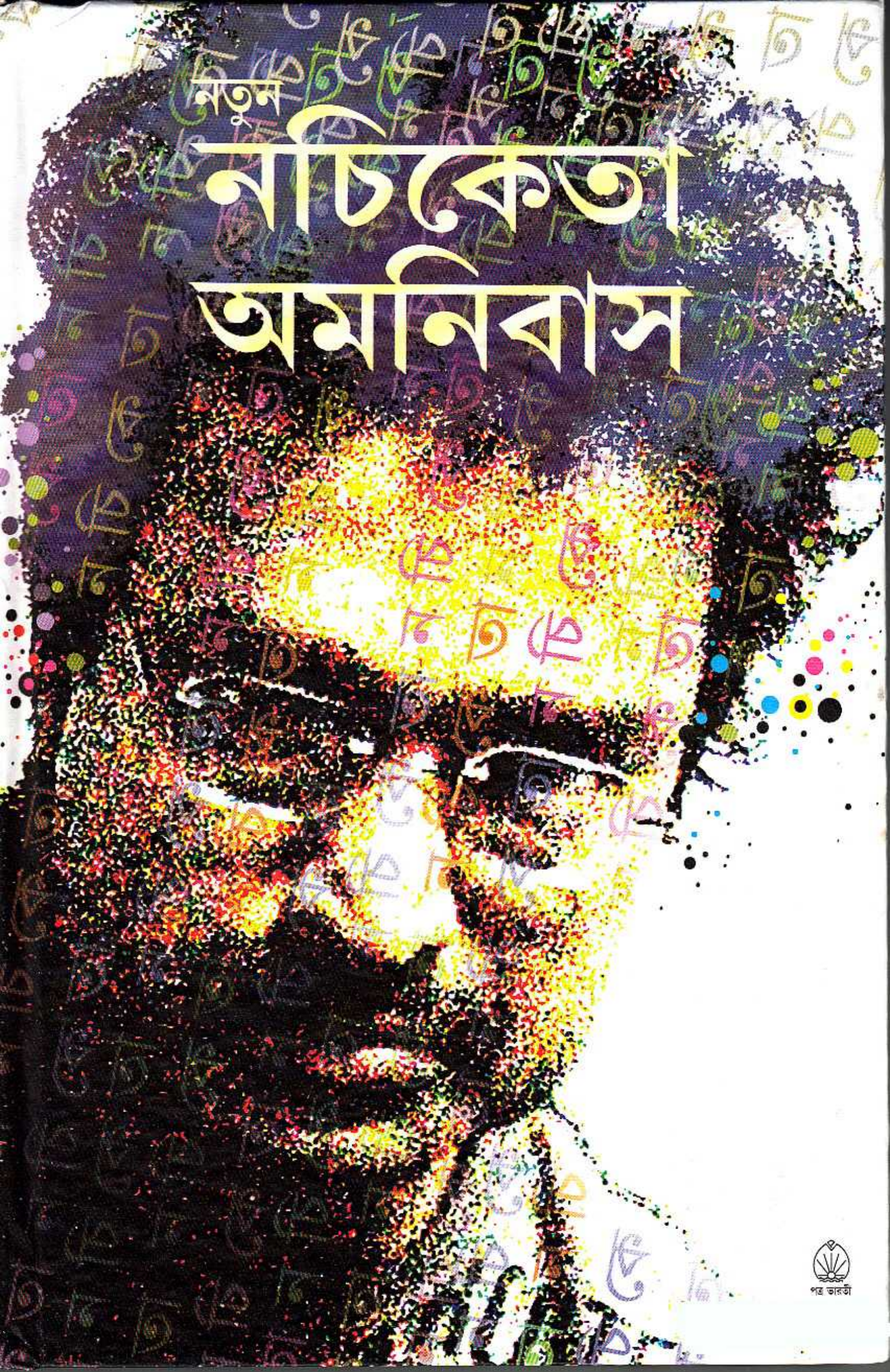

পত্র ভারতী

নচিকেতার সেরা সংকলন

২ উপন্যাস

১১ গল্প

৬ রম্যরচনা

একগুচ্ছ গান

জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, কলকাতায়।
পড়াশোনা করেছেন উত্তর কলকাতার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে। ছোটবেলা থেকেই গান লেখা শুরু, সেই সঙ্গে নিজের মতো করে গানের চর্চা।
প্রথম অ্যালবাম 'এই বেশ ভালো আছি' প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে এবং বেরোনোমাত্র অভাবনীয় সাড়া পড়ে যায়। নচিকেতা চক্রবর্তী মুহূর্তে হয়ে যান নচিকেতা।
এরপর শুধু সাফল্যের ইতিহাস। পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কখনও। সবচেয়ে প্রিয় গান 'নীলাঞ্জনা (৩য়)'।
এ পর্যন্ত প্রায় তিনশো গান রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন। লেখা-লেখির ক্ষেত্রে জ্যাক লন্ডন-এর লেখা পড়ে প্রথম অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ ছাড়া মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্র তাঁকে প্রভাবিত করে। গল্প লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
'লেখক' নচিকেতার গল্পের বৈশিষ্ট্য, তিনি গল্পে পারতপক্ষে নারী চরিত্র রাখতে চান না।
নচিকেতা বঙ্গভূষণ, সঙ্গীতভূষণ ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারি অনেক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে ওসবের কোনও মূল্য নেই। সবচেয়ে বড় সম্মান, নচিকেতা বলেছেন, 'এখনও টিকে আছি।'

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

গান লেখা আর গান গাওয়া যাঁর সহজাত প্রতিভা, তাঁর কলমে যেসব গল্প-উপন্যাস তৈরি হয়েছে তা পড়ে অনায়াসে বলা যায় নচিকেতা যদি গায়ক না হতেন, যদি গান না লিখতেন, তাহলেও গল্পকার বা ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলাসাহিত্যে নিজের স্থায়ী জায়গা করে নিতেন।
পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত এই নতুন সংকলনের দুটি উপন্যাস, এগারোটি গল্প, ছয়টি রম্যরচনা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা পড়ে তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি লেখেন, 'নচি, তুমি লেখা ছেড়ো না।...'
এইসব গদ্য-সাহিত্যের পাশাপাশি অবশ্যই সংকলিত হয়েছে নচিকেতার বাছাই করা বেশ কয়েকটি বিখ্যাত গান।

নতুন

নচিকেতা অমনিবাস

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ
জুন ২০১২

NOTUN NACHIKETA OMNIBUS
COLLECTION OF WRITINGS
by
Nachiketa Chakraborty

ISBN 978-81-8374-073-9

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোকচিত্র
চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

মূল্য
১৮০.০০

সঙ্গে সিডি 'আমার প্রিয় গান'

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 180.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আমার দেখা শেষ অ্যাটলাসকে
উৎসর্গ করলাম, যে তার ছোট
পৃথিবীর বোঝাটা নিয়ে
দাঁড়িয়ে ছিল আজীবন অনড় হয়ে—
আমার বাবা

অ ম নি বা সে আ ছে

গল্প

শর্টকাট ১১

পণ্ডশ্রম ১৬

অদ্বৈত ১৯

স্বোপার্জিত ২৮

ছায়াজগৎ ৩৪

আগুনপাখির আকাশ ৪৯

ঘুম ৭০

সাপলুডো ৭৬

অভিযোজন ৮৪

যমের অরুচি ৯৩

অস্তাচলের দুর্গ ৯৯

রম্যরচনা

আমার দেখা সবচেয়ে বড় গণেশ হল পলিটব্যুরো ১০৯

'এজ্ঞে, দু-গালে চড় মারার পর...' ১১২

সুভাষদা জিতে গেলেন ১১৪

অমল রুদ্র ১১৭

I LUV কখগ > 1111 ১২১

চাপে ছোট মাপে বড় ১২৪

উপন্যাস

ক্যাকটাস ১২৯

জন্মদিনের রাত ১৫১

গান

লাল ফিতে সাদা মোজা (নীলাঞ্জনা ১) ১৬৯
দেখে যা অনির্বাণ ১৭১
কোনো এক উলটোরাজা ১৭৩
যেদিন তুমি ভালোবেসেছিলে নিঃস্বার্থ (পৌলমী) ১৭৫
বারোটায় অফিস আসি (সরকারি কর্মচারী) ১৭৭
রাজশ্রী তোমার জন্য (রাজশ্রী ১) ১৭৯
জনতা জনার্দন (জীবিত বিবাহিত) ১৮১
ছেলে আমার মস্ত মানুষ (বৃদ্ধাশ্রম) ১৮৩
তুমি আসবে বলেই ১৮৫
ও ডাক্তার ১৮৭
আদিত্য সেন ১৮৯
আমার সোনা ১৯১

গল্প

শর্টকাট

প্রচণ্ড গরমের দুপুর। ঝিম ধরে আছে বাতাস। রাস্তায় ছাতা মাথায় কিছু মানুষ যদিও পথ চলছে। কিন্তু চলার ইচ্ছে নেই যেন। বাসের চাকারা কিন্তু অবিরাম রাজপথের পিচের ওপর জটিল গণিতের সমীকরণ তৈরি করে চলেছে।

মনে হল লোকটা সেই সমীকরণই জানতে একছুটে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটা বাসের চাকা তার রক্ত আর পিচের মাঝখানে আর-এক নতুন সমীকরণ লিখল।

হইহই করে একদল মানুষ ছুটে গিয়ে বৃত্ত বানাল। বিশুও তাদের মধ্যে ছিল—লোকটা রক্তমেখে পড়ে আছে—আধময়লা একটা পাজামা—আর সারা মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—বয়েস বোঝা মুশকিল। লোকটাকে ধরাধরি করে একটি অনিচ্ছুক ট্যাক্সিতে তোলা হল। দু তিনজন লোকের সঙ্গে বিশুও তাতে উঠে পড়ল।

আর জি কর হাসপাতাল। লোকটাকে এমারজেন্সিতে ভরতি করে দেওয়া হল। এবারে কাজ শেষ। উদ্ধারকারী মানুষেরা একে-একে সটকে পড়ল। বিশুর কেমন যেন মনে হল শেষ না দেখে যাবে না।

বিশু অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধে নামল মন্থর গতিতে। বিশু এগিয়ে যায় এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিকে। একজন জুনিয়ার ডাক্তার বিরক্তি সহকারে অন্য একজনকে চার্জ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তার ডিউটি শেষ।

বিশুকে দেখে চিনতে পারে। বলে, 'ও, তোমাদের আনা লোকটা আজ রাতটাও টিকবে না।'

বিশু চুপ করে থেকে বলে, 'একটু দেখে আসব?'

ডাক্তারটি বলে, 'যাও।'

খাটের চারপাশে নানান নল, লোকটার সারা শরীরে ব্যান্ডেজ। লোকটা চোখ বুজে আছে, বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। লোকটার গোটা চেহারা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতার ছবি। অনেক জীবনযুদ্ধের চালচিত্তির মুখের রেখায়।

একসময় লোকটা চোখ খোলে। সে-চোখ নির্ভয়। দ্বিধাহীন। লোকটা যেন

বুঝতে পারছে—সে এসে গেছে। এবার হাত বাড়াচ্ছে—এবার এক অনন্ত যাত্রা। বিদায় জানাতে আসা সঙ্গীর দিকে ট্রেন ছাড়ার আগে ট্রেন-যাত্রী যেমন তাকায়—বিশুর দিকে লোকটা তাকাল।

বিশু প্রশ্ন করল, 'কেন এমন করলেন?'

লোকটা অনেক কষ্টে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'শর্টকাট।' তারপর চোখ বুজল।

বিশুদের একটা দোকান ছিল মনিহারি জিনিসের। বাবা-ই দেখাশুনো করত। একটা বাড়িও ছিল—উড়াল পুল হতে গিয়ে ভাঙা পড়েছে। আর দোকানটা চলত না, কারণ, পাশেই একটা শপিং মল হয়ে গেল। আজকাল মানুষের কাছে দ্রব্যগুণের চেয়ে ব্র্যান্ডটাই কাম্য। বাবা মারা গেলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, আর দুই বোন। বড় বোনটার সঙ্গে নিতাই-এর একটা সম্পর্ক হয়েছে।

নিতাই ট্যাক্সি চালায়। বিয়ে করলে হয়। ছোট বোনটার পড়াশুনো ছাড়ানো হয়েছে খরচ বাঁচাতে। বিশু একটা ঘড়ির দোকানে কাজ করত। পরশুদিন চাকরিটা গেছে। বাড়িতে কেউ জানে না। বিশু দুটো দিন ধরে চেনা-অচেনা সবার দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কাজের সন্ধানে। এখনও পর্যন্ত কোনও ফল পেল না।

বিশু হাঁটতে-হাঁটতে বেলগাছিয়ায় এগোয়। একটা মিষ্টির দোকানের শো-কেসে নিজের ছায়া দেখে চমকে ওঠে সে। এ যেন হাসপাতালের বেডে শোওয়া লোকটা। সারা শরীরে প্রকাণ্ড এক ব্যর্থতার ছবি। মুখের রেখায় যন্ত্রণার চালচিত্তির।

বিশু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কী যেন বলেছিল লোকটা? শর্টকাট। শব্দটা বিড়বিড় করতে-করতে বিশু বেলগাছিয়া ব্রিজের ওপর পৌঁছোয়। নীচে তাকায়। ট্রেন লাইন। দূরে একটা মালগাড়ি আসছে।

বিশু বিড়বিড় করে, 'শর্টকাট'। অনেকক্ষণ ধরে শব্দ করে মালগাড়িটা ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে যায়। বিশু নিজেকে আবিষ্কার করে সে তখনও ব্রিজের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। রাত বাড়ছে—পুলিশ লরি ছাড়ছে। হাত বাড়িয়ে পয়সার বিনিময়ে। বিশু বিড়বিড় করে, 'শর্টকাট'।

রাতে কুপির আলোয় মা বিশুকে খেতে দিচ্ছে চারটে রুটি আর ঢ্যাঁড়স ভাজা।

মা বলে, 'অঞ্জুর একটু রাত হইব। নিতাই-এর লগে সিনেমায় গেছে।'

বিশু চুপ করে রুটি চিবোয়। মা বলে চলে, 'নিতাই পোলাডা খারাপ না। মঞ্জুর লেইগা একখান ফ্রক আনসে—আমারেও একখান শাড়ি দিছে। কইতেছিল অঞ্জুরে কী একখান চাকরি দিবে।'

বিশু ভালোভাবেই বুঝতে পারে নিতাই কী চাকরি দিতে পারে। সে চুপ করে খাবার খায়।

মা বলেই চলে, 'আমি কইলাম বিশুরে না জিগাইয়া মত দি কেমনে। নাইট ডিউটি করতে হইব যে।'

বিশুর মুখে একটা অসহায় হাসি ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে সে, 'শর্টকাট'।

গরমকালের দুপুরবেলাটা সেই মানুষগুলোর কাছে অসহ্য—যাদের সারাদিন খাওয়া হয় না, হাতে ছাতা থাকে না, আর গোটা শরীরে যাদের প্রকাণ্ড ব্যর্থতার চালচিত্তির ছায়া ফেলে। এরকমই একজন বিশু। একটু আগেই একটা কাপড়ের দোকান থেকে কাজ চাইতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বাসের চাকা অবিরাম পিচ-রাস্তায় জটিল গাণিতিক সমীকরণ লিখে চলেছে। বিশু দেখতে পাচ্ছে। বিশুর মনে হচ্ছে এসব অঙ্ক ভুল। নতুন সমীকরণের প্রয়োজন। এ-অঙ্কের ফল পেতে অনন্তকাল অপেক্ষার প্রয়োজন।

ঠিক তক্ষুনি বিশুর মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা শব্দ উঁকি দিল—'শর্টকাট'। বিশু একছুটে রাজপথের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

আবেশ একজন সাহিত্যিক। কবি বলাই ভালো—আগে কবিতা-টবিতা লিখত। বুঝুক-না-বুঝুক লোকে বেশ মান্যিও করত।

কিন্তু বাদ সাধল জীবনমুখীরা এসে গিয়ে। প্রকাশকেরা বলল, 'এখন রিয়ালিস্টিক লিটারেচারের যুগ। ওসব আঁতলামির দিন শেষ। জীবনের চরম নগ্ন সত্যি কথা দু-চার গাছা লিখে আনুন তো বুঝি।'

আবেশ তখন থেকেই একটু ফাঁপরে পড়েছে। জীবনের নগ্ন দিক বলতে শুধু খারাপ সিনেমাই দেখেছে সে। দক্ষিণ কলকাতায় পৈত্রিক সূত্রে যে-বাড়িতে সে থাকে সেখানে খুব একটা চরম জীবনযুদ্ধের ছবি সে দেখতে পায়নি। এখানে শুধু 'হ্যালো, হাই' কালচার। সে-কালচারে সে বড় হয়েছে। কিন্তু কিছু তো লিখতে হবে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু হল না। তার কবিতা লেখার গুরু প্রফেসর অর্ণব সেন বললেন, 'পথে নামো। মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াও।'

আবেশ ঠিক করল পথেই নামবে। পথপ্রদর্শক হিসেবে পাওয়া গেল নান্টাদাকে। নান্টাদার একটা ভ্যানরিকশা আছে। দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি-বাড়িতে কর্পোরেশনের জল বিক্রি করে। এক এক জার পাঁচ টাকা।

কর্পোরেশনের জল ছাড়া নাকি ডাল সেদ্ধ হয় না। কাচলে জামাকাপড় সাদা হয় না। আবেশদের গ্যারেজেই সে ভ্যান রেখে বাড়ি-বাড়ি জল দেয়। এর জন্য

আবেশকে সঙ্গে নান্টাদা একটু সমীহ করে চলে। নান্টাদা আবেশের প্রস্তাব শুনে তো অবাক।

'আরে আপনি আমার সঙ্গে ঘুরবেন? আমাদের জীবনে আছে কী লেখার মতো?'

আবেশ নাছোড়বান্দা। অবশেষে ১০০ টাকার বিনিময়ে নান্টাদা রাজি হল। সে ইস্তক একমাস আবেশ ঘুরেই চলেছে। জীবনসংগ্রামের নগ্ন ছবির সন্ধানে।

সল্টলেকের পিছনদিকে নিউ টাউনশিপের রাস্তাটায় খুব বেশি গাড়ি চলে না। গরমকালের দুপুরবেলায় বেশ কম। একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকানে আবেশ বসে ঘাম মুছছে। নান্টাদা একটা হাফ পাঁইট বাংলা মদ খেয়ে চারুর দোকানে মাঝবয়েসি কালো বউদিটার সঙ্গে রসিকতা করছে। এই গরমে উলটোদিকে একটা সাইকেল সারাই-এর দোকানে দুজন ছেলে একটা চাকার রিম সোজা করছে। এ-পাশে একটা পানবিড়ির দোকান। দুজন ছেলে একটা বড় খাতা নিয়ে কীসব লিখছে।

একটু দূরের দিকে একটা খাবারের ঝুপড়ি দোকান। বাইরে কদর্য হাতের লেখায় লেখা 'ডিম-ভাত ৬ টাকা'।

মাঝে মাঝে গাড়ির চাকা রাস্তার পিচের ওপরে জটিল গাণিতিক সমীকরণ লিখে যাচ্ছে। আবেশ মোহাবিষ্ট মানুষের মতো একদৃষ্টে পিচ-রাস্তার দিকে তাকিয়ে জটিল সমীকরণে ডুবে যায়। হঠাৎই সে দেখতে পায় একজন মানুষ একছুটে পিচ রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা কোয়ালিস এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। হইহই করে প্রায় গোটাপঞ্চাশেক মানুষ গাড়িটাকে ও মানুষটাকে বৃত্ত করে। আবেশ দৌড়ে যায়। রক্তাক্ত মানুষটাকে একটা ভ্যানরিকশায় তোলা হয়েছে। আর কোয়ালিস গাড়ির চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে মানুষ এই মারে কি সেই মারে। কিছু লোক ভ্যানরিকশাটা নিয়ে উলটোদিকে পিয়ারলেস হাসপাতালের পথে যেতে থাকে। আর কিছু লোক কোয়ালিসটায় উঠে বসে। লোকটাকে গাড়ি সাইড করতে বলে।

আবেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছুই বুঝতে পারে না। নিজেকে কেমন অনাহুত মনে হতে থাকে। একসময় সে এসে আবার চায়ের দোকানে বসে পড়ে। একটু পরে দেখতে পায় কোয়ালিস গাড়িতে যে-লোকগুলো উঠে পড়েছিল তারা নেমে আসে। আর গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যায়।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কীসব জটলা করে আশেপাশের দোকানের লোকেদের হাত নাড়ে। তারাও হাত নাড়ে।

পানবিড়ির দোকানে যে-দুজন ছেলে একটা খাতা নিয়ে লিখছিল, তারা ওই জটলা থেকে বেরিয়ে হাসতে-হাসতে চায়ের দোকানে এসে বলে, 'মাসি, হিসেবটা লিখে নিয়ো।'

মাসি মুচকি হাসে। নান্টাদা হাসতে-হাসতে চোখ মটকে বলে, 'কী রে কালু, কত হল?'

কালু নামের ছেলেটি হাসতে গিয়ে আবেশকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়।

নান্টাদা বলে, 'আরে এ আমার লোক, আমার জিগরি দোস্ত।'

কালু আশ্বস্ত হয়ে হেসে বলে, 'তিন হাজার। শালা বহুত কিপটে।' তারপর পাশে খাতা হাতে ছেলেটাকে বলে, 'গাড়ির নাম্বারটা ঠিক করে লিখেছিস তো। এক গাড়ি যেন দুবার না হয়, ওস্তাদের কড়া হুকুম।'

তারপর দুজনে শিস দিতে দিতে রাস্তা পার হয়ে যায়।

আবেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নান্টাদা বলে, 'কিছু বুঝলে?'

আবেশ মাথা নাড়ে।

চায়ের দোকানের মাসির চোখ চিকচিক করে ওঠে। বলে, 'ওর দয়াতেই তো আমরা সবাই বেঁচে আছি। রোজ তিন-চারটে গাড়ির সামনে ঝাঁপায়। ওর মতো কলজের জোর ক'টা লোকের আছে?'

আবেশ বলে, 'কিন্তু ওই লোকটাকে ভ্যানরিকশায় করে কোথায় নিয়ে গেল?'

নান্টাদা বলে, 'কোথায় আবার—একটু ওষুধ টসুধ লাগাতে, জামাকাপড় বদলাতে। আজ সবে দুটো হয়েছে।'

হঠাৎ সাইকেলের দোকানের বাচ্চাটা চিৎকার করে ওঠে, 'ওস্তাদ আসছে।' দেখা গেল অন্য একটা পোশাকে ভ্যানরিকশায় লোকটা আসছে। যে-লোকটাকে একটু আগে রক্তমাখা শরীরে সে দেখেছিল। লোকটার চোখের নীচে কালশিটে। কনুই দিয়ে রক্ত ঝরছিল বলে ফুলহাতা জামা পরে, মাথায় ব্যান্ডেজ। লোকজন তাকে ঘিরে ধরে ঃ 'গুরু, ঠিক আছ তো।'

লোকটা অস্ফুটস্বরে কী বলে আবেশ দূর থেকে শুনতে পায় না।

একজন বলে, 'কিন্তু মাথার ব্যান্ডেজটা?

আর-একজন বলে, 'ঝাঁপাবার আগে খুলে নেবে।'

আবেশ নান্টাদাকে জিগ্যেস করে, 'এই তাহলে ওস্তাদ? এদের সবার অন্নদাতা?'

নান্টাদা ওপর-নীচে মাথা নাড়ে।

আবেশ বলে, 'ওর নাম কী?'

নান্টাদা বলে, 'শর্টকাট বিশু।'

পণ্ডশ্রম

জয় ছুটছে প্রাণপণে। পাহাড়ের আঁকাবাকা পথ ধরে ছুটছে। কতক্ষণ ধরে সে ছুটে চলেছে, মনে মনে একটা হিসেব করার চেষ্টা করে। এবং ব্যর্থ হয়! কারণ মাথা কাজ করছে না। যে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো সে অতিক্রম করছে, তার স্মৃতিতেই মাথা আচ্ছন্ন হয়ে আছে...

ছুটে চলেছে জয়। নিজেকে তার 'Run Lola Run' ছবিটার লোলার মতো মনে হচ্ছে। গোটা ছবিটা জুড়ে Lola যেমন ছুটছিল, ওর মনে হচ্ছে সে তার গোটা জীবনটা জুড়ে ছুটেই চলেছে।

মাঝে মাঝে যে থামতে ইচ্ছে করছে না, তা নয়। ধরা পড়ে যাবার ভয়টাই তাকে থামা থেকে বিরত করছে।

সে জানে, তাকে খোঁজার জন্য তার পেছনে ছুটে আসছে সবুজ উর্দিরা। আসলে উর্দি সবুজ নয়, ওদের গায়ের রংটাই সবুজ! কেন সবুজ, সে রহস্যটাও সে জানে এখন। সূর্যদাকে সেসব জানাতেই সে এখন ছুটছে। সূর্যদাকে সবটাই জানাতে হবে। কারণ জীবনে কোনওকিছুই সে সূর্যদার কাছে আড়াল করেনি, লুকোয়নি। ভালো লাগা, খারাপ লাগা...মায় প্রথম টিউশনির টাকা অবধি।

সেই সূর্যদাকে জানাবে না, সে এখন কোথায় আছে? জায়গাটা কেমন, এখানে কী কী হয়? এখানে কারা থাকে? ভালো থাকে না খারাপ থাকে? কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব তথ্য! জানতে পারলে সূর্যদা একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

সূর্যদাকে কতদিন দেখেনি জয়। কেমন আছে কে জানে! জয়কে ছেড়ে সূর্যদা যে ভালো থাকতে পারে না, এটা জয় ভালো করেই জানে।

সূর্যদা একজন সফল গায়ক। সূর্যদার প্রথম লড়াই থেকে জয় ছিল তার সঙ্গে, ডান হাতের মতো। সবক'টা লড়াইতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গত ৩০শে এপ্রিল অবধি। কারণ ওই দিনই হতচ্ছাড়া অ্যাক্সিডেন্টটা হল! মাথায় প্রচণ্ড লেগে জয় যখন ভাঙাচোরা গাড়িটার মধ্যে পড়ে ছিল...

সবুজ উর্দিরা তাকে নিয়ে যাবার আগেও শেষবার তার মনে হয়েছিল, সূর্যদাকে মুখ দেখাব কী করে? তারপর বুঝল, সে চলে এসেছে এইখানে, এক

কথায় যেটাকে সবাই মৃত্যুলোক বলে।

এখানে এসে দিনের পর দিন সে ভেবেছে...সূর্যদাকে একলা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে ফেলে আসার জন্য সূর্যদা নিশ্চয়ই ভীষণ রেগে আছে। সত্যিই তো, সূর্যদার পাবলিক রিলেশনের কাজটা কে করবে? কেই বা সূর্যদার মুড বুঝে সূর্যদার সঙ্গে কথা বলবে? সূর্যদার গানে সঠিক মিউজিকটাই বা কে বাজাবে?

সূর্যদা তো জয় ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাসও করে না। কী যে করছে লোকটা কে জানে! হঠাৎই একদিন জয়ের বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হয়, আচ্ছা, যদি সূর্যদাকে মরণোত্তর জীবনের রহস্যটা জানিয়ে দিই, তা হলে তো সূর্যদা পৃথিবীর অদ্বিতীয় একজন মানুষ হয়ে যাবে! সে রহস্য পৃথিবীর কোনও মানুষের জানা নেই। পৃথিবীর মানুষ যা জানে, তার সবটাই ভুল, বস্তাপচা, বানানো গল্প! আর সেই রহস্য এখন তো সবটাই জয়ের জানা। আর সেটা যদি জয় কোনওরকম ভাবে সূর্যদাকে জানাতে পারে, পৃথিবীতে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে! আর সূর্যদা হবে সেই ঘটনার প্রাণপুরুষ।

বিষয়টা ভাবনার স্তর অবধি ভালোই ছিল। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগ পুরো অসম্ভব। কারণ এখান থেকে পৃথিবীতে যাওয়া যায় না! কেউ কোনওদিন যেতে পারেনি। কেউ যে পারেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, মৃত্যুলোক নিয়ে পৃথিবীর নানারকম গল্প।

জয়ও নানা লোকের লেখা পড়েছে। মৃত্যু নিয়ে, আত্মা নিয়ে, স্বর্গ নিয়ে। এখন দেখছে সেগুলো একটা বর্ণও সত্যি নয়। সব ভুল। কোনও আত্মাই মর্ত্যলোকে ফিরে যেতে পারে না। যদি পারত, তা হলে কেউ না কেউ তার প্রিয় মানুষটার কাছে গিয়ে নিশ্চয়ই এখানকার আসল রূপটা বলে আসত।

এখান থেকে পালানো যায় না। অসম্ভব কড়া পাহারা। কেউ কোনওদিন চেষ্টা করেছিল কিনা জানা যায় না। কারণ এখানে কোনও ইতিহাস বই নেই। কিন্তু কেউ পালায়নি বলে কেউ পালাবে না, তা তো হতে পারে না। জয় মনে মনে ভেবেছিল Alcatraz থেকেও তো পালানো অসম্ভব ছিল। তবুও এক দুজন তো পালিয়ে ছিল!

এখন জয় ছুটছে। নিজেকে তার Escape from Alcatraz-এর Cleant East Wood মনে হচ্ছে।

অবশেষে জয় পালাতে পেরেছে। তবে সে জানে, তাকে ধরতে পারলে তার কপালে গভীর দুঃখ আছে।

কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা! মাত্র আধঘণ্টা যদি সে সূর্যদার সঙ্গে কাটাতে পারে, তা হলে সে আবার ধরা পড়তেও রাজি। রাজি যে কোনও শাস্তি নিতেও।

সামনেই মেঘ পাহাড়। জয় জানে ওই পাহাড়টা ডিঙোতে পারলেই পৃথিবী। পৃথিবী মানেই সূর্যদা...!

এখন অনেক রাত। সূর্যদার পড়ার ঘর। জয় ঢুকে পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। এককোণে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সূর্যদা কী সব লিখছে।

জয় অস্ফুট স্বরে বলে, 'সূর্যদা!।'

সূর্যদা মাথা তুলে জয়কে দেখে। প্রচণ্ড অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বুকে হাত দিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ে! কেমন ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জয় বলে, 'সূর্যদা! আমার হাতে সময় নেই। ওরা হয়তো এখুনি এসে আমায় ধরে নিয়ে যাবে। তার আগে শুনে নাও, যা বলছি।'...

বলে জয় গড়গড় করে বলতে থাকে, মৃত্যু আসলে কী। জীবনই বা আসলে কী! কী করলে মৃত্যুকে এড়ানো যায়? স্বপ্নতত্ত্ব আসলে কী? পূর্বাভাসই বা কী? স্বর্গ আসলে কোথায়? তার ভৌগোলিক অবস্থান সব... সব বলে জয় থামল। তাকে থামতেই হল, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা একটা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে।

জয় বুঝতে পারছে, তাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে! দেখতে দেখতে সবুজ উর্দিরা ঘরে ঢুকে পড়ল।

জয় চিৎকার করে সূর্যকে বলে ওঠে, 'সূর্যদা। এ সব কথা তুমি লিখো। সবাইকে জানিয়ে দিও। সূর্যদা, আমি শুধু তোমায় জানাব বলেই এত কষ্ট করে এসেছি। প্লিজ সূর্যদা, তুমি লিখো! তুমি এখন পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞানী মানুষ, মৃত্যু রহস্য যার হাতের মুঠোয়। তুমি সবাইকে জানিও সূর্যদা।'

একজন সবুজ উর্দি হেসে বলল, 'এত খেটে কোনও লাভ হল না।'

জয় বলল, 'কেন?'

সবুজ উর্দি বলল, 'ওকেও তো তোমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এত দিন বাদে তোমায় দেখে ওর হার্ট অ্যাটাক করেছে।'

অদ্বৈত

সন্ধেবেলা আড্ডা মারছিলাম রকে বসে আমরা গোটা চারেক বন্ধু। শীতকালের সন্ধে, দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো কেমন কুয়াশার ঘোমটা ঢাকা বিধবা পিসিমার মতো। বাইরে লোক খুব একটা নেই, আমরা মূল রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি মাঠের মধ্যে নিজেদের বানানো কাঠের রকে বসে, অন্ধকারে। একটা সময় কথাবার্তার মোড় ঘুরে এল আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে। বিষয়—নেলসন ম্যান্ডেলা। আমরা প্রাথমিক পর্বে নেলসনের গুণকীর্তন করেই চলেছিলাম। তাঁর ২৩ বছর জেলের অন্ধকারের মধ্যে থাকা, বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে অধিকারের লড়াই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন সময় ছায়ার মতো একজন প্রবেশ করল আমাদের আড্ডায়। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি তার উপস্থিতি। আমাদের মধ্যে অনিন্দ্যই প্রথম সমালোচনার সুর ধরল, "কিন্তু যাই বল, নেলসন জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স করে ভালো করেননি। অথচ ভাব, এই স্ত্রীই নেলসনের অবর্তমানে অর্থাৎ জেলে থাকার সময় নেলসনের আন্দোলনকে এত দূর নিয়ে এসেছিলেন, এটা খুব অমানবিক কাজ হল না?"

চন্দন বলে উঠল, "এটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়, উনি কার সঙ্গে থাকবেন বা থাকবেন না, এটা তো উনি নিজেই ঠিক করবেন। এসব বলে ওঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে কলঙ্কিত করার কোনও মানেই হয় না। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই।" হঠাৎ ছায়ার মধ্যে থাকা ছায়ামূর্তিটা বলে উঠল, "আচ্ছা! তাই নাকি?" আমরা চমকে তাকিয়ে দেখি ছায়ার মধ্যে, কখন মানুষটা এসে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে বুঝতে পারিনি। ছায়ামূর্তিকে শনাক্ত করা গেল—ঘটাদা! ঘটাদা আমাদের পাড়ারই এক জন, আমাদের থেকে বছর দশেকের বড়। ঘটাদা সম্পর্কে এককথায় কিছুই বলা সম্ভব নয়। সে বড় কঠিন কাজ। কারণ, ঘটাদা সম্পর্কে প্রত্যেকে মানুষের ধারণাই পরস্পরবিরোধী। কেউ ভাবেন ঘটাদা একজন নির্বোধ মানুষ, কেউ ভাবেন ঘটাদা একজন বোধসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ। সুতরাং এ হেন মানুষ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করতে চাওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে, আমরা ঘটাদা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই ঘটাদাই ছায়ার

মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে বললেন, "আচ্ছা! তাই নাকি?" আমরা চুপ। বুঝতে পারিনি ঘটাদার পরের কথা কোন রুট নেবে! তার পর বললেন, "হ্যাঁ! তাই নাকি! নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রীকে ডিভোর্স করা রাজনৈতিক বিষয় নয়? আচ্ছা তোরা ভেবে দেখেছিস? ২৩ বছর বাদে নেলসন মুক্ত হল জেল থেকে, সারা পৃথিবীর মিডিয়া হামলে পড়ল, নেলসন রাতারাতি হিরো। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারও গাদা গাদা গেট বানাল সারা কলকাতা জুড়ে—স্বাগত নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন এলেন, দেখলেন, চলে গেলেন, ভিনি-ভিডি-ভিসি। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণের মানুষগুলোর কী উপকার হল, কী লাভ হল? আমরা যারা ভেবেছিলাম, নেলসনের মুক্তি বর্ণবিদ্বেষী সরকারের মুখে ঝামা। তো কী হল? পর্বতের মূষিক প্রসব! আমি যদি আবার বলি, এই গোটা ব্যাপারটা পুরো প্ল্যান। পুরোটা পূর্বপরিকল্পিত। ২৩টা বছর খুব একটা কম সময় নয়। যদি বলি, এই ২৩ বছরে কারাগারে থাকার সময়ই আসল নেলসনের মৃত্যু হয় বা তাঁকে হত্যা করা হয়? কোনও এক look alike-কে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল নেলসনের ভূমিকায় থাকার জন্যে? যেটা ওই বর্ণবিদ্বেষী সরকারেরই প্ল্যান্ট করা বা বপন করা! এবার সময় বুঝে তাঁকে মুক্তি দিতে সরকারের অসুবিধে কোথায়? এবার সেই লোকটা মুক্ত হওয়ার পর কী করতে পারেন? মূল আন্দোলনের স্রোতকে শ্লথ বা গতিহীন করতে পারেন। যেটা উনি করেছেন। সে মানুষটা সরকারের মদতে এতটাই Trained বা শিক্ষিত যে, তার ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তবু তাঁর ধরা পড়ার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়!—কার কাছে?" চন্দন সম্মোহিত ভাবে বলে উঠল, "তাঁর স্ত্রীর কাছে।" ঘটাদা হঠাৎ দু-হাতে তালি মেরে বললেন, "ইয়েস! অতএব নেলসন ম্যান্ডেলার তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স করাটা কি ব্যক্তিগত না রাজনৈতিক!"

কুয়াশা বেড়েই চলেছে। দূরের ল্যাম্পপোস্টগুলো ভেজা চোখে আলো দেখার মতো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। অনিন্দ্য হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠল, "তুমি কী বলতে চাও, ঘটাদা? আমরা যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে দেখি খবরের কাগজে, সে look alike?" ঘটাদা নাটকীয় ভাবে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কলেজের কেমিস্ট্রির টিচারের মতো বলে উঠলেন, "Boys, try to understand! What is what." তার পর আমার থেকে একটা সিগারেট চেয়ে সেটা কানে গুঁজে ঘাসের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে বললেন, "বেশ, তোদের একটা গল্প বলি। কাল—তিন হাজার পাঁচশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। সময়—দ্বিপ্রহর। স্থান—উত্তর ভারতের বনাকীর্ণ এক পথ। শকটের ঘর্ঘর। আধুনিক ইতিহাস যাকে রথ বলে, তা আসলে ঘোড়ার গাড়ি বই কিছু নয়। বনাকীর্ণ পথে চাকার ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে চলেছে একটি রথ। দুটি ঘোড়ায় টানা। কৃষ্ণ বর্ণ ঘোড়া, দুজন সওয়ারি, এক জন সারথি। সারথি মধ্যবয়স্ক।

সওয়ারিদ্বয় কৈশোর অতিক্রান্ত সদ্য যুবক। সারথি এই দুই সওয়ারির কৌতুকের পাত্র। দুই সওয়ারি ক্রমাগত শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতুকের ভাষায় সারথিকে খোঁচা মেরেই চলেছে। অথচ, সম্বোধন করে চলেছে খুল্লতাত বলে অর্থাৎ খুড়ো বলে। দুই সওয়ারি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেই চলেছে। দুই সওয়ারির এক জন কালো চেহারার ও এক জন সাদা চেহারার। অর্থাৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা বলে উঠল, "খুড়ো, এত তাড়াতাড়ি যাব না। আজ অনেক দিন বাদে গ্রামছাড়া হয়েছি।" সারথি মুখ ঘুরিয়ে বলে, "এর মানে কী?" পিছনে বসে থাকা শ্বেত বর্ণের সওয়ারিটি বলে, "ভাই যা বলছে তাই হবে।" সারথি গাড়ি শ্লথ করে। এক সময় গাড়ি দাঁড়ায়। তার পরে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কী চাও?" কৃষ্ণবর্ণ মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো আমার খুব একটা যাওয়ার ইচ্ছে নেই তোমাদের রাজধানীতে। আমার গ্রাম আমার কাছে স্বর্গ। সেখানে অপেক্ষায় বসে আমার বাপ, আমার মা, আমার নর্মচরীরা অর্থাৎ আমার প্রেয়সীরা। তাদের ছেড়ে যখন মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশকে একটু চিনি না কেন! আকাশকেই ছাদ ভেবে পৃথিবীর খানিকটা অংশকে ঘর ভাবি।" সারথি কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখে আবার প্রশ্ন করে, "কিন্তু কী চাও?" শ্বেত বর্ণের মানুষটা আবার বলে ওঠে, "ভাই যা বলবে, তাই হবে।" কৃষ্ণবর্ণের মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো, আমি এত তাড়াতাড়ি অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে চাই না। আমাকে একটু বেশি সময় প্রকৃতির কোলে থাকতে দাও।"

অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে সারথি আরও নির্জন বনাকীর্ণ পথ ধরল। দুপাশে আদিম বৃক্ষের সারি, মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য, ঘন পল্লব ভেদ করে মাঝে মাঝে হানাদার আক্রমণ করছে ঠিকই, তবে সে হানা খুব জোরদার নয়। এরই মধ্যে মধ্যে রথের ভেতর জমে থাকা নানা জিনিসের আড়াল থেকে শ্বেত বর্ণ মানুষটা সন্তর্পণে একটি মৃৎপাত্র বার করল। তার পর পাশের মানুষটার দিকে তাকিয়ে কেমন সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "ভাই একটু পান করি?" ভাই মুখ টিপে হেসে বলল, "আমি নিষেধ করলে যেন কত শুনবে!"

এমন সময়েই অঘটনটা ঘটল। রথের চাকা বনাকীর্ণ পথের মাঝে একটি গহ্বরে পড়ে ভেঙে গেল। সারথি রথ থেকে নেমে সব কিছু নিরীক্ষণ করে বলে, "রথচক্রের পরিবর্তন করতে হবে, তার আগে এই গহ্বর থেকে রথ তোলা বড়ই আবশ্যক। কারণ, একটু পরেই সন্ধে হবে। এই অরণ্য শ্বাপদসংকুলও বটে।" রথটা এমন একটা জায়গায় স্থির হয়েছে যে, জায়গাটা একটা উঁচু-নীচু প্রান্তরের মতো, খুব একটা গাছপালা নেই। তিন জনের প্রচুর চেষ্টায় কিছুই হল না। আর-একজন মানুষ হলেই তা সম্ভব হবে। এ দিকে সূর্য ডুবতে বসেছে—দূরে একটি উপত্যকার

প্রান্তে সূর্য এসে দাঁড়িয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গা-ঢাকা দেবে। কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা এক দৃষ্টিতে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে। সবাই তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করল। দেখা গেল, দূরে সূর্য ডুবছে আর রক্তিম বর্ণ আকাশকে পিছনে রেখে এক জন মানুষ এগিয়ে আসছে।

এক দণ্ডকাল পরে, সবাই ঘর্মাক্ত কলেবরে মাটিতে বসে—রথের চাকা গহ্বর মুক্ত। সারথি বলল, "এ বার আগুন জ্বালাতে হবে। কারণ, রথচক্রের পরিবর্তন এই অন্ধকারে সম্ভব নয়। আজ রাতে এখানেই থাকতে হবে।" সারথি আগন্তুককে বলে, "আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, আমাদের সাহায্য করার জন্য।" আগন্তুক ধীর স্বরে বিনয়ের সঙ্গে বলে, "এ তো মানুষের ধর্ম।" সারথি খুশি হয় তার বিনয় দেখে। তার পর প্রশ্ন করে, "তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায়ই বা যেতে চাও?" আগন্তুক কেমন ইতস্তত করে। তার পরে বলে, "আমার নাম বিষ্ণু। এইটুকু জানাতে পারি, আমি এক জন ভাগ্যান্বেষী। ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরছি, এর বাইরে কিছু প্রশ্ন করবেন না দয়া করে, তা জানানোর সময় আসেনি।" সারথি বিরক্ত হয়, "এ আবার কেমন কথা?" কৃষ্ণবর্ণের মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো, কেন ওকে বিব্রত করছ, সাহায্যকারী ঈশ্বরেরই আর-এক রূপ!" তার পর হেসে বলে, "তুমি কিছু মনে কোরো না বিষ্ণু। আমার নাম বাসু। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, তবে ঘুরতে ঘুরতে। আমার পাশে আমার ভাই বলদেব। যদি কিছু মনে না কর, আজ রাতে আমাদের অতিথি হতে পারো। এই রাতে এই বনাকীর্ণ পথ চলা নিরাপদ হবে না। তুমি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে আমরা খুশি হব।" এক দণ্ড পরে, দেখা গেল অরণ্যের মধ্যে আগুনের আভা। চার জন আগুনের পাশে বসে। বলদেব ততক্ষণে মৃৎপাত্রের অমৃতসুধা পানে রত হয়েছে। সারথি রাতের ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত। বাসু এবং বিষ্ণু মুখোমুখি বসে। বাসু প্রশ্ন করে, "বিষ্ণু, তোমার অতীত সম্পর্কে কিছু জানতে চাইব না, তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে আপত্তি আছে কি?" বিষ্ণু অদ্ভুত ভাবে হাসে। তার পর বলে, "যার অতীতই অন্ধকারের গর্ভে, তার আবার ভবিষ্যৎ কী!" বাসু বলে, "তার মানে কী? তোমার কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই নেই?" বিষ্ণু বলে, "ভাগ্য আমায় যে দিকে নিয়ে চলেছে, আমি সেই দিকেই চলেছি।" বাসু বলে, "সবল শক্তিশালী মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। আর তোমায় দেখে দুর্বল মনে তো হয় না।"

বিষ্ণু কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। সারথি ওদের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ওদের লক্ষ করে চলে। আগুনের আলোয় বিষ্ণুকে দেখা যাচ্ছে। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ। সম্ভবত ভারতের দক্ষিণ অংশের বাসিন্দা। ছিপছিপে চেহারা, চিতা বাঘের মতো ক্ষীপ্র। তার শরীরের পেশি দেখে বোঝা যায়—প্রয়োজনে তার ব্যবহার

অকল্পনীয় হতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য তার দুটি চোখ। এত নির্বিকার এবং এত গভীর যে, মানুষ সম্মোহিত হয়ে যেতে পারে। সারথি মন দিয়ে বাসু ও বিষ্ণুর কথোপকথন শুনে যায়। বাসু মহাপণ্ডিত। তার কথা তার মেধা আজ প্রায় কিংবদন্তী। কিন্তু বিষ্ণু? এ মানুষটা কে? এক অজ্ঞাত কুলশীল অথচ কী তার পাণ্ডিত্য! কী মেধা! কী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা! কী প্রচণ্ড বিশ্লেষণী শক্তি! কোনও অংশেই বাসুর চেয়ে কম নয়! রাত বাড়ে, দুজন দু-জনের কথায় মুগ্ধ। দুজন মানুষ যেন আয়নায় নিজেদেরই দেখছে। সারথি ভাবে এ রকম কি হতে পারে? একই রকম দুজন মানুষ? এত মিল!

পরের দিন সকালে সারথি ঘুম থেকে উঠে দেখে বলদেব পাশে শুয়ে। কিন্তু বাসু আর বিষ্ণু নেই! সারথি চিন্তিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অরণ্যের ভেতর প্রবেশ করে দেখে একটি উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দুজন ধনুর্বিদ্যাভাস করছে। সারথি দূর থেকে দেখে, দুজনের কী আশ্চর্য দক্ষতা! কেউ কম যায় না। ধীরে ধীরে বিষ্ণু সহজ হয়ে আসে। সারথি দেখে বাসু আর বিষ্ণু দুজনেই দুজনকে ভীষণভাবে পছন্দ করে ফেলেছে। বলদেব খুব খুশি। কারণ, সে জানে ভাইয়ের সঙ্গে তার বুদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তর ফারাক। ভাই তার সঙ্গে কথা বলে খুব একটা সুখ পায় না। ভাই তার মনের মতো বন্ধু পেয়েছে, এতেই তার আনন্দ। আনন্দে একটু বেশি মাধ্বী পান করে ফেলে। সারথি বিষ্ণু ও বাসুর কথোপকথন শোনে নানা কাজের ফাঁকে। বাসু বলে, "আচ্ছা বিষ্ণু, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার কী মত?" বিষ্ণু বলে, "আছা, তুমি কখনও ভেবে দেখেছ, একটি দেশ মানে তো জনসাধারণও। জনসাধারণের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি কি সম্ভব?" বাসু মুচকি মুচকি হেসে বলে, "বলে যাও, বলে যাও, বেশ বলছ।" বিষ্ণু বলে, "অথচ দেখ যারা দেশ শাসন করে চলেছে সেই ক্ষাত্র শক্তি বা ক্ষত্রিয় শক্তি কী আশ্চর্য রকম জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন!" বাসু বলে, "তা হলে কী হওয়া উচিত?" বিষ্ণু বলে, "আমি জানি না। তবে এই সম্ভোগম ও কলহপরায়ণ মাৎস্যন্যায়ধর্মী নির্বোধ ক্ষাত্র শক্তির অধীনতা মুক্ত একটি শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন।" বাসু মুখ টিপে হাসে। বলে, "অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষ?" বিষ্ণু বলে, "ঠিক, এই রাজায় রাজায় কলহে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। আমি নিজে তার শিকার,"—বলেই বিষ্ণু চুপ করে যায়। বাসু হেসে বলে, "না বন্ধু, তোমার অতীত জানতে চাইব না।" বিষ্ণু হেসে ওঠে। সারথি ভাবে কী আশ্চর্য ভাবে দুজন মানুষের দর্শনের মিল!

দ্বিপ্রহর ভোজনের সময় বাসু প্রশ্ন করে, "বিষ্ণু, তুমি কি বিবাহিত?" বিষ্ণু লাজুক ভাবে বলে, 'না'। তার পর বাসুকে প্রশ্ন করে, "কোন মতে? গান্ধর্ব মতে কি?" তার পর সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। বিষ্ণু অপ্রস্তুতের মতো বলে, "আমি কি কিছু ভুল প্রশ্ন করেছি?" বাসু হাসতে হাসতে বলে, "না বন্ধু, তোমার

প্রশ্ন সঠিকই ছিল। কিন্তু আমার উত্তর দেওয়াটা বড় কঠিন।" সারথি হাসতে হাসতে বলে, "আমাদের বাসু প্রতি সন্ধ্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" বিষ্ণু চুপ করে যায়। সবাই হাসাহাসি করেই চলে। সারথি লক্ষ করে বিষ্ণুর নারী সম্পর্কিত বিষয়ে একটি রক্ষণশীলতা আছে। এই একটি জায়গাতেই বাসুর সঙ্গে তার অমিল।

সন্ধেবেলা ওরা রথ থামায় এমন একটি স্থানে যার খুব কাছেই একটি শবরপল্লি আছে, এবং জানা গেল আজ তাদের উৎসব। বলদেব তো উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। কারণ, তার মৃৎপাত্র এখন প্রায় শূন্য। বাসু ছেলেমানুষের মতো বিষ্ণুকে বলল, "চলো ওদের উৎসবে যাই—শবর রমণীরা কিন্তু সত্যিই রমণীয়।" বিষ্ণু বলে, "না বন্ধু, আমার ওতে উৎসাহ নেই। তবে তুমি যেতে চাইলে তোমার সঙ্গে যাব, কারণ তোমার সঙ্গই আমার কাছে পরম প্রিয়।"

উৎসবের আনন্দে মত্ত সবাই। বলদেব প্রায় মত্ত অবস্থায় রমণীদের সঙ্গে নেচে চলেছে। বাসু রমণীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায় ব্যস্ত। সারথি অত্যধিক সুরাপানের ফলে প্রায় অচৈতন্য। বিষ্ণু চুপ করে বসে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক সময় বলদেব এসে তার পাশে বসে হাঁপায়। বিষ্ণু বলে, "সত্যি বলতে কী আমার কিন্তু ভালো লাগছে।" বলদেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "এ আর কী এমন, আমাদের গ্রামের হল্লীশকের তুলনায় এ উৎসব তো ম্লান।" বিষ্ণু প্রশ্ন করে, "হল্লীশক আবার কী উৎসব?" বলদেব আর এক দফা নাচার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "সে উৎসব বাসুরই আবিষ্কার।" বলেই দৌড়ে চলে যায় রমণীদের মাঝে।

পরের দিন সকাল। সারথি ঘুম থেকে উঠে শোনে, বাসুর একটু জ্বর এসেছে। সারথি ব্যস্ত হয়ে সবাইকে বলে, "এ বার আমাদের রাজধানীর দিকে যাওয়া উচিত। রাজধানী এখান থেকে প্রায় দু'দিনের পথ।" সবাই সম্মত হল। রথ ঘোরানো হল রাজধানী অভিমুখে। বেলা দ্বিপ্রহরের দিকে বাসুর শুরু হল ভেদ বমি, আগের রাতে শবরপল্লির খাবারে কোনও ভাবে বিষক্রিয়া হয়েছে তার। বিষ্ণু সারথিকে বলল, 'খুড়োমশাই, যত তাড়াতাড়ি পারেন লোকালয়ে চলুন। এই মুহূর্তে বাসুর চিকিৎসা বড় আবশ্যক।" ঝড়ের গতিতে রথ ছুটে চলে। কিন্তু কোনও লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ সন্ধে এসে পড়ছে, বাসুর শরীরের অবস্থার অবনতি ঘটছে।

সারাটা রাত বিষ্ণু বাসুর মাথা কোলে নিয়ে শুশ্রূষা করে চলে। বলদেব তো কেঁদেই চলেছে। সকালের দিকে সারথির একটু চোখ লেগে এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখে বলদেব ঘুমোচ্ছে। বাসু শুয়ে আছে, তবে বিষ্ণুর কোলে মাথা দিয়ে নয়। বিষ্ণু অদ্ভুত ভাবে বাসুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারথি এগিয়ে

এসে প্রশ্ন করে, "কী হয়েছে?" বিষ্ণু সারথির দিকে তাকায়। বিষ্ণুর দুটো চোখ লাল হয়ে আছে। কাঁদতে না পারার যন্ত্রণায়। সারথি সে দিকে তাকায়। সারথি বুঝতে পারে, বাসু আর ইহলোকে নেই। এর মধ্যে বলদেব উঠে দাঁড়ায়। সব বুঝে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

বেলা বাড়ে। গাছের তলায় বাসুর দেহটা শায়িত। বলদেব কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বিষ্ণু চুপ করে বাসুর দেহটার দিকে তাকিয়ে বসে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে শুধু সারথি। তার মনের মধ্যে আকাশ-পাতাল হচ্ছে। তার গোটা অভিযানটাই নষ্ট হয়ে গেল। এখন বাসুকে যদি রাজধানীতে না নিয়ে যেতে পারে, যারা বাসুর অপেক্ষায় দিন গুনছে। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ নদী। সারথি এগিয়ে যায় নদীর দিকে। মোহাবিষ্টের মতো নদীর জলে নেমে যায়। তার পর গলা জলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকে দূরে বাসুর দেহটা আর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুকে দেখা যাচ্ছে। বাসুর শরীরের হলুদ আবরণের একটা প্রান্ত হঠাৎই হাওয়ায় বিষ্ণুর মুখের ওপর উড়ে পড়ল। মনে হল, বাসু শায়িত দেহটা থেকে বেরিয়ে এসে দণ্ডায়মান বিষ্ণুর মধ্যে প্রবেশ করছে। সারথির মনে হল, তার ঈশ্বর দর্শন হল। তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ভাবনার উদয় হল। সে জল থেকে উঠে ধীর পায়ে বিষ্ণুর কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর বিষ্ণুর হাত ধরে বলে, "চলো, কথা আছে।" এক দণ্ড পরে নদীর ধারে বিষ্ণু ও সারথি মুখোমুখি। বিষ্ণু বলে, "অসম্ভব, আপনার প্রস্তাব আমি মানতে পারছি না।" সারথি ধীর স্বরে বলে, "এটাই নিয়তির ইচ্ছে।" বিষ্ণু বলে, "এ শঠতা। এ অপরাধ।" সারথি বলে, "তার বিচার ইতিহাস করবে। তুমি আমি নির্ণয় করার কেউ নই। আর এ কথা আমার না। এ বাসুরই দর্শন।" বিষ্ণু অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকায়। বলে, "কিন্তু আপনি আমায় বাসু সাজতে বলছেন?" সারথি বলে, "তুমি তোমার ভূমিকাই পালন করবে, শুধু বাসুর নাম নিয়ে।" তার পর একটু সময় নিয়ে বললে, "ভেবে দেখ, যেখানে যাচ্ছি আমরা, রাজধানীতে, বিজয়ধনু উৎসবে। সেখানে কেউ বাসুকে আগে দেখেনি। শুধু নাম শুনেছে। তোমাকে তো আগেই আমি বললাম, এই অভিযানে আমার ভূমিকা দ্বিমুখী গুপ্তচরের মতো। অর্থাৎ রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন বাসুকে রাজধানী নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেখানে রাজা তাকে হত্যা করবে। আর আমি বাসুকে নিয়ে যাচ্ছি অত্যাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করানোর জন্যে। এ ক্ষেত্রে অগণিত মানুষ অপেক্ষা করছে বাসুর জন্যে। বাসু এসে তাদের মুক্তি দেবে। সে ক্ষেত্রে যদি বাসু না পৌঁছোয়, এত মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হবে। যার দায়ভার তোমাকেই নিতে হবে, বিষ্ণু। আর বাসু তোমার অপছন্দের লোক তো নয়, তোমাদের দুজনের যোগ্যতা দর্শন সবই প্রায় একই রকম। সে ক্ষেত্রে তোমার নিজেরই দর্শনের দার্শনিক হতে আপত্তি কোথায়?" বিষ্ণু চুপ করে থাকে। সারথি বলে, "ভেবে দেখ, তুমি তো ভাগ্যান্বেষী। এত

বড় সুযোগ ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে, আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করছ?" বিষ্ণু বলে, "কিন্তু বলদেব?" সারথি হেসে বলে "বাসুর অবলম্বন ছাড়া বলদেবের অস্তিত্ব কতটুকু? ও বাসুর নামের অবলম্বনটুকুও ছাড়তে চাইবে না।"

সময় বয়ে যায়। এক সময় দুজন নদীর পাড় থেকে এগিয়ে যায়, বাসুর শায়িত দেহটার দিকে। বাসুর দেহটা এই জনহীন প্রান্তরে একটি গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হল। বলদেব বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বলে, "চলো ভাই, রাজধানী আমাদের, মানে বাসু আর বলদেবের প্রতীক্ষায় বসে আছে।" সারথি অক্রুর সসম্ভ্রমে বিষ্ণুর গায়ে বাসুর হলুদ অঙ্গ আবরণটি জড়িয়ে দিল। বিষ্ণু এগিয়ে যেতে চায়। বলদেব আর হাত ধরে বলে, "এটা নিতে ভুলে যাচ্ছ—।" বলদেবের হাতে একটি ময়ূরপুচ্ছ।

তিন জনে রথের দিকে এগিয়ে যায়। তিন জনের এক জন মানুষ গাছের নীচে মাটির তলায় শায়িত মানুষটার হলুদ অঙ্গ আবরণটি গায়ে জড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে নিল শায়িত মানুষটার অসংখ্য কিংবদন্তী। এই মানুষটার সামনে অনেক কাজ। এই মানুষটাকে রাজধানী পৌঁছে রাজাকে হত্যা করতে হবে। আগামী দিনে অর্জুনের সারথি হতে হবে, ভারতযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে হবে। আরও অসংখ্য কাজ করতে হবে।"

এইটুকু বলে ঘটাদা থামলেন। আমরা বোকা হয়ে গেছি, মুখ থেকে কথা বার হচ্ছে না। অনিন্দ্যই প্রথমে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ, ঘটাদা? বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর মথুরার কৃষ্ণ আলাদা? এ তথ্য কোথায় পেলে?" ঘটাদা আমার দেওয়া সিগারেটটা কানের পাশ থেকে বার করে ধরায়। তার পরে বলে, "তথ্য লুকিয়ে আছে মহাভারতেই। তথ্য জুগিয়েছেন অনেকেই। ব্যাসদেব থেকে রাজশেখর বোস, মায় তোদের নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়িও।" আমি বললাম, "কী সে তথ্য?" ঘটাদা বললেন, "বেশ, ধরে নিলাম দুজনে আলাদা নয়, তবে তোদের কৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার পর বৃন্দাবনে আর ফিরে এলেন না কেন? সারা জীবন ফিরে এলেন না। অথচ মথুরা থেকে বৃন্দাবনের পথ মাত্র ঘণ্টা তিনেকের। অথচ বলদেব, মানে বলরামকে পাঠিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। নিজে যাননি। কেন? বৃন্দাবনের পুরোনো বন্ধু সুদামার সঙ্গে মথুরায় দেখাও করেননি। কেন? মহাভারতে এক বারই মাত্র রাধার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। তখন যুদ্ধবিরতি চলছিল। রাধা ঘুরতে ঘুরতে সখীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে এসে পড়লেন। যুদ্ধক্লান্ত কৃষ্ণকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কোনও কথা বললেন না। তার পর ফিরে গেলেন। তার পর সখীদের বললেন, "এ মানুষটার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো হত। আমি যে মানুষটাকে চিনতাম, এ মানুষটা সে মানুষ নয়। যে কালিন্দীর তীরে বসে বাঁশি বাজাত, আমি তাকে চিনতাম। এই যুদ্ধক্লান্ত নিষ্ঠুর

ক্রুর মানুষটা আমার কৃষ্ণ নয়।" আমরা ভাবলাম, শ্রীরাধা একথা অভিমানে বলেছেন। প্রেমিক কৃষ্ণকে যুদ্ধ-বেশে দেখে শ্রীরাধার ভালো লাগেনি, তাই অমন বলেছিলেন। আমি যদি বলি, শ্রীরাধা আক্ষরিক অর্থেই বলেছিলেন, 'এই লোকটা আমার কৃষ্ণ নয়'।"

এই বলে ঘটাদা হঠাৎই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ বাবা! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, বাচ্চার বেবিফুডটা কেনা হয়নি। চলি রে," বলে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

আমরা চার জন বাকরুদ্ধ হয়ে কুয়াশার মধ্যেই বসে রইলাম। বাইরে কুয়াশা, ভেতরে এক নতুন কুয়াশা, যার জাল বুনে দিয়ে গেলেন ঘটাদা।

স্বোপার্জিত

ঘটাদাকে অবাক করা যায় না।

ঘটাদাকে অবাক করতে চাওয়াটাও অলীক কল্পনার মতো, শোনা যায় ঘটাদার বাবাও নাকি ঘটাদাকে অবাক হতে দেখেননি—তার জীবদ্দশায়, অবাক না হওয়ার পালা শুরু নাকি ঘটাদার এক বছর বয়েস থেকে (এটা অবশ্য জনশ্রুতি), ঘটাদার এক বছর বয়সে তার বাবা একটা অদ্ভুতদর্শন খেলনা এনে ঘটাদার সামনে রাখেন, সে খেলনা থেকে নানারঙের আলো এবং অদ্ভুত শব্দ বের হতে থাকে, ঘটাদা নাকি সেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে, শুধু বলেছিলেন—অঁ, তারপর আর সেটার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তারপর ঘটাদা স্কুলে ভর্তি হলেন। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় দেখা গেল অমল ঘটক মানে ঘটাদা ফার্স্ট হয়েছে। পাড়ার মধ্যেই স্কুল, পাড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, সবাই ধন্য ধন্য করল, ঘটাদা নির্বিকার।

দুদিন পরে দেখা গেল খবরটা ভুল, ফার্স্ট হয়েছে ক্লাসের আর-এক জন, তার নাম অনল ঘটক, তার রোল নাম্বার এগারো, আর অমল ঘটক মানে ঘটাদার সতেরো—একটু প্রিন্টিং মিসটেক—অনলটা অমল আর এগারোটা—সতেরো হয়ে গেছে। দেখা গেল ফার্স্ট তো দূরের কথা ঘটাদা পাশই করতে পারেননি। তখনও দেখা গেছিল ঘটাদা মার্কশিট হাতে নিয়ে—নিরীক্ষণ করে শুধু বলেছিলেন—অঁ।

তারপর ঘটাদার বয়ঃসন্ধিকালে ঘটাদার বন্ধুরা পাড়ার এক বউদির বাথরুমের দরজায় একটা ফুটো আবিষ্কার করে। একটি বিশেষ সময়ে পাড়ার রক ফাঁকা হয়ে যেত—লাইন দিয়ে ফুটো-মাধ্যমে স্নানরতা বউদি দেখা, ঘটাদা এসবের মধ্যে ছিলেন না। একদিন সবাই ঘটাদাকে জোর করে নিয়ে গেল ভিজে বউদি দেখাতে, লাইন দিয়ে স্তম্ভিত, অবাক, বাকশক্তিহীন একদল কিশোর পালা করে বাথরুমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এল ঘটাদার পালা, এবারও ঘটাদা অবাক হলেন না, খানিকক্ষণ দেখে—ধড়মড় করে দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকে বললেন—বউদি, আপনি অ্যানি ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করতে পারেন না?

তারপরের ঘটনা ইতিহাস। থানা, পুলিশ, ঘটাদার বন্ধুরা পাড়া ছাড়া—শুধু ঘটাদা ছাড়া, সবাই যখন ঘটাদাকে হাতে পেয়ে প্রচণ্ড শাসন—আর নানা কটু কথায়

ভরিয়ে দিচ্ছে, তখনও নাকি ঘটাদা বলেছিলেন—অঁ্।

পাড়ায় নিমাই সামন্ত আত্মহত্যা করেছে। হুলুস্থুল, নিমাইবাবু পাখার সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় দিয়ে ঝুলছে—এক হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে। পাড়ার মহিলারা ক্রন্দনরতা, বয়স্করা মৃত্যুর দার্শনিকতা নিয়ে উদাস আলাপচারিতায় মগ্ন—যুবকেরা উত্তেজিত। নিমাইবাবুর স্বল্প ভালো কাজের স্মৃতিকথা বারংবার উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে জাবর কাটা চলছে সারা পাড়া জুড়ে, নিমাইবাবুর মা—মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, বয়স্ক বউদিরা তাকে সামলাতে ব্যস্ত। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে ঝুলন্ত নিমাইবাবুকে দেখে বাইরে এসে শিউরে উঠছে মৃত্যুর বীভৎসতায়। এর মধ্যে ঘটাদা ঘটঘট করে ভেতরে ঢুকে একহাত জিভ বেরিয়ে আসা নিমাইবাবুর বীভৎস দোল খাওয়া মৃতদেহটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে গটমট করে বেরিয়ে এসে সবার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার মুখে বলেছিলেন—গায়ের রংটা কালো হলে একদম কালী ঠাকুরের মতো দেখাত নিমাইদাকে। এই শুনে বৃদ্ধ শৈলেন বসাক মারমুখী হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, হারামজাদা এই সময়ে তোর মাথায় এই কথাটাই এল—কুলাঙ্গার-অপদার্থ-জানোয়ার, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘটাদা নির্বিকার ভাবে বগল চুলকাতে চুলকাতে শুধু বলেছিলেন—অঁ্।

আমাদের পাড়ার মেয়ে পার্বতী, তার এক মাসি বেড়াতে এসেছিল কিছুদিনের জন্য ওদের বাড়িতে। সে কী জানি কীভাবে হঠাৎ ঘটাদার প্রেমে পড়ে গেল।

পাড়ায় তখন জোর খবর, "মাসি ইন লাভ", অনেকেই মুখ বেঁকালো—'ইলা আর কাউকে পেল না শেষে ওই ঘটা'। মাসির বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা—ঘটাদারই বয়সি হবে, ঘটাদার তখন ভরা যৌবন। সকালে ফুটবল—বিকেলে ক্যারাম খেলেন। অবশ্যই খুব বাজে খেলেন।

ঘটাদার বন্ধুদের মধ্যে যাদের জীবনে প্রেমের ফুল তখনও ফোটেনি তারা দীর্ঘনিশ্বাসে পাড়ার কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়াল।

আমরা ছোটরা উত্তেজিত হয়ে চোখ কান খোলা রাখতে শুরু করলাম। কখন কী হয় কে জানে!

কিন্তু "জানে না জানে গুল হি না জানে
বাগ তো সারা জানে হ্যায়।"

এসবের কিছুই ঘটাদাকে স্পর্শ করে না। ঘটাদা কিছু বোঝেন না। তিনি তখন হোমিওপ্যাথি চর্চা করছেন পাড়ার বিমল ডাক্তারের নেতৃত্বে, এমতাবস্থায় ঘটাদার বন্ধুরা ও মাসির কিছু বন্ধু যৌথভাবে নানা চেষ্টায় ঘটাদা ও মাসিকে আমাদের পাড়ার লাভার স্পট নিরালা রেস্টুরেন্টের কেবিনে ঢুকিয়ে পরদা টেনে দিয়েছিল। দু-ঘণ্টা বাদে মাসি বেরিয়ে এসেছিল লজ্জা-রাঙা মুখ করে, সবাই ভাবল ঘটাদা নিশ্চই চুমু-টুমু খেয়েছে। পরের দিন মাসি পার্বতীদের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি চলে গেছিল—আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। শোনা গেছে নিরালার নির্জন কেবিনে

ঘটাদা নাকি মাসিকে, দু-ঘণ্টা ধরে তার বিমল ডাক্তারের কাছ থেকে সদ্য পাওয়া হোমিওপ্যাথির জ্ঞান ফলাতে মেয়েদের অনিয়মিত পিরিয়ড আর কনস্টিপেশন নিয়ে ঝাড়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

পরে যখন বন্ধুরা ঘটাদাকে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি...ইত্যাদি বলে ধোয়াচ্ছিল, তখনও নাকি ঘটাদা ভাবলেশহীন মুখে সব শুনে বলেছিলেন—অ্যাঁ।

তারপর প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখেছি—প্রায় কেন সব ক্ষেত্রেই দেখেছি—ঘটাদা অবাক হন না, ইস্টবেঙ্গলের জিততে জিততে হারা, ভারতের ক্রিকেটে আশ্চর্যভাবে জয়—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-ভূমিকম্প-বন্যা, কোনও কিছুই ঘটাদাকে অবাক করে না।

এরপর একদিন ঘটাদার বিয়ে হল, একটু বেশি বয়েসেই হল।

ঘটাদা একটি বেসরকারি অফিসে মোটামুটি চাকরি করতেন। ঘরে বৃদ্ধা মা ছিলেন, এল এবার বউ। কোন গ্রাম থেকে ঘটাদার দূরসম্পর্কের এক পিসি ঘটাদার জন্য বউ আনলেন, তাদের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল কোনওদিনই জানার চেষ্টা করিনি বা সময় পাইনি কারণ তখন আমরা সবাই চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়েছি—পাড়ার আড্ডাটা প্রায় উঠতে বসেছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখতাম পাজামা পরে, গায়ে খদ্দরের ইস্ত্রিহীন পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘটাদা চলেছেন, তিন হাত পেছনে ঘোমটায় ঢাকা তার বউ মাথা নীচু করে স্বামীকে অনুসরণ করছে।

দিন যায়...একদিন দেখলাম ঘটাদা একইভাবে চলেছেন, মাথার চুলগুলো একটু পেকেছে। একই রকম পাঞ্জাবি-পাজামা। তিন হাত পেছনে তার বউ। তবে এবার আর ঘোমটায় ঢাকা নয়।

দিন যায়...একদিন দেখি স্টেপ কাট চুল, শিফনের শাড়ি ঘটাদার বউ চলেছে সামনে আর তার তিন হাত পেছনে ঘটাদা, আধময়লা একই রকম পাঞ্জাবি পাজামা—নির্বিকার। হয়তো একই ভাবে মনে মনে বলছেন—অ্যাঁ।

এর মধ্যে ঘটাদার মা গত হয়েছেন—অনেকে বলেন বউ-এর অবহেলায়। ঘটাদা নিরুত্তাপ—নির্বিকার।

একদিন শুনলাম আমাদের বন্ধু দীপকের সঙ্গে নাকি ঘটাদার বউয়ের একটা গোপন রোমান্স চলছে।

প্রথমে গুরুত্ব দিইনি, তারপর, বিভিন্ন জায়গায় ওদের দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘুরতে দেখে বুঝলাম, ব্যাপারটা গভীর। দীপক যে আসলে কী করে, আমরা ভালো করে জানতামও না, ওর বাবার একটা রেশন দোকান আছে আর দীপকের টাকার খুব একটা অভাব নেই, এটুকুই শুধু জানতাম। সেই দীপক, হঠাৎ একজন বিবাহিতা মহিলার প্রেমে কী করে পড়ল বেশ জানতে ইচ্ছে করেছিল।

এক কালীপুজোর রাতে একান্তে মদের টেবিলে দীপককে ডেকে আমি আর বুচু নামে আমাদের এক বন্ধু চেপে ধরলাম। কী ব্যাপার বল তো?

দীপকের তখন চার পেগ চলছে—হেসে উঠে বলল,—না না প্রেম-ফ্রেম নয়, ঘটাদার তো বয়স হয়েছে আর বউটা তো ওর গোড়ালির বয়সি...এ বয়েসে বুঝিস তো বিছানাটা একটা ফ্যাক্টর, আমি বিনা চার্জে একটু সারভিসিং করে দিই।

আমি বললাম, "কিন্তু মেয়েটা হয়তো সত্যি তোর প্রেমে পড়েছে—এমনও তো হতে পারে!

দীপক বলে—তাতে আমার...

ঘটাদার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল, ঘটাদা জানতে পারলে কী হবে কে জানে! কিন্তু পরে একদিন জানতে পারলাম—দুপুরে হঠাৎ ঘটাদা বাড়ি ফিরে নিজের চাবি দিয়ে ডোর লক খুলে বিছানায় দীপক আর তার বউকে দেখে, নির্বিকার ভাবে আবার ডোর লক করে বেরিয়ে গেছিলেন, তখন ঘটাদার ওপর ভীষণ বিরক্তি এসেছিল। শুনেছিলাম ওই অবস্থায় ওদের দেখে, তখনও নাকি ঘটাদা নির্বিকার ভাবে বলেছিলেন—অ্যাঁ।

তারপর একদিন রেশন দোকানের প্রচুর মালপত্র এবং ক্যাশ ঝেড়ে দীপক হাওয়া। দেখা গেল ঘটাদার বউকেও পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের ব্যাপারটা দুয়ে-দুয়ে চার করে নিতে অসুবিধা হয়নি।

ঘটাদা যখন প্রথম এ ঘটনা শুনল তখনও নির্বিকার, সব শুনে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন—অ্যাঁ। তারপর দিন যায় দিন আসে। ঘটাদার মাথা একদম সাদা—আমরাও একটু মেদ অর্জন করেছি। দীপক আর ঘটাদার বউ-এর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

এখনও ঘটাদাকে দেখি ইস্ত্রিহীন পাঞ্জাবি পাজামা পরে পাড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডের দিক যেতে। একইরকম নির্বিকার। এখনও ঘটাদা অবাক হন না।

বুচু একদিন বলেছিল ঘটাদা আসলে 'আইকিউ'হীন একটা মানুষ। অবাক হতেও একজন মানুষের যে বুদ্ধি ও শিক্ষার প্রয়োজন হয় ঘটাদার সেটাও নেই।

ভাবতাম বুচু হয়তো ঠিকই বলে। ঘটাদা আসলে নির্বিকার নন—নির্বোধ। বছর তিনেক বাদে একটা অদ্ভুত ঘটনা শুনলাম। বম্বের কোনও এক সরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে ডাক্তারকে অনুরোধ করে। তার মৃত্যুর পর এই সন্তানকে যেন তার স্বামী শ্রী অমল ঘটকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সহৃদয় হাসপাতাল সুপার কলকাতায় খবর পাঠালেন—ঘটাদা ছুটলেন বম্বে, এখনকার মুম্বই।

তারপরে কী হল জানতে পারিনি কারণ কিছুদিনের জন্য একটু শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে, ফিরে এসেও আড্ডায় যাওয়া হয়নি, কারণ এতদিনে আমার সংসার হয়েছে এবং কে না জানে জাঁতাকলে পাড়ার রকের আড্ডার উত্তাপটাই সবার আগে ঠান্ডা হয়!

যাই হোক, একদিন আড্ডায় গিয়ে কথা প্রসঙ্গে ঘটাদার নাম ওঠায় শুনলাম, ঘটাদা নাকি মা মরা সেই সদ্যজাত বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছেন এবং একা একাই তাকে মানুষ করছেন। ঘটাদা চাকরি ছেড়ে ভিআরএস নিয়েছেন এবং পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোন না, বাচ্চাটার কাছ ছাড়া হন না। একদিন রাত্রে আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরার পথে কী মনে হল, ভাবলাম যাই ঘটাদাকে দেখে আসি। দরজাটা ভেজানোই ছিল—ঢুকে পড়লাম।

স্বল্প আলোয় দেখলাম সারা ঘরে বাচ্চার যাবতীয় সামগ্রী—দুধের বোতল, বেবিফুডের টিন, একটা প্যারাম্বুলেটর, অনেক কাঁথা বিছানো খাট, তাতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘটাদা বসে আছেন। কিন্তু ঘটাদার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম—এ আমি কী দেখছি! এও কি সম্ভব! ঘটাদার দু চোখে অসীম বিস্ময়...।

ঘটাদা অবাক চোখে বাচ্চাটাকে দেখেই চলেছেন, দেখেই চলেছেন...দেখেই চলেছেন। ঘটাদার চোখ মুখ দিয়ে বিস্ময়বোধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘটাদার অবাক হওয়া দেখেছিলাম জানি না।

ঘটাদাই আমায় দেখলেন—কী রে টোটন? আয় আয়, বিচ্ছুটাকে দেখ, জানিস আমার গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখে—কী আশ্চর্য না! মুঠো করে আমার আঙুল চেপে ধরে, ধরতে না দিলেই কী অভিমান! অবাক লাগে, না? দেখ ব্যাটাকে আমার মতোই দেখতে হয়েছে, তাই না? দেখ আমার মতোই থ্যাবড়া নাক, চোখটাও আমার মতোই। ব্যাটা আমার মতোই হাসে—তাই না দেখ দেখ...।

ঘটাদা বিস্ময় বিহ্বল স্বরে বলেই চলেছেন, আমি ভাবছি—ঘটাদা অবাক হচ্ছেন। ঘটাদার মধ্যে এত বিস্ময়বোধ লুকিয়ে ছিল? ঘটাদার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে অন্তহীন বিস্ময়ের সমুদ্রের ঢেউ তার মুখে খেলে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে জমিয়ে রাখা বিস্ময়ের ঝরনা ঝরছে—যা এতদিন লুকোনো ছিল।

আমার মনে হল ঘটাদা কি কারুর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েই অবাক হচ্ছেন? এটা তো ঘটাদার বাচ্চা নয়। নাকি সেই জন্যই তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পেয়েই কষ্ট পেয়ে অবাক হচ্ছেন, অবাক হচ্ছেন তার মধ্যে যে কষ্টবোধ লুকোনো ছিল—যা ঘটাদা জানতেন না, সেটা মনে করে।

ঘটাদাকে আর আমার নির্বোধ মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল ঘটাদা একজন এগিয়ে থাকা, প্রাজ্ঞ, ঋষির মতন মানুষ, যে পারিপার্শ্বিক নীতিবোধের অনেক উর্ধ্বে, যার আয়নায় দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবনের ছায়া পড়ে না। যার আয়নায় তিনি নিজেকে

ছাড়া কাউকে দেখতে পান না বা চান না। তাকে বিস্মিত করার উপাদান পারিপার্শ্বিকতায় নেই, আছে তার নিজের মধ্যে। তাকে অবাক করার ক্ষমতা তিনি নিজেকে ছাড়া কাউকে দেননি।

ওই পুঁটলির মতো বাচ্চাটার মধ্যে সটান নিজেকে দেখে নাকি না দেখেই অবাক হয়েছিলেন—এ কথা জানি না, তবে এ বিস্ময় তার স্বোপার্জিত, এ বিস্ময় তাকে পৃথিবীর অন্য কেউ দেয়নি। এটা বুঝে আমিও ফিরছি অবাক হয়ে, প্রথম মানুষ হয়ে যে ঘটাদাকে প্রথম অবাক হতে দেখল, হ্যাঁ, আমিও ফিরছি আমার চেনা মানুষটাকে চিনতে না পেরে, এক অবাক বিস্ময়ে। তবে এ বিস্ময় আমার স্বোপার্জিত নয়—এটা ঘটাদারই দেওয়া।

ছায়াজগৎ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে বাবলি, নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভালোই দেখতে তাকে, আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে। গায়ের রং ফরসা, ছিপছিপে চেহারা, হাসলে গাল টোল পড়ে। আয়নার সামনে বাবলি একবার হাসল—টোল পড়ল। বাবলি এখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বাবা মারা গেছেন, বালিগঞ্জে তিনতলা বাড়ি, বেশ কিছু টাকা পয়সা রেখে গেছেন। বাড়িতে বাবলি আর তার মা, দুটো কাজের লোক। তিনতলায় বাবলি থাকে, দোতলায় মা আর একতলাটা একটা ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

বাবলির নিজেকে দেখা শেষই হচ্ছে না—শরীরের মধ্যে দু-একটা খুঁত ঠিক বেরিয়ে আসছে। যেমন তার শরীরের মধ্যে তুলনায় বুকটা বেশি ভারী, হাঁ-টা একটু বড়, এই সব আর কী।

যদিও বাবলি জানে এগুলো তার প্লাস পয়েন্ট। এককথায় আকর্ষণীয় বলা হলেও, সঠিক শব্দ হল যৌন আবেদন সম্পন্ন শরীর। আজ বাবলির বন্ধুদের সঙ্গে ডিস্কে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। প্রচুর হুল্লোড় হবে কিন্তু একটাই সমস্যা, সন্দীপ জানে না। সন্দীপকে এ বিষয়ে বাবলি কিছু জানায়নি কারণ সন্দীপ এসব পছন্দ করে না।

সন্দীপ একটু অন্যরকম। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনো করে। আজকালকার ছেলেদের মতো নয়। সে কবিতা পড়ে, সুমন-নচিকেতার গান ভালোবাসে। একটু-আধটু গানও লেখে, হালকা দাড়ি। চোখ দুটোয় যেন আকাশের ভাষা।

সন্দীপ কখনও রাগ করে না। কোনও কিছু খারাপ লাগলে তার চোখ দুটোয় ছায়া পড়ে। বাবলির সেটাই সহ্য হয় না, সে কখনও সন্দীপকে কষ্ট দিতে চায় না।

সন্দীপের সঙ্গে বাবলির সম্পর্কটা যে আসলে কী সেটাই বাবলি ঠিক বুঝতে পারে না। সে যে সন্দীপের সঙ্গে প্রেম করে তা নয়, কারণ তার প্রচুর "আশিক"। সে যে সন্দীপের প্রতি খুব একটা বিশ্বস্ত তাও নয়, সে অনেকের সঙ্গেই অনেক

ফস্টিনষ্টি করেছে, কিন্তু তবুও সন্দীপ তার কাছে একটা আলাদা মাত্রা রাখে। তাদের সম্পর্কের কোনও নাম সে এখনও দিতে পারেনি।

আজকের কথাটা সন্দীপ জানতে পারলে হয়তো কষ্ট পাবে। যাক সে পরে ম্যানেজ করে নিলেই হবে। বাবলির মোবাইল বেজে ওঠে—হাই! আমি তো প্রায় রেডি—হ্যাঁ, নীচে এসে—একটা রিং করলেই আমি নেমে যাব, বাই..., বাবলি এবার সাজার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

পার্কস্ট্রিটের এক ডিস্ক। একদল ছেলেমেয়ে উদ্দাম নাচছে, প্রচণ্ড শব্দ, কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না, বাবলিরা একপ্রস্থ নেচে, একটু বসে বিয়ার খাচ্ছে। বাবলি স্কিনটাইট একটা কালো ড্রেস পরেছে। শরীরটা যেন ফেটে বেরোচ্ছে। আশেপাশের প্রচুর চোখ যে তাকে গিলে খাচ্ছে বাবলি সেটা বুঝতে পারছে এবং এনজয়ও করছে। এরই মধ্যে দু-চারটে ছেলে ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল, ও পাত্তা দেয়নি। বাবলি আর ওর বন্ধুরা আড্ডা মারছিল, এমন সময় একজন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, সবাই ফিসফিস করছে। বাবলি দেখল চিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রানী, বাংলা সিরিয়াল ও ছবির দামি নায়িকা, সঙ্গে সুন্দর দেখতে একজন মানুষ। বাবলির বন্ধু অশোক বলে, ফিগারটা হেভি তাই না? পিংকি বলে ছাড় তো, ও বুড়ির বয়স কম হল নাকি?

অশোক বলে—What is in age darling ? স্কিনটা দেখেছিস—যন্ত্রপাতিগুলো দ্যাখ। বাবলি বলে,—ওগুলো প্যাড দেওয়া। এরই মধ্যে কয়েকজন চন্দ্রানীর অটোগ্রাফ নিচ্ছে। চন্দ্রানী গর্বিত ভাবে অটোগ্রাফ দিচ্ছে। এক সময় চন্দ্রানী উঠে তার সঙ্গীকে নিয়ে ফ্লোরে গিয়ে নাচতে শুরু করে।

অশোক বলে,—Who is that gentleman ? পিংকি বলে,—হবে কোনও বড়লোকের ছেলে। যদিও বলছে পিংকি কিন্তু কোথায় যেন একটা ঈর্ষার গন্ধ পাওয়া গেল—সেটা বাবলি বুঝল।

মিউজিকের ছন্দ বদলে গেছে। এবার ফ্লোরে সবাই ক্লোজ ডান্স করছে। অশোক, পিংকি, রাকেশ সবাই উঠে নাচছে। বাবলি বসে বসে বিয়ার খাচ্ছে আর ওদের দেখছে। দেখছে সবাই কেমন চন্দ্রানী আর তার সঙ্গীকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে নাচার সুবিধার জন্য। চন্দ্রানী তার সঙ্গীর কণ্ঠলগ্না হয়ে নাচছে আর মোহময়ী হাসি হাসছে। মাঝে মাঝে সঙ্গীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী সব বলছে। বাবলি দেখছে সবাই নাচছে কিন্তু সবার চোখই ওদের দিকে। বাবলির হঠাৎ মনে হল বাড়িতে একটা ফোন করতে হবে। সে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে কাউন্টার থেকে তার ব্যাগটা চেয়ে মোবাইলটা বের করে ফোন করতে গিয়ে দেখে—অনেকগুলো মিস্‌ড কল। সন্দীপের একটা SMS আমি জানি তুমি কোথায়! বাবলির মাথাটা গরম হয়ে গেল—

সে কি সন্দীপের ক্রীতদাসী নাকি? সে কোথায় সেটা সন্দীপ জানলেই বা কী? রাগটাকে উসকে দেওয়া নানা ভাবনা মাথায় জমা হতে থাকে। হঠাৎ কী ভেবে সে আবার ভেতরে ঢোকে বাকি বিয়ারটা এক চুমুকে মেরে দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রানীর পুরুষ সঙ্গীর পিঠে হাত রেখে বলে Can I dance with you? সঙ্গীটি তখন চন্দ্রানীর সঙ্গে ক্লোজ ডান্স করছিল—হঠাৎ এই ধরনের প্রস্তাবে একটু বিব্রত। সবাই নাচ থামিয়ে ওদের দেখছে। চন্দ্রানীর মুখটা থমথমে কিন্তু সবাই দেখছে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে, হাত ঝাঁকিয়ে বলে,—I would not mind. বাবলি এবার তার নব সঙ্গীটির বাহু বন্ধনে, চন্দ্রানী এবার বসে বসে ওদের দেখছে। একটা হুইস্কি নেয়, সবাই ওদের দেখছে, বোধহয় মজাও পাচ্ছে।

বাবলি সঙ্গীটির সঙ্গে একটু ঘন হয়, সঙ্গীটির বুকে, বাবলির বুকের স্পর্শ হয়। বাবলি মনে মনে হাসে—এটা বাপু প্যাড নয়। সঙ্গীটিও সেটা বোধ হয় বোঝে—উত্তেজনায় তার শরীর শক্ত হয়। বাবলির বেশ মজা লাগছে...।

বাবলির মাথা ঝিম ঝিম করছিল—কতক্ষণ নাচছে কে জানে। এক সময় চন্দ্রানী এগিয়ে এসে সঙ্গীটিকে বলে,—OK Subir, you can dance, but I am leaving.

সঙ্গীটি এখন বাবলির শরীরের গন্ধে মগ্ন—এই অবস্থায় কী করবে ভেবে উঠতে পারে না, ইতস্তত করে। চন্দ্রানী দুম দুম করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গীটি বাবলিকে sorry বলে, চন্দ্রানীর পিছনে ধাবমান হয়, তাকে ওরকম ছুটতে দেখে মনে হচ্ছে—রাধে, মনটা রেখে এলি বল কোন মথুরায়। বাবলি ফ্লোরের মাঝে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে হাসে। সবাই হাসছে, কেউ কেউ বাবলির জন্য হাততালি দিতে শুরু করে। এক সময় হাততালিটা সংক্রামিত হয়। মাথার ওপর লাইট ঝুলছে—হাততালির শব্দ—বাবলি কোমরে হাত দিয়ে, মাথা ঝুকিয়ে বাও করছে। বাবলির মনে হচ্ছে—সে চন্দ্রানীর চেয়েও বড় স্টার এখন।

কাল সাররাত বাবলির ঘুম হয়নি। বারবার চন্দ্রানীর মুখটা চোখে ভাসছিল, হাসিও পাচ্ছিল। একটু আগে সন্দীপের ফোন এসেছিল, সে আসছে। বাবলি সব বলে দিয়েছে তাকে। সন্দীপ কষ্ট পেয়েছে কিনা বাবলি বোঝেনি কারণ ফোনে চোখ দেখা যায় না। সন্দীপ এসে সোফায় বসল, বাবলি তার পাশে—।

সন্দীপ বলে,—এতে এতো খুশি হওয়ার কী আছে? ওই লোকটা একজন পুরুষ মানুষ, যার নতুন নতুন মেয়ের প্রয়োজন। চন্দ্রানীর বদলে তুমি—তুমি না থাকলে অন্য কেউ হত—এতে তোমার আনন্দ পাওয়ার কী আছে?

বাবলি বলে,—ঠিক আছে বাবা, আর আনন্দ পাব না, একটা চুমু দাও।

সন্দীপ ইতস্তত করতে থাকে। বাবলি সন্দীপের কোলের ওপর বসে পড়ে,

ওর জামার বোতাম খুলতে থাকে...।

খানিক পরে সন্দীপ উঠে দাঁড়ায়, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলে—কাল তোমার ফোন না পেয়ে টেনশন হচ্ছিল, ভাবছিলাম কী হল আবার। আমি তো মাসিমার কাছ থেকে শুনেছিলাম তোমার ডিস্কে যাওয়ার কথা। তারপর ভাবলাম—আমায় জানানো নেই বলে হয়তো ভয়ে ধরছ না, তাই SMS করেছিলাম।

বাবলি জামাকাপড় ঠিক করতে করতে বলে,—আমি কি তোমায় ভয় পাই নাকি?

সন্দীপ বলে,—না, আমি ভয় পাই তোমার সাহসকে।

বাবলি হাসতে হাসতে বলে,—সাহসের তুমি আর কী দেখলে, কাল যখন লোকটাকে বধ করলাম না! চন্দ্রানীর মুখ দেখলে বুঝতে! ও খালি ভাবছে—মেয়েটার কী সাহস! বাঘের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয়?

সন্দীপ হতাশভাবে বাবলির দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর ধীরে ধীরে বলে,—তুমি শুধু তোমার বয়স আর শরীরটাকে পুঁজি করছ, চন্দ্রানী কিন্তু ভালো অভিনেত্রী।

বাবলি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াতে আচড়াতে বলে,—আমি ওর চেয়েও বড় অভিনেত্রী হতে পারি।

বালিগঞ্জ গেস্ট হাউসের সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে বাবলি ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢোকে। আশেপাশের লোকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে সে বুঝতে পারে—কারণ সে এমন একটা পোশাক পরেছে যার মধ্যে দিয়ে তার শরীরের অনেকটাই দেখা হচ্ছে।

রিসেপশনে জিগ্যেস করে—Room No. 201? লোকটা বলে,—Upstair।

বাবলি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝতে পারে রিসেপশন-এর লোকটা পেছন থেকে ওর শরীরের তরঙ্গ দেখছে। সে 201-এ দরজায় নক করে। মাঝবয়সি মোটা একটা লোক দরজা খোলে।

বাবলি বলে,—মিস্টার শেঠী?

লোকটা বলে,—আপ বাবলিজি?

বাবলি হাসে—লোকটা তাকে ভেতরে নিয়ে যায়।

আপনার কথা সুবীরজির থেকে এত শুনেছি। বসুন কী লিবেন, বিয়ার না হুইস্কি।

বাবলি একটা হুইস্কি নেয়।

শেঠী বলেই চলে—আপনার শকুন্তলার পাইলট দেখলাম—ওঃ! মাইন্ড ব্লোইং। আপনাকে তো হেভি সেক্সি লেগেছে। তা আমার ছবিতে তো আপনাকে হিরোইন করতে পারব না—সেটা তো চন্দ্রানীই হবে। তবে সেকেন্ড লিডটা দিতে

পারি। একটু এক্সপোজ করতে হবে, কি...রাজিই তো। শেঠীর চোখে হুইস্কির রং।

বাবলি হাসে...কিন্তু আপনার ডিরেকটর তো আমায় পছন্দই করে না। শেঠী বলে,—মারুন গোলি ডিরেকটরকে। পয়সা আমি দিব—আমি যা বলব তাই হোবে। শেঠী এসে বাবলির পাশে বসে। ওসব আপনি আমার হাতে ছাড়ুন। শেঠী তার হাতটা বাবলির উরুর ওপর রাখে—আস্তে আস্তে চাপ দেয়, বাবলি খিল খিল করে হেসে ওঠে—ওঃ, শেঠীজি, সুড়সুড়ি লাগছে।

শেঠী উৎসাহ পায়, আর কোথায় কোথায় সুড়সুড়ি লাগে আপনার—একটু দেখব?

বাবলি হাসতে হাসতে শেঠীর গায়ে ঢলে পড়ে। বাবলির লো-কাট টপের ওপর দিয়ে অনেকটা উঁকি মারা বুকের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় শেঠীর মুখ লাল হয়ে যায়।

বাবলি তখন বলে,—আপনার ডিরেকটরকে ফোন করে বলুন কথাটা। শেঠী তখন পাহাড় থেকেও ঝাঁপ দিতে পারে, উঠে একটা নম্বরে ফোন করে—হাঁ প্রণববাবু, সেকেন্ড লিডটা বাবলিজি হি করবেন। সে...বাকি আপনি বুঝবেন...। হ্যাঁ...একরকম ফাইনাল। নো স্ক্রিন টেস্ট...পরশু থেকে শুটিং। তারপর ফোন রেখে বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল,—কী খুশি তো...বাবলি হাসে। শেঠী এগিয়ে আসে বাবলির দিকে, বাবলির কোমর জড়িয়ে বলে,—সুবীরজির থেকে শুনেছি আপনি নাকি সেক্স বম্ব আছেন?

বাবলি হাসতে হাসতে শেঠীর প্যান্টের বেল্ট খুলতে থাকে...।

ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছে বাবলি। রাত বাড়ছে। ট্যাক্সিটা হু হু করে ছুটছে। শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বাবলি শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

শেঠীকে সন্তুষ্ট করা গেছে অর্থাৎ শেঠীর ছবিটা পাকা। সিরিয়াল থেকে ফিচার ফিল্মে, বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু সারা শরীরে ব্যথা—লোকটা খামচাখামচি করে বেশি আনন্দ পায়, বুক দুটো টনটন করছে। যদিও ব্যাপারটা নতুন নয়, প্রায় দেড় বছর ধরে—বহুজনের সঙ্গেই—প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। শুরু সেই সুবীর বাজোরিয়াকে দিয়ে। সুবীর বাজোরিয়াই চন্দ্রানীর সেই সঙ্গী। ডিস্কে যাকে গেঁথেছিল বাবলি।

সেই ঘটনার দুদিন পরেই লোকটা বাবলিকে ফোন করে। কোথা থেকে ফোন নাম্বার জোগাড় করেছিল কে জানে?

সুবীর একজন প্রোডিউসার। সে-ই বাবলিকে অভিনয় জগতে আসার প্রস্তাব দেয়। অনেক ভেবে রাজি হয় বাবলি। তারপর একদিন সুবীর একটা গেস্ট হাউসে দেখা করতে বলে বাবালিকে। বাবলির বেশ ভয় লাগে। প্রথমদিন সে সন্দীপকে

সঙ্গে নিয়ে যায়। সন্দীপ বাইরে অপেক্ষা করে, বাবলি ভেতরে যায়।

সেদিন সুবীর বাবলির সঙ্গে অনেক কথা বলে। ডিরেক্টরকে ডেকে পাঠায় বাবলির সঙ্গে তার কথা বলিয়ে দেয়, আসার সময় খালি হাত ধরেছিল।

সেই সিরিয়ালটা শেষ পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু সুবীরের সঙ্গে অনেক কিছু হয়েছিল।

সুবীর তখন বাবলির জন্য পাগল। বাবলি ততক্ষণে বুঝে গেছে—এই লোকটাই তার চাবি—একে দিয়েই সব তালা খুলতে হবে।

নিত্যনতুন কামকলার পাঠ পড়াতে লাগল সে সুবীরকে, আর সুবীরের অবস্থা না বলাই ভালো। কারণ বাবলির এ গুণের কোনও তুলনাই নেই। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো তার প্রাণশক্তি, জীবনশক্তি যেন শুষে নেয় বাবলি। এমন একটা সময় এল যখন বাবলির সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটানোর জন্য সুবীর সব কিছু করতে পারে। বাবলি তখন আর সময় দিচ্ছিল না তাকে। বাধ্য হয়ে সুবীরকে আবার প্রোডাকশনে নামতে হল—শকুন্তলা। প্রথম চরিত্রে বাবলি। এবার বাবলি তালার সন্ধান পেল। একটার পর একটা তালা। আজ এখন যেমন একটা তালার নাম—শেঠী।

সন্দীপ সব দেখে শুনে হতাশ হয়ে বলেছিল—এ জগৎটা বাস্তব নয়, এটা তুমি পরে বুঝতে পারবে।

বাবলি বলে,—ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং। তুমি একবার শুটিং-এ এসো বুঝতে পারবে। সন্দীপের মুখে এই প্রথম বাবলি ঘৃণার কালো রং দেখেছিল। সন্দীপ বলে,—তোমার ওই জগৎ এবং জগতের মানুষগুলোর ওপর আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই, আমি তোমাদের ওই জগতের বাইরেই থাকতে চাই।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে—বাবলি সম্বিত ফিরে পায়।

শেঠীর ছবির শুটিং চলছে।

বাবলির প্যাক আপ হয়ে গেছে। শেঠী তাকে একটা গাড়ি দিয়েছে। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় ডিরেকটার প্রণব রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে বলে,—আপনাকে প্রণবদা ডাকছে।

বাবলি মনে মনে ভাবে, কী জানি লোকটা কী বলবে? লোকটা তো তাকে ভালো চোখে দেখে না।

—কী ব্যাপার প্রণবদা?

প্রণব মাথার টুপি খুলে হাওয়া খাচ্ছিল তার ঘরে বসে, বলে,—আজ তোমার কী প্রোগ্রাম?

বাবলি চট করে ভেবে নেয়—প্রণব রায়ের হাতে তিনটে ছবি। বলে,—কিছু না।

প্রণব বলে—তাহলে আজ চলো না কোথাও ডিনার করি।

বাবলি মনে মনে ভাবে—বাঃ তুমিও। তারপর মিষ্টি হেসে বলে,—বেশ তো।

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে ওরা বসে, প্রণব প্রায় মাতাল। তার জীবনের নানা দুঃখের কথা বলে চলেছে। বাবলি মন দিয়ে শুনছে আর ভাবছে—এত কথা তাকে লোকটা শোনাচ্ছে তো একটাই কারণে যাতে দয়া পরবশ হয়ে সে একটু 'আহা রে' বলে।

সত্যি সন্দীপ ঠিকই বলে তোমাদের জগতের মানুষগুলো বাস্তব আর অভিনয় জগৎটাকে মিলিয়ে ফেলে একদিন।

লোকটা পা দিয়ে বাবলির পা ঘসছে টেবিলের তলায়, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। এবার লোকটাকে বাবলির অসহ্য লাগতে শুরু করে।

এমন সময় দরজা খুলে একজন লোক ঢুকল তার দুপাশে দুজন মুশকো টাইপের লোক। সে ঢোকার পরই ওয়েটাররা ছুটে গেল...একটা গুঞ্জন শুরু হল।

Welcome Sir, হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এল।

প্রণব রায়ের নেশা ছুটে গেছে লোকটাকে দেখে। লোকটা একটা সাদা শেরওয়ানি পরে আছে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি। কামানো মুখ, বয়েস কত হবে—৩৬-৩৭। কিন্তু চোখ দুটো দেখার মতো—তীক্ষ্ণ, বাজপাখির মতো।

ম্যানেজার বলে,—কী করতে পারি স্যার, আপনার জন্য?

লোকটার বাজপাখি চোখে যেন ছায়া পড়ল। তীক্ষ্ণতার আড়ালে কোমলতার মেঘ দেখা দিল। আমার ছেলেকে খাওয়াতে এনেছি। তার বিশাল চেহারার আড়ালে এবার দেখা গেল ফুটফুটে একটা বছর সাতেকের ছেলে কালো শেরওয়ানি পরে দাঁড়িয়ে।

ম্যানেজার তাদের নিয়ে একটা টেবিলে বসায়। গোটা রেস্টুরেন্টের তৎপরতা বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

বাবলি প্রণবকে জিজ্ঞাসা করে—লোকটা কে?

প্রণব চোখ বড় বড় করে বাবলির দিকে তাকায়—জানো না? ডেনজারাস লোক—আফতাব কুরেশি।

বাবলির চোখের ওপরে খবরের কাগজের কতগুলো হেডলাইন ভেসে উঠল... কিং অফ দা ডক, মাফিয়া ডন, ১৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি...বাবলি লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে—কই তেমন ডেনজারাস তো মনে হচ্ছে না!

লোকটা ন্যাপকিন বেঁধে দিচ্ছে ছেলের গলায় পরম যত্নে।

প্রণব তখন আর মদ খাচ্ছে না। কেমন উশখুশ করছে। বাবলিকে বলে,—বাবলি, তুমি একটু বোসো, আমি একবার আফতাবের সঙ্গে দেখা করে আসি। বাবলি অবাক হয়—কেন? আমি একা একা বসে থাকব নাকি?

প্রণবের চোখ দুটো চকচক করছে। বাজারে জোর খবর আছে, আফতাব

নাকি ফিল্মে টাকা খাটাতে চাইছে, এটাই সুযোগ, please একটু cooperate করো, ছবি হলে তুমিই হিরোইন হবে।

প্রণব উঠে যায়। আফতাবের টেবিলের সামনে দিয়ে দাঁড়ায়। দাঁত বার করে কী সব বলে বাবলি কিছু বুঝতে পারে না।

একসময় প্রণব হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, চল বাবলি, আফতাব আমাদের ওর সঙ্গে জয়েন করতে বলছে। হাত ধরে প্রণব তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাবলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে আফতাবের সামনে বসে।

ছেলের খাওয়া তখন শেষ। আফতাব পরম স্নেহে ছেলের মাথায় হাত বোলায়,—অওর কুছ লেনা হ্যায়?

ছেলে মাথা নাড়ে।

আফতাব এবার প্রণবদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,—বলুন আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি।

প্রণব প্রায় বিগলিত কণ্ঠে বলে,—স্যার, আপনি চাইলেই আমাদের এই মরা ইন্ড্রাস্ট্রিটা আবার বাঁচে। তারপর কথাবার্তা শুরু হয়। বাবলি দেখে আফতাব কথার মাঝে মাঝে বাবলিকে লক্ষ করছে। মোটামুটি এক জায়গায় কথা শেষ হয়। প্রণব একটা বাজেট করে আফতাবের অফিসে পরের দিন যাবে। ওরা সবাই উঠে দাঁড়ায়।

আফতাব এবার সরাসরি বাবলির দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল,—আমি কি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি?

বাবলি অস্বস্তিতে পড়ে—না মানে আমি...আর প্রণবদা...

প্রণব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—না না যাও না...উনি যখন তোমায় নামিয়ে দিতে চাইছেন...তো যাও না।

প্রণবকে কেমন দালাল দালাল মনে হচ্ছিল বাবলির, খানিক ভেবে বলে,—বেশ চলুন। বিশাল একটা গাড়ি, এ গাড়িটার নাম জানে না বাবলি। ভেতরে কনকনে ঠান্ডা, নিশ্চয়ই দুটো এসি আছে। ড্রাইভার আর পেছনের সিটের মধ্যে একটা পরদা আছে যেটা টানা। ওরা পাশাপাশি বসল।

গাড়ি স্টার্ট হওয়া মাত্র আফতাব এক ঝটকায় বাবলিকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে তার ঠোঁট দুটো বাবলির ঠোঁটের ওপর...ঘটনার আকস্মিকতায় বাবলি থতোমতো, স্তম্ভিত। সম্বিত ফিরতে দেখল ততক্ষণে আফতাব তার টপটা টেনে প্রায় খুলে ফেলেছে—তার ভারী বুকে মুখ ঘষছে। এক সময় মুখ তুলে খানিকটা আদেশের ভঙ্গিতেই বলে—প্যান্ট উতারো!

বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বাবলি। নীচের তলায় মা ঘুমোচ্ছে। অনেক রাত। নিজেকে কেমন বেশ্যা মনে হচ্ছে তার। আফতাব আজ যে ভাবে

তাকে ব্যবহার করেছে গাড়ির মধ্যে তাতে নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে হওয়ার কোনও কারণই সে খুঁজে পাচ্ছে না। সন্দীপকে ভীষণ মনে পড়ছে তার এখন। সন্দীপ যদি সবটা জানতে পারে তা হলে তাকে যে কত ছোট ভাববে...বাবলির চোখে জল আসে। মনে হচ্ছে সন্দীপের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারলে বোধহয় তার হারানো সম্মানের খানিকটা পুনরুদ্ধার হত।

কিন্তু কী আশ্চর্য আফতাবের তাচ্ছিল্যটাও কেমন যেন ভুলতে পারছে না—যেমন ভুলতে পারছে না আফতাবের স্পর্শ, সত্যিকারের পুরুষের মতো।

মোবাইলটা বাজছে—বিছানায় শুয়ে বাবলি ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে। অ্যাটাচড বাথরুম থেকে খালি গায়ে টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আফতাব বেরোল। ওর সকালে ওঠার অভ্যেস। এসে মোবাইল তুলে বলে,—হাঁ বোল। খানিকক্ষণ চুপ করে কী শোনে, তারপর আদেশের সুরে বলে,—আজ রাতকে অন্দর উসে টপকা দে। তারপর ফোন রেখে বাবলির পাশে বসে সামনে রাখা টি-পট থেকে চা বানিয়ে বাবলির দিকে এগিয়ে হেসে বলে,—গুডমর্নিং! বাবলি হাসে—চা নেয়।

আফতাব উঠে ফলের রস খায়, ও চা খায় না। আর তারপর জামাকাপড় পরতে পরতে বলে আমি একটু বেরোচ্ছি—ছোট গাড়ি আর মুর্তজা রইল। তুমি চাইলে ঘুরে আসতে পারো। সন্ধেবেলার মধ্যে চলে এসো আমি ঢুকে যাব। তারপর বাবলির মাথায় হাত বুলিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

এটা আফতাবেরই একটা হাউস। মাঝে মাঝে কয়েকদিন এখানে এসে আফতাব বাবলির সঙ্গে থাকে। শহর থেকে খানিকটা দূরে—নির্জনে।

প্রণব রায় আফতাবের টাকায় ছবি বানিয়েছে, সে ছবি এখনও রিলিজ হয়নি, হয়তো সামনেই হবে। শুটিং-এর সময় আফতাব বাবলির সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়। বাবলি এবার চায় না। আফতাব নিজে চলে আসে বাবলিদের বাড়িতে। সারা পাড়ায় উত্তেজনা। আফতাব কুরেশি এসেছে।

গোটা দশেক বডি গার্ড বাবলিদের বাড়ি ঘিরে। আফতাব তিনতলায় বাবলির ঘরে।

বাবলি আফতাবকে বলে,—কেন এসেছেন?

আফতাব বলে,—চলো মেরে সাথ।

বাবলি বিস্মিত কণ্ঠে বলে,—কী মনে করেন আমায়, আমি কি বাজারের?

আফতাব বলে,—ইয়ে দুনিয়া এক মান্ডি হ্যায়। ম্যায় ভি বাজারু হু। একটু

চুপ করে আবার ধীরে ধীরে বলে,—অওর তুম ভি।

বাবলি বলে,—আপনি ভুল করছেন, আমি একজন অ্যাকট্রেস।

আফতাব বলে,—ঠিক হ্যায়, তো চলো, মেরে সাথ ভি এক্টিং করো—প্যার কা।

বাবলি কী বলবে ভেবে পায় না।

আফতাব ধীরে ধীরে বলে,—আমার জীবনে কাউকে প্রথম এভাবে পছন্দ হয়েছে, তুমি চাইলে আমি তোমায় বিয়েও করতে পারি? কিন্তু আমি জানি তুমি তা করবে না কারণ আমার জীবন যে কোনওদিন আমায় ঠকাতে পারে, কিন্তু কী করব? তোমাকে তো চাই, অওর ও ভি কিসি ভি কীমত পর। বাবলি আফতাবের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ করে। আফতাবের চোখে আর কাঠিন্য নেই কেমন ছেলেমানুষের মতো ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি!

সেই থেকে শুরু—এখন বাবলি আফতাবের ছত্রছায়ায়।

সন্দীপের একটা চিঠি এসেছে। এখন সন্দীপ পালামৌ এর কাছে একটা মিশনারি স্কুলে পড়ায়। মাঝে মাঝে বাবলিকে চিঠি লেখে।

সন্দীপ লিখেছে, তার জায়গাটা ভীষণ ভালো লাগছে। নির্জন, শহরের দূষণ এখনও সেখানে পৌঁছায়নি। ঠিক এরকমই একটা জীবন সে চেয়েছিল—শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

সন্দীপ আরও লিখেছে—বাবলির অভিনয়ের ভূতটা যদি কখনও ঘাড় থেকে নামে তবে যেন সে সেখানে চলে যায়। আর কেউ পাশে না থাকলেও, সন্দীপ অবশ্যই থাকবে।

চিঠিটা পড়ে বাবলির মনটা খারাপ হয়ে গেছিল। মনে হয়েছিল যদি সত্যিই চলে যাওয়া যেত! পরক্ষণে মনে হয়েছিল এখানকার এতসব ছেড়ে? অসম্ভব!

বাড়িতে এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে।

বাবলির মা আবার বিয়ে করতে চলেছে—পাত্র অবিনাশকাকু। অবিনাশকাকু বাবার বন্ধু ছিলেন। মার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা ছিলই, বাবলির তাতে কিছু মনে হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর মা একদম একলা হয়ে গেছিল। একজন সঙ্গী হিসেবে অবিনাশ কাকু ঠিকই ছিল—কিন্তু একেবারে জীবনসঙ্গী! বাবলি ঠিক মানতে পারছে না। তা ছাড়া অবিনাশকাকুর সংসার আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে। তারা প্রায় বাবলিরই বয়সি।

বাবলি মায়ের মুখোমুখি হয়। এই বয়েসে বিয়ে করার কোনও মানে হয়?

—সারাদিন একা একা থাকি, তুই তো আছিস তোর জগৎ নিয়ে—কী করব বল? মা বলে।

বাবলি জানায়,—তার জন্য বিয়ে করার কী আছে? লিভ টুগেদার করো।

মা তীক্ষ্ণস্বরে বলে,—আমি কি তোর মতো হাফ গেরস্থ নাকি? দরকারে যার তার সঙ্গে থেকে যাব?

বাবলি একটা বিরাট ধাক্কা খায়। চুপ করে বেরিয়ে আসে মায়ের ঘর থেকে।

ভাবে—আর এ বাড়িতে নয়।

শুটিং-এ কিছুতেই মন দিতে পারছে না বাবলি। আজ খবরের কাগজে তার একটা ছবির রিভিউ বেরিয়েছে, তার সম্পর্কে লিখেছে—এতদিনেও উনি অভিনয়টা শিখলেন না, শুধু শরীর, শরীর, আর শরীর।

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে বাবলির—আমি অভিনয় জানি না? শুধুই শরীর? বেশ যদি শরীর খাটিয়েই আজ এই জায়গায় পৌঁছে থাকি তাতে কী? শরীর খাটাতেও তো অভিনয় লাগে। শুধুই একতাল মাংসের মতো যদি সে প্রোডিউসার-ডিরেক্টরদের বিছানায় থাকত তাহলে কি ওই লোকগুলো ইমপ্রেসড হত? সেখানে অভিনয় ছিল না? মোহময়ী, লাস্যময়ী, সেক্স বম্ব হয়ে থাকার জন্য অভিনয় করতে হয়নি? নইলে ওই ধরনের মানুষগুলোর সঙ্গে রিয়াল লাইফে কারুর কোনওরকম ক্রিয়েটিভ কিছু করা সম্ভব নয়। মেদ সর্বস্ব শরীর, মাতাল, মুখে গন্ধ, এক এক জনের এক এক রকম পারভারশান, এই সমস্ত লোকদের স্যাটিসফাই করা এবং নিজে স্যাটিসফাইড হওয়ার ভান করা—এগুলো অভিনয় নয়?

শুটিং-এর মাঝখানে টেকনিক্যাল কারণে একটা ব্রেক হয়েছে। ক্যামেরা কাঁধে একটা ছেলে এবং একটি মেয়ে এসে বলে ম্যাডাম একটা ছোট ইন্টারভিউ...। বাবলি ছেলেটাকে চেনে, বাংলার একটি টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার। আগেও তার ইন্টারভিউ নিয়েছে। এর আগে একবার বিষয় ছিল, কোনও অভিনেত্রীর ফিল্মে নাম করতে গেলে কি অভিনয় ছাড়া আর কিছু দিতে হয়? মানে কোনও দাম দিতে হয় কি না। বাবলি তখন মোটামুটি নাম করেছে। বাবলি টিপিক্যাল হিরোইনদের মতো বাধা বুলি শুনিয়েছিল—অভিনয়ই শেষ কথা, অন্য কিছু দিতে হয় না। যে ভালো অভিনয় করে তাকে অন্য কিছু কেন দিতে হবে? এটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি—ব্রথেল নয়। এই ইন্টারভিউ-এর খুব প্রশংসা হয়। সেই ছেলেটাই আবার তার ইন্টারভিউ চাইছে। কিন্তু আজ বাবলির মাথার ঠিক নেই। সে বাড়ি ছেড়ে এসেছে। আফতাব তাকে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে। তার মানে সে চব্বিশ ঘণ্টা আফতাবের নজরদারিতে।

তাছাড়া একটাও ভালো রোল পাচ্ছে না যাতে সে অভিনয় ক্ষমতা দেখাতে পারে। সবই কম জামাকাপড় পরা ক্যারেক্টার। তার ওপর আজকের কাগজে এই

লেখা। শরীর-শরীর আর শরীর—বাবলির মাথায় আগুন জ্বলছে।

বাবলি রিপোর্টারকে বলে,—তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করো।

ক্যামেরা রেডি করেই তাড়াতাড়ি ছেলেটা মাউথপিস এগিয়ে দেয়—ম্যাডাম, ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কথার খুব চর্চা হচ্ছে, আপনি এত একস্‌পোজড হন কেন? আপনার অভিনয় প্রতিভা কম বলেই কি? মানে তাই কি শরীর দেখানো?

বাবলি নিজেকে সংযত করে, ভাবে সে মাথা গরম করবে না। বলে,—অন্য কোনও প্রশ্ন করো।

ছেলেটা আবার প্রশ্ন করে, এবার ঘুরিয়ে—আপনার অভিনয়ের তো কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, কোনও ট্রেনিং নেই, আপনি কি মনে করেন কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনও পেশায় সফল হওয়া যায়? মানে, কোনও লোক ডাক্তারি পাশ না করে কি অপারেশন করতে পারে? বাবলি বলে,—অভিনয়টা মানুষ জন্মসূত্রে পায়—তার জন্য সবার ট্রেনিং এর দরকার হয় না।

ছেলেটা মুচকি হাসে,—আজকের কাগজটা দেখেছেন?

ব্যস! বাবলি আর সামলাতে পারল না নিজেকে, চিৎকার করে ওঠে,—কালকের ছোকরা তুমি কী জানো হে—অভিনয়ের তুমি কতটা জানো? বাবলি রাগের চোটে ভুলেই গেল ক্যামেরা চলছে। চিৎকার করতে শুরু করল। ডিরেক্টর অপূর্ব বোস ছুটে এল—বাবলি, কী যা তা বলছ? ক্যামেরা অন রয়েছে।

বাবলি এবার সম্বিত ফিরে পায়, সোজা ফ্লোর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসে—গাড়ি চলতে শুরু করে। এখন তার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভুল হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকজন বসে, সাংবাদিক আদিত্য বোস, ডিরেক্টর অপূর্ব বোস, প্রণব রায় ইত্যাদি। বাবালিরই ফ্ল্যাট, বাবলিও বসে। সবাই স্কচ খাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ থমথমে।

আদিত্য বলে,—আমার দিক থেকে যতটা পারব চেষ্টা করব। তারপর দেখা যাক।

অপূর্ব বলে,—বাবলি যা করে ফেলেছে সেটা ভুলে যান আদিত্যবাবু, মানুষের মনের অবস্থা তো সবসময় এক থাকে না।

আদিত্য বলে,—সে তো আমি বুঝলাম কিন্তু গোটা পশ্চিমবঙ্গ তো বুঝবে না। যারা ওই ইন্টারভিউ টিভিতে দেখেছে। প্রণব বলে,—কিছু একটা করুন। ওর কেরিয়ারটা তো শেষ হয়ে যাবে!

আদিত্য বাবলির দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনাদের, মেয়েদের মাথায় কেন ভগবান একটু বুদ্ধি দিল না বলুন তো? একটু থেমে সবার দিকে তাকিয়ে বলে,—ওই ইন্টারভিউটা দেখার পর আর কী কী হবে জানেন? বাবলি দেবীর সঙ্গে

কোনও প্রোডিউসার কাজ করবে না, ডিরেক্টররা তো নয়ই। অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসরাও করবে না, আপনারা আমার কথা মিলিয়ে নিতে পারেন। বাবলি মাথা নীচু করে থাকে। বাকিরা সবাই বাবলির আসন্ন বিপদের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা ভাবতে থাকে আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

বাবলি বসেই থাকে সোফাতে, এক সময় সবাই নিখরচায় মদ্যপান করে—একে একে প্রস্থান করে। বাবলি বসেই থাকে। এত কষ্টে তৈরি করা তার স্বপ্নের জগৎটা ভেঙে যাবে? সে ভাবতেই পারছে না! তবে ভাঙতে যে শুরু করেছে সেটা সে ভালোই বুঝতে পারছে। কারণ সকাল থেকে যতজন প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটারকে সে ফোন করেছে—সবাই অশ্লীল গালাগালি দিয়ে ফোন রেখে দিয়েছে। অথচ একদিন এই সমস্ত লোকগুলোই তাকে একটু ছোঁয়ার জন্য ছটফট করত। সন্দীপের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে বাবলির—বন্ধুরা চলে গেছে/একে একে পথ ধরে/বিশ্বাস সন্দেহে ঢাকা/আমার স্বপ্ন দেখা/পৃথিবী মুঠোয় রাখা/মুঠো খুলে বিলকুল ফাঁকা।

সন্দীপের একটা চিঠি এসেছে সুদূর পালামৌ থেকে, লিখেছে—ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে, গাত্রে কি এখনও ব্যথা অনুভব করছ না? একটা মিথ্যে জগতের পেছনে ছুটে বেড়ানোর যে কী আনন্দ সেটা আমি এখনও বুঝতে পারলাম না। এই নির্জন প্রকৃতির মাঝে এসে একবার দাঁড়াও, ভুলে যাবে তোমার স্পট লাইটের উত্তেজনা। অন্ধকার আকাশের দিক তাকিয়ে ছাদের ওপর শুলে দেখা যায় অসংখ্য তারা খসা। জানো প্রত্যেকদিন কত তারা যে ঝরে যায় তার হিসেব নেই। সে সব তারাদের কোনও দুঃখ থাকে না মনে হয় ঝরে যাওয়ার সময়। কেমন মনের আনন্দে আকাশকে বিদায় জানায়, তারপর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে ছাই হয়ে যায়। একবার যদি আমার এখানে এসে এসব দেখতে, তোমার নকল জগৎটায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করত না।

বাবলি ভাবে, এখনও তার ঝরে যাওয়ার সময় হয়নি—এখনও সে স্টার। সমস্যার পর সমস্যা। আফতাব শহর-ছাড়া। আফতাবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তাতে বাবলির কোনও অসুবিধা নেই। আফতাব ইউ.পি.-তে বসে কলকাতার সাম্রাজ্য চালাচ্ছে—বাবলির খবরও নিচ্ছে। বাবলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অলিখিত ভাবে ব্ল্যাক লিস্টেড, তাকে নিয়ে আর কেউ কাজ করতে রাজি নয়, এখন তার সম্পর্কে সবাই বলছে—সে নিজেই নাকি ওইসব করত। বাবলিই নাকি প্রোডিউসার ডিরেক্টরদের তার সঙ্গে শোওয়ার জন্য প্ররোচিত করত এবং সবাই নাকি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাবলির এসব শুনে হাসি পায়। এখন যে সব লোকগুলো সাধু সেজে তাকে অভিযুক্ত করছে তাদের কামার্ত মুখগুলো চোখের ওপর ভেসে ভেসে ওঠে বাবলির। মনে হয়, সন্দীপ ঠিকই বলে—এটাই ছায়াজগৎ, শক্ত করে কাউকেই ধরা যায় না।

*

ফোনের শব্দে বাবলির ঘুম ভেঙে যায়। ফোন তোলে, ওপাশে আফতাবের জড়ানো গলা—কিউ রে শালি, ম্যায়নে তুঝে ফ্ল্যাট দিয়া ক্যা ধন্দা করনে কে লিয়ে?

বাবলি চমকে ওঠে। আফতাব জানল কী করে কয়েকদিন ধরে সাংবাদিক আদিত্য বোস তার সঙ্গে আছে এই ফ্ল্যাটে? আসলে এই লোকটাই খানিকটা চেষ্টা করছে তার সম্পর্কে ভালো কিছু লিখে তার হারানো কেরিয়ারটা ফেরত আনার। বাবলি তাই দয়াপরবশ হয়ে—। বাবলি ফোনে বলে,—এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আফতাব ঠান্ডা গলায় বলে,—আজ নেহি তো কাল—শহরে তো একদিন ঢুকবই, তোকে তখন সাইজ করব। বলে ফোনটা রেখে দেয়।

বাবলি ফোনটা হাতে নিয়েই বসে থাকে, তার ঘাম হচ্ছে, পা দুটো কাঁপছে। এর মধ্যে পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে আদিত্য বিছানা থেকে উঠে আসে, ঘুম চোখে বলে কী ব্যাপার অ্যা?

বাবলি তাকে সব কথা বলে। আদিত্য বিস্ফারিত চোখে সব শোনে তারপর উঠে পাশের ঘরে চলে যায়। একটু পরে বেরিয়ে আসে পোশাক পরে, কাঁধ ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলে,—আ-আমি এসবের মধ্যে জড়াতে রাজি নই। আদিত্য তোতলায়। বাবলি তাকিয়ে থাকে। আদিত্য দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। বাবলি অস্ফুট স্বরে আপন মনেই বলে—ছায়াজগৎ।

অবিনাশকাকু এসেছেন। এখন তিনি বাবলির সৎ বাবা। পেশায় উকিল, বাবলিকে বোঝাতে এসেছেন যে সে যদি তাদের বাড়ির তার ভাগের অংশটা ছেড়ে দেয় তাহলে সে পাঁচ লক্ষ টাকা পেতে পারে। বাবলি বোঝে অবিনাশ প্রায় পাঁচগুণ কমিয়ে বলেছেন কিন্তু তার কিছু করার নেই, তাকে শহর ছাড়তেই হবে। এ শহর তাকে আখের ছিবড়ের মতো নিংড়ে ফেলে দিয়েছে। বাবলি রাজি হয়। অবিনাশকাকু কতগুলো সই করিয়ে বাবলির হাতে একটা চেক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যাওয়ার সময় বাবলিকে মিষ্টি করে বলে যায়—মাঝে মাঝে যেও ও বাড়িতে, কেমন? বাবলি ভাবে—মাঝে মাঝে?

অবিনাশ বেরিয়ে যায়।

বাবলি মনে মনে বলে,—ছায়াজগৎ।

দুপাশে রুক্ষ পাহাড়। একটা হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ভাড়া করা অ্যাম্বাসাডারটা কালো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রোদ্দুরে তেমন তেজ নেই,

বাবলির বেশ ভালো লাগছে।

ভালো লাগছে সব ছেড়ে এখন একটা মুক্ত পাখির মতে সে ভেসে চলেছে। না অজানার উদ্দেশে নয়—সন্দীপের কাছে। সত্যি সন্দীপই তাকে ভালোবাসে। সন্দীপই তাকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করেছে চিরকাল আর সর্বোপরি সন্দীপ ছায়াজগতের লোক নয়। তার ফেলে আসা জগৎটার কথা মনে পড়ে, তার কেমন গা বমি বমি করে ওঠে। অভিনয় কথাটা শুনলেই এখন তার শরীর খারাপ লাগে। এবার সে সন্দীপের মতো হওয়ার চেষ্টা করবে—সৎ, নির্লোভ, দার্শনিকের মতো একটা চরিত্র। সন্দীপের চেহারাটা তার চোখে ভেসে ওঠে। প্রায় পাঁচ-দশ হাইট, এলোমেলো চুল, হালকা দাড়ি, ভাসাভাসা চোখ—কেমন যিশু খ্রিস্টের মতো মনে হয়।

মিশনারি স্কুলের গেট খুলে যায়, গাড়িটা ভেতরে ঢোকে। বাবলি মনে মনে ভাবে সন্দীপ তাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। বাবলি তাকে কিছুই জানায়নি তার আসার কথা। সন্দীপকে চমকে দেবে বলে।

স্কুলের একজন কর্মীকে হাতের কাছে পেয়ে বাবলি তাকে সন্দীপের কথা জিগ্যেস করে।

সে মানুষটা বোধ হয় স্থানীয় আদিবাসী, তার কোনও কথাই বাবলি বুঝতে পারে না শেষে অনেক কষ্টে প্রিন্সিপালের ঘরের রাস্তাটা জানতে পারে।

প্রিন্সিপ্যাল ফাদার স্মিথ বেশ আমুদে। বাবলিকে দেখে চিনতে পারেন—বোঝা যায় তিনি অন্তত টিভির বাংলা অনুষ্ঠান দেখেন নিয়মিত।

সন্দীপকে খবর দিতে বলায় ফাদার বলেন—আপনি জানেন না? এটা তো talk of the town। দিন দশেক আগে বিখ্যাত পরিচালক মণিরত্নম পালামৌ এসেছিলেন লোকেশন দেখতে। সন্দীপকে দেখে, কথা বলে ভীষণ ইমপ্রেসড হয়ে ওকে নিয়ে গেছেন চেন্নাইয়ে ওঁর ছবির হিরো করবেন বলে। ফাদার স্মিথ প্রচণ্ড উৎসাহে ড্রয়ার খুলে কিছু কাগজ বের করে বলেন—এই দেখুন না চেন্নাই থেকে ওখানকার খবরের কাগজের কাটিং পাঠিয়েছে সন্দীপ, ওর বিশাল ছবি আর ইন্টারভিউ বেরিয়েছে। ও বলেছে—ও সারাজীবন অভিনেতাই হতে চেয়েছিল।

আগুনপাখির আকাশ

ভনভন করছে মাছি, দুর্গন্ধে এলাকা ভরপুর। একটা ঝাপসা বাল্‌ব জ্বলছে কোনও মতে, যেন জ্বলবার ইচ্ছে নেই তবু জ্বলতে হচ্ছে সরকারি আদেশে। একজন লোক চাবি হাতে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে, এগিয়ে আসে 'কাল কিসনে দেখা হ্যায়'। ইনিই ডোম, ইনিই এখানকার ইনচার্জ, ইনিই শেষ কথা। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর সামনে এসে বলে, 'চলে আসুন, বডি চিনে নিন, স্‌সালা সব বডিই তো সমান'। গেয়ে ওঠে—'চিতাতেই সব শেষ—কী গেয়েছিল গুরু'—মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মধ্য থেকে দুজন এগিয়ে আসে। একটা ঘর। আলোটা ঝাপসা হতে হতে বোধ হয় শেষপ্রান্তে। ঘরের দেয়ালের রং বোধ হয় কোনও কালে হলুদ ছিল, এখন মরা মানুষের মতো ফ্যাকাসে। একটা ধাতব টেবিল, দেয়াল ঘেঁষে অনেক বাক্স রাখার খোপ, ড্রয়ারের মতো। একটা ড্রয়ার খোলা হল। মানুষ দুজন চোখ বুজে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে। চাবিটা নাড়তে নাড়তে লোকটি বলে, 'কী হল দাদা? ঘেন্না হচ্ছে? স্‌সালা আপনি মরলেও এরকম গন্ধ হবে। লিন লিন, দেখে লিন।'

দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের মধ্যে একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'আমি পারব না রে সুবাস, তুই যা।'

সুবাসের চোয়াল শক্ত হয়। এগিয়ে যায়। ড্রয়ারের মধ্যে সূর্য শুয়ে আছে। পচন ধরেছে। তবু মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে যেন। সূর্যের প্রিয় কবিতার মতো—

'অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল
তাই
লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার'।

সুবাস চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে। দ্বিতীয় লোকটি এগিয়ে এসে শুয়ে থাকা মানুষটিকে দেখে। বিকারগ্রস্ত, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো হাসতে থাকে। বলে ওঠে, দেখ, দেখ, কে বলবে এই লোকটা একদিন জীবনের স্বপ্ন দেখত, আমাদের জীবনের

স্বপ্ন দেখাত। শালা, এত কমজোর প্রাণ, এত পলকা জীবন নিয়ে ও আমাদের ঠকাত। আমরা ভাবতাম ও অমর। কেঁদে ওঠে হাউ হাউ করে। সুবাস ছেলেটার কাঁধে হাত রাখে। জড়িয়ে ধরে বলে, 'বরুণ, কী হচ্ছে? শান্ত হ।'

ড্রয়ারের মধ্য থেকে শরীরটাকে বের করা হয়। জন্মদিনের পোশাকে সূর্য শুয়ে থাকে ধাতব টেবিলটার ওপর। তিন চারজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে—'শ্মশানকর্মীদের স্ট্রাইক। আজ বডি নেওয়া যাবে না।' সবাই বেরিয়ে আসে। চিন্তিত মুখ সবার। কী করা যায়? আলোচনা বাড়ে। লাটাই-এর সুতোছাড়া ঘুড়ির মতো রাত্রি নামে। সবাই সকালের অপেক্ষায়। কীসের সকাল? স্ট্রাইক ভাঙতে সেই পরশু দিন। সুতরাং...ধাতব টেবিলে শুয়ে সূর্য ঝাপসা আলোয় স্নান করে।

'আই লাভ য়ু' কথাগুলো শুনে সূর্য হেসে ওঠে। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে। ঘর ভরতি লোক। একটা ছোট্ট ঘর। দেয়াল ঘেঁষে সোফা, ঘর জুড়ে খাট। খাটের পাশের দেয়ালে বিরাট সূর্য ঝুলছে। দেয়ালের রং চটা। একটা জিনসের প্যান্ট আর খালি গায়ে সূর্য ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়ায়। ঘরভরতি লোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই সেই লোক, যার নাম সূর্য। 'আগুনপাখি' দলের প্রাণপুরুষ। যার গান আজ মানুষের মুখে মুখে। আগুনপাখি আজ জনপ্রিয় একটা দল। যারা গানের জগতে বিপ্লব এনেছে। সারা দেশ জুড়ে আলোড়ন তুলেছে। যুব সম্প্রদায়ের নয়নের মণি যে দল, তার প্রাণপুরুষ সূর্য—যে একাধারে গায়ক, সুরকার, কবি। সেই সূর্যকে দেখে ঘরভরতি লোক দম নিতে ভুলে যায়। সূর্য সিগারেট ধরায়। খাটে বসে বলে,—'কী ব্যাপার বলুন?'

একদল লোক অনুষ্ঠান করার প্রসঙ্গ তোলে, সূর্য তাদের বলে, 'অপেক্ষা করুন, দীপক আসছে। এ ব্যাপারে ও-ই কথা বলবে। অন্যরা নানা প্রশ্ন, সমস্যা নিয়ে এসেছে। তাদের স্বপ্নের মানুষটার কাছে। সূর্য তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'সূর্যদা, তোমার গানে এত নিরাশা কেন?' স্থির দৃষ্টিতে সূর্য তাকায়—'ওটাই কনস্ট্যান্ট তাই...আসলে আশা শব্দটা নেশার মতো, আমরা সবাই অ্যাডিক্টেড আশার অ্যাডিকশনে। নিরাশাই আসল জীবন।' সবাই নড়েচড়ে বসে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা ছেলে এসে ঢোকে। এলেমেলো চুল, সূর্যের মতোই দাড়ি। সবাই বলে, 'দীপকদা, কেমন আছ?' সূর্য বলে, 'যাক, তুই এবার সামলা। আমি চললাম। কে কে যাবি রে? চল, আমরা রকে বসি।'

অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়ায়। সূর্য যেতে যেতে দীপকের দিকে তাকায়, দীপক আয়োজকদের সামলাতে সামলাতে সূর্যের চোখে চোখ মেলায়। দুজনের মুখে হাসি। দীপক বিজয়ীর হাসি হাসে। দশ বছরের লড়াই-এর ফল। কারা

যেন বলেছিল 'বুড়ো ঘোড়া', দীপক বোস জন্মজুয়াড়ি, ঘোড়া চিনতে ভুল হয় না।

'তুই বাজে সময় নষ্ট করছিস। আমার দ্বারা হবে না।' হতাশার শেষ দরজায় পিঠ দিয়ে একটা মানুষ বলেছিল কথাগুলো।

দীপক মন দিয়ে লেজার মেলাচ্ছে। যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

'আবে গাণ্ডু, শুনছিস?'

দীপক উজ্জ্বল অথচ ভাবলেশহীন চোখ তোলে। এই চোখের আড়ালে একটা দৃঢ় ইস্পাতের মতো ধারালো মন লুকিয়ে, যে উত্তর দেয় না, শুধুই সিদ্ধান্ত নেয়। যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকা বেড়ালের মতো নির্মম প্রাণ বাঁচাতে, এই মুহূর্তে যার প্রাণের নাম সূর্য।

সূর্যকে তার উপযুক্ত আকাশ দিতেই হবে। একটা স্যাঁতস্যাঁতে কুয়োর মধ্যে সূর্যের জায়গা হতে পারে না। দরকার হলে নতুন আকাশ তৈরি হবে। যেখানে হাজার গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে সূর্য থাকবে কেন্দ্রবিন্দুতে। তার জন্য যে-কোনও পথ নিতেই হবে।

অন্ধকার ঘরে সোফার ওপর আধশোয়া অবস্থায় দীপক। অর্ধ মাতাল। হাতে গ্লাস। চোখের সামনে স্মৃতিগুলো ছায়াছবির মতো সরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা।

সল্টলেকের এই বাড়িটার প্রতিটা ইটের সঙ্গে সূর্যের স্মৃতি জড়িয়ে। গৃহ প্রবেশের দিন থেকে সেই ভয়ঙ্কর দিনটা পর্যন্ত। মুখটা তেতো হয়ে গেছে। দীপক উঠে বেসিনে মুখ ধোয়। কুলকুচি করে মদের তিক্ততা কাটায়। ফিরে আসে। আবার গ্লাসটা তুলে নেয় হাতে। দরজায় লোপা এসে দাঁড়ায়। মাটিতে পাতা নরম কার্পেটে কোনও শব্দ হয় না। দীপক তবুও বুঝতে পারে। আসুক। আজ ও নিভন্ত সূর্যের ছাই এর মধ্যে উত্তাপ আছে কিনা দেখতে এসেছে। পাশের ঘরে লোপাও জেগে ছিল। বেলাশেষে সূর্যহীন পৃথিবীর চেহারাই দেখতে এসেছে বোধ হয়...।

তিক্ততার হাসি হাসে দীপক অন্ধকারে। সে হাসি বড় নির্মম, বড়ই নিষ্ঠুর। পাঁচ পাঁচটা বছর একসঙ্গে থেকেও লোপা এ হাসির মুখোমুখি হয়নি, এ নির্মমতার মুখোমুখি হয়নি। আজ ওর হল কী? ঘর অন্ধকার! 'দারোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে বোসো'—সামান্য জড়ানো গলায় দীপক ঝাঁঝিয়ে ওঠে। 'অআঃ ওটা—সবকিছুর তলা পর্যন্ত না দেখে কি শান্তি পাও না? আমার বিছানা থেকে বাথরুম পর্যন্ত সবটাই তো তোমার অবাধ বিচরণভূমি বানিয়েছ। আমার একান্ত বলে তো কিছুই রাখলে না। সব জায়গাতেই তোমার আগ্রাসী থাবা বাড়িয়েছ। আজকের দিনটাও তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে?'

লোপা আলো নিভিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

*

সূর্য এক দ্বিধায় ভরা সাচ্চা মানুষ।
সূর্য দারুণ আবেগের অপর নাম।
সূর্য আদর্শ প্রেমিক।
সূর্য দার্শনিক।
সূর্য কমপিউটারের মতো স্মৃতিসম্পন্ন এক মানুষ।
সূর্য আত্মভোলা বদ্ধ উন্মাদ।
সূর্য চরম মানবতাবাদী, উদার।
সূর্য একজন নির্মম খুনি, সে খুন করার পরের মুহূর্তে শান্ত গলায় বলে, 'এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

হাজরা আশুতোষ কলেজের সমানে গুরুপদর চায়ের দোকান। একঝাঁক ছেলেমেয়ে বসে বসে গুলতানি করছে। একদল সামনের ফুটপাথে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। আর একদল পাশের রকে বসে উৎসাহ দিচ্ছে। সুবাস নাটকের পরিচালক, নাট্যকার। ভাসাভাসা দুটো চোখ, এলোমেলো চুল, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং চাপা, পরনে জিনস আর পাঞ্জাবি। সুবাস সবাইকে পজিশন বোঝাচ্ছে। ওরা পথ নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। এদের কেউ কেউ স্টুডেন্ট, কেউ ও-পাট চুকিয়েছে। এরা আড্ডা দেয়, কখনও নেশা করে, কখনও মারপিট করে প্রেমে পড়ে, ভেসে বেড়ায়। আবার মুষড়েও পড়ে। এরা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, জীবনকে চ্যালেঞ্জ জানায়, এরা অচিন্ত্যকুমারের 'ছন্নছাড়া', এরা সুকান্তের 'আঠারো বছর'। এরা অস্থির, দিশেহারা কিন্তু হারায় না। এরা জীবনের লড়াই-এ হেরে যায়, কিন্তু ঔদ্ধত্য যায় না। এরা অবিশ্বাসে বিশ্বস্ত। এদের সবাই ঠকায়—নেতা, অভিনেতা, প্রেমিকা, দাদা, ভাই, সব্বাই। তাই এরা সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। এরা এক অন্য প্রজন্ম। এদের কেউ বোঝে না, বড়রা তাদের দৃষ্টিতে এদের দেখে, ব্যাখ্যা করে। এদের কেউ চিনতে চায় না, এদের হয়ে কেউ কথা বলে না, কিন্তু এদের ব্যবহার করতে চায়। এদের জন্য নেই কোনওরকম সহযোগিতার হাত, সহানুভূতির কবি, স্বপ্ন দেখানোর চোখ, দুঃস্বপ্নহীন রাত—এরা এতেই অভ্যস্ত। তবু এরা বাঁচে, হয়তো অভ্যাসে।

বাস থেকে একটা ছেলে নামে। এলোমেলো চুল, সাদা পাঞ্জাবি, কালো প্যান্ট। একটা বিড়ি ধরায়। রকের ছেলেমেয়েরা বলে, 'ওই তো আসছে?' সুবাস রিহার্সাল থামিয়ে সবাইকে ইশারা করে, সবাই নাটকীয়ভাবে রাজপথে নেমে যায়। হাঁটু গেড়ে স্বাগত জানায়, 'আসুন, আসুন, মহারানা সূর্যপ্রতাপ—।'

সূর্য হাসতে হাসতে রাস্তা পার হয়ে একটা ইটের আধলা তুলে তেড়ে আসে। সবাই হাসতে হাসতে দৌড় লাগায়। সূর্য রকে এসে বলে, 'গুরুপদ, চা।' রকে বসে

থাকা কিছু ছেলে সূর্যকে বলে, 'সূর্যদা, এরা তো রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে এক একজন নটসূর্য হয়ে গেল—শেষ কবে হবে?' সূর্য হাসে,—'দাঁড়া না শালা, লেখাটা শেষ হোক।'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। মারুতি। চালকের আসন থেকে নেমে আসেন একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। ধবধবে রং। এখন রাগে লাল। দলটার মাঝখানে প্রম্পট করতে থাকা মেয়েটার সামনে এসে বলেন,—'দীপা তুমি এইসব করো? কমপিউটার ক্লাসের নামে এ...ই সব লোফার ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় আড্ডা দিতে তোমার লজ্জা করে না? গাড়িতে ওঠো।'

মেয়েটা ইতস্তত করে, তারপর বলে,—'বাবা, ভালোলাগা ব্যাপারটা একান্ত আমার। সেখানে তুমি কোনও কথা বোলো না। আমি যাব না এখন।'

ভদ্রলোক রাগে ফেটে পড়েন—'তার মানে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে, অন্যায় করবে—আমি কিছু বলতে পারব না?'

দীপা বলে,—'না, পারবে না, তুমিও তো ঘুষ নাও, সেটাও তো অন্যায়।'

রকের ছেলেরা হেসে ওঠে। সূর্য লেখা থামিয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখছে। ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে গাড়িতে গিয়ে বসেন। গাড়ি স্টার্ট নেয়। সবাই দীপাকে ঘিরে ধরে।

'এটা ভালো হল?'

'এবার বাড়িতে ঢুকতে দিলে হয় তোকে—'

সূর্য উঠে দাঁড়ায়। 'গান কমপ্লিট। সুবাস, কীভাবে অ্যাপ্লাই করবি ভাব।'

সূর্য গেয়ে ওঠে—

'আমি বিজ্ঞাপন
আমার ছোঁয়াতেই ভুষি হয় রুশি মোদি
আমার মুঠোর নীচে সঞ্জীবন। আমি বিজ্ঞাপন।'

সবাই তাল দিতে থাকে। সূর্য গেয়ে যায়।

'আমি চাইলেই হয়
মোমবাতি সোনারোদ
মোজাইক হতে লাগে স্টিম রোলার
আমি যদি মনে করি
খড়ি মাটি আইভরি
কাশ্মীরে বেচা হয় এয়ার কুলার।
আমি চাইলেই খসে
তোমার গ্যাঁটের কড়ি

হোক না যতই অভাব অনটন
আমি আমি আমি বিজ্ঞাপন।'

সবাই হই হই করে ওঠে, 'জিও গুরু, 'জবাব নেই?' সূর্য সুবাসকে বলে, 'গোটা গানটা লাগিয়ে ফ্যাল, আমি ভেতরে যাচ্ছি। দীপক এসে গেছে।'

দীপক রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসে।

'এই যে বঙ্কুবাবু।' দীপক ব্যাঙ্কে চাকরি করে, তাই বঙ্কু। 'এবার চলো, অনেক চাকরি করেছ।' সবাইকে হাত নেড়ে দুজনে রাস্তা পার হয়ে ক্যানসার হাসপাতালে ঢোকে। পুষ্কর তখনও গুনগুন করছে—'আমি আমি বিজ্ঞাপন'। হঠাৎ বলে উঠল, 'দেখলি শালা, অত বাওয়ালের মধ্যেও কী লিখল? ওর যদি না হয় তো শালা আমি মোচ কামিয়ে ফেলব।' নীলু গম্ভীর হয়ে বলে, 'আছে তো গোটা পাঁচেক—কামাতে হবে না, টেনে ছিঁড়ে ফেললেই হবে।' সবাই হাসতে থাকে। সূর্য আর দীপক হাসপাতালের সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। এখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন সূর্যের শিক্ষাগুরু অনুপ আচার্য। সূর্যকে পড়াতেন। তারপর ধীরে ধীরে সূর্যের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। সূর্যকে মার্কসবাদ পড়ান, রেডবুক পড়ান, লং মার্চের ইতিহাস শোনান, অনুপ আচার্য সারাজীবন ছাত্র তৈরি করেছেন। তারা কেউ আজ আর তাঁর পাশে নেই। নিঃসঙ্গ মানুষটা এখন একা শুয়ে, হাসপাতালের জেনারেল বেডে। সূর্য গিয়ে দাঁড়ায়—'সূর্য, এতদিন যা শিখিয়েছি, সব ভুল রে, সব ভুল।...সবার জন্য নয়, নিজের জন্য বাঁচা। জীবন এখন একটা দৌড়ের মাঠ। যে পড়ে যাবে সে আজীবন পড়েই থাকবে, তাকে টপকে বা মাড়িয়ে বাকিরা এগিয়ে যাবে। পড়ে থাকা মানুষটা শুধু রাত্রির অপেক্ষায় বেঁচে থাকবে। দিনের কড়া রোদ্দুর থেকে মুখ বাঁচিয়ে।' অনুপ আচার্য আজকাল এই রকম কথাই বলেন।

সূর্য টেবিল থেকে প্রেসক্রিপশন তুলে নেয়। দেখে কী কী ওষুধ আনতে হবে। তারপর দীপককে বলে,—'পরশু থেকে কেমো।' দীপক হিসেব করে। মানে পরশুদিনের মধ্যে হাজার টাকা জোগাড় করতে হবে। শুধু টাকা হলে হবে না। সূর্যের নিজের রোজগারের হাজার টাকা। অন্য কারওর নয়। দীপকেরও নয়।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দীপক সূর্যকে বলল, 'অনুপবাবু এখন প্রায়ই ভুল বকছে।'

সূর্য ভুরু কোঁচকায়—'তুই ঠিক জানিস ভুল বলছে?'

'ভুল না? একা বাঁচতে বলছে। স্বার্থপর হতে বলছে, বলছে, তা না হলে বাঁচা যাবে না।'

'আলবৎ ঠিক বলছে।' সূর্য বলে ওঠে।

দীপক রেগে যায়, 'বানচোত, তুই শালা কী মারাচ্ছিস? তুই শালা নিজে বাঁচ না। তোর কী দায়?'

'আমার সঙ্গে কারোর তুলনা করবি না। আমি ব্যতিক্রম। আমি অ-সাধারণ।' সূর্যের এইরকম অহংকার দেখলে দীপকের মাঝে মাঝে ভয়ংকর রাগ হয়। মুখে কিছু বলে না। মনে মনে ভাবে, তা হলে আমি কী—আমারই বা কীসের দায়?

সূর্য বোধ হয় ওর মনের কথা বুঝতে পারে। দীপকের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলে, 'তুইও।'

সুবাস আর বরুণ মর্গের সামনের ফুটপাথের ওপর দাঁড়ায়। আজ ডেডবডি নেওয়া যাবে না।

সবাই চলে গেল একে একে।

বরুণের গাড়িটা উলটোদিকে পার্ক করা। বরুণের আজ বাড়ি যেতে ইচ্ছেই করছে না। সুবাসের দিকে তাকায় বরুণ। সুবাস বলে, 'আয় বসি ওখানে—' ফুটপাথের পাশে একটা বেদি মতো করা, দুজনে গিয়ে বসে, সিগারেট ধরায়। সুবাস বলে, 'বহুদিন পরে—তাই না?' বরুণ বলে, 'ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে ঘরে ফিরলাম।'

বরুণ আজ একটা বহুজাতিক সংস্থার উঁচু পদে আছে। এইরকম কোনও একটা ফুটপাথের রক থেকে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

গ্রিনরুমে প্রচণ্ড ভিড়। অটোগ্রাফ শিকারীদের আক্রমণে কর্মকর্তারা পর্যুদস্ত। সূর্যের অনুষ্ঠানের ইন্টারভ্যাল। সূর্য একটা তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছে। খালি গা। চারপাশে ভক্তের ভিড়। ভিড় ঠেলে বরুণ এগিয়ে আসে।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী বলবে বলো?'

'এখানে নয়, আপনার বাড়ি যাব, ঠিকানা দিন।'

সূর্য একজনকে বলে ঠিকানা দিতে।

এক সকালে বরুণ এসে হাজির হল সূর্যের বাড়িতে। ছোট দু কামরার বাড়ি। প্রচুর লোকজন ঘরের মধ্যে। সূর্য খাটে বসে। সূর্য তখন সদ্য গান গাইতে এসেছে। সবে নাম হতে শুরু হয়েছে। সারা কলকাতা জুড়ে আলোচনা। কেউ বলছে 'বাজে', কেউ বা 'প্রমিসিং', কেউ কেউ 'দারুণ'। একদল ভক্তও তৈরি হয়ে গেছে। তারা নাকি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে থাকে লোকের ভিড়ে। গোটা অনুষ্ঠানের টেম্পো তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই মানুষকে উৎসাহিত করে। আর এ ব্যাপারটা নাকি সূর্যই দক্ষ হাতে পরিচালনা করে। শোনা যায়, সূর্য তার প্রত্যেক ফ্যানের নাম মনে রাখে, তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কেও নাকি ওয়াকিবহাল। সূর্য নাকি যার

সঙ্গে একবার পরিচিত হয়—ভোলে না। তা সে যত ছোট আলাপই হোক। বরুণ ঘরে ঢোকে। সবাই ওকে দেখে। সূর্য ফোনে কথা বলছিল। বরুণকে দেখে হাত নেড়ে বসতে বলে, তারপর কিছুক্ষণ পরে ফোনে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'তোমার নাম তো বরুণ—তাই তো? বোসো, একটু কথা সেরে নিই।'

বরুণ একটা ধাক্কা খেল। তা হলে এ ব্যাপারটা সত্যি! কমপিউটারের মতো স্মৃতি! ফোন রেখে সূর্য বলে 'এসো আমরা বাইরে বসি।' একটা সিগারেট দেয় বরুণকে। 'বলো কী বলবে?'

বরুণ নার্ভাস গলায় শুরু বলে, 'আপনি যা বলেন তা-ই বিশ্বাস করেন?'—আপাতত।

'কেন? আপাতত কেন?'

'আমি একটা লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে উঠে আসছি। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, অসম্মানের বিরুদ্ধে লড়াই, হাজার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই—আমার গায়ে এখনও তার গন্ধ আছে। তাই আমার গানে এখনও ধার আছে। একদিন আমার গা থেকে লড়াই-এর গন্ধটা মুছে যাবে হয়তো, সেদিন আমার গানে অতটা ধার থাকবে না। কী? দুঃখ পেলে? যদি বলতাম—হ্যাঁ বিশ্বাস করি, আজীবন তা-ই মেনে চলব, তুমি হয়তো আনন্দ পেতে, কিন্তু সত্যি বলা হত না। আমি ভণ্ডামি করি না। তোমরাও ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত হোয়ো না। সত্যিকে মেনে নিতে শেখো।' সূর্য বরুণের এলোমেলো চুলে অদ্ভুতভাবে হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসল। বরুণের মধ্যে একটা ভালোবাসা যেন প্রচণ্ডভাবে ফেটে বেরোতে চাইছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি। বরুণ সেদিন সারা সকাল ধরে দেখল, সূর্য কী ভাবে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে, কী ভাবে মানুষকে জয় করে। অথচ এর কোনওটার মধ্যেই বরুণ আন্তরিকতার অভাব দেখতে পাচ্ছিল না।

দুপুরে যখন বরুণ বাসে বাড়ির পথে একা, তখন অনুভব করে সূর্যদা ছাড়া তার চলবে না।

বরুণ সূর্যময় হয়ে গেল।

সূর্য বলত,—'আগুনপাখি শুধু আমার নাম নয়, তোরাও আগুনপাখি। সূর্য কোনও একজনের নাম নয়, আমার উত্থান শুধু আমার নয়, তোদের বেড়ে ওঠার বনিয়াদ', ভিড়ের মধ্যে সূর্য বরুণের নাম ধরে ডাকত, বরুণ ভুলে যেত ওর বেকার জীবনের অস্তিত্বহীনতার গ্লানি। যখন প্রচণ্ড হতাশায় বরুণ ক্লান্ত, তখন সূর্য একবার জড়িয়ে ধরে সব হতাশা মুছে দিত। মুখে মুখে গান তৈরি করে জীবনকে সহ্য করতে শেখাত। জড়ের মতো কেটেছিল বছর। তারপর স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে—সাফল্য। আজ মাছি ভনভন করছে সূর্যদার চারপাশে, এক সময় মানুষ ভিড় করত। বরুণ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে। ড্রাইভারকে বলে,—'হাম বাদ মে যায়েঙ্গে। ইন্তেজার করো'। ড্রাইভার মাথা নেড়ে গাড়িতে গিয়ে বসে। বরুণ ঘাড়

ফিরিয়ে দেখে সুবাস একদৃষ্টে পড়ে থাকা সিগারেটের আধপোড়া আগুনের দিকে তাকিয়ে। সুবাস ছিল সূর্যর পল্টনের সেনাপতি। সুবাস একঝাঁক ছেলেকে নিয়ন্ত্রণ করত। এরা সূর্যর অনুষ্ঠানে লোক আনত প্রথম প্রথম, সূর্যর অনুষ্ঠানের পোস্টার বুকে বেঁধে ঘুরত। সূর্যের হয়ে তর্ক করত, মারামারি করত, সূর্য যখন এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধিতার চরমে, তখন এরা সূর্যর নিরাপত্তাহীন ভূমিকা নিত।

মাঝ রাত। শব্দ করে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে একজন নামে। সুবাস বরুণ দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। বরুণ বলে,—'তুই!'

জবাব এল ভেজা গলায়,—'তোর বাড়িতে ফোন করে জানলাম, তোরা এখানে।'

'আজ বডি নেওয়া যাবে না, আয় তিন্নি, রকে বসবি?'

তিন্নি, সুবাসের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে। বরুণ ভাবে, কেউ যদি দেখত—বম্বে বাংলার জনপ্রিয় চিত্রতারকা প্রান্তিকা, ওরফে তিন্নি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে তার স্বপ্নের মানুষটার জন্য, তার প্রেমিকের জন্য, তার গডফাদারের জন্য! তাহলে...

একঝাঁক মেয়ে সূর্যকে ঘিরে রয়েছে। তাদের কেউ সূর্যর হাত ধরে, কেউ সূর্যর ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে, কেউ অনর্থক কথা বলে চলেছে। সূর্য এদের সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে একজন পলা, যার চুলটা খুব সুন্দর। সূর্যই বলেছিল কোনও একদিন, সে হাত দিয়ে অবাধ্য চুলগুলো ইচ্ছে করে মুখের ওপর ফেলে হাত দিয়ে সরায়। সূর্য পলার চুলটার দিকে তাকায়—চোখে প্রশংসার ছোঁয়া, ঠোঁটের কোণে হাসি। পলা যেন হাওয়ায় ভাসে। সুদীপ্তা সূর্যর হাত ধরে ছিল। সূর্য হাতটা ছাড়ায়, সুদীপ্তা আহত হয়। সূর্য হাতের ঘাম মুছে আবার সুদীপ্তার হাতে হাত রাখে। সুদীপ্তা খুশিতে ভরে ওঠে। এরা সবাই সূর্যকে ভালোবাসে এবং একে অপরকে হিংসা করে। অথচ সূর্যর জন্য একসঙ্গে তর্ক করে, সূর্যকে প্রতিষ্ঠা করে। ভিড়ের মধ্যে এক কোণে তিন্নি দাঁড়িয়ে, প্রচণ্ড অভিমান, সূর্য কেন সবার? দীপক ঘরে ঢোকে, সিগারেট ধরায়, বলে,—'দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু স্টেজ।'

সবাই হতাশ হয়। ইস্‌স্—এবার তো সূর্য আরও আরও অনেক মানুষের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। সূর্য বলে, 'আমি রেডি, সাউন্ড ব্যালেন্স হয়ে গেলেই আমায় ডাকিস। ততক্ষণ একটু ওদের সঙ্গে থাকি।'

সবাই উৎসাহিত হয়, আবার তারা সূর্যকে ঘিরে ধরে নতুন উদ্যমে।

*

তিন্নি দীপকের দিকে তাকায়। দীপক তিন্নিকে দেখে। অপূর্ব সুন্দরী। সূর্যর সঙ্গে এসেছে। দারুণ সেজেছে। লালরঙের শাড়ি পরেছে। যাতে ওই রঙে সূর্য আচ্ছন্ন থাকে। হায়—সূর্যকে বাঁধতে চাওয়া আর হাওয়াকে মুঠোয় ধরা এক। কেউ একা সূর্যকে পাবে এ ব্যাপারটা হতে পারে না। দীপকও তাই চায়, সূর্য যেন কারওর একার না হয়। সূর্য তাকে ছাড়া অন্য কোনও একজনকে বেশি গুরুত্ব দেবে—এটা দীপকও মানতে পারে না।

অথচ সূর্য একটা জায়গায় অনেকটাই বাঁধা পড়ে আছে। এটা দীপকের বিরাট অস্বস্তির কারণ। দীপক তিন্নিকে বলে—'দূরে দাঁড়িয়ে কেন?'

'আমায় কেন নিয়ে এল? আমার ভালো লাগে না।'

'কী ভালো লাগে না? ওর কাছে কেউ না এলে ভালো লাগবে?'

তিন্নি অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকায়। দীপক হেসে ওঠে—'যার মনে অনেকগুলো জানালা সে অনেকটা আকাশ ধরতে পারে, যার মাত্র একটাই জানালা সে এক জানালা আকাশেই সন্তুষ্ট থাকে।' সূর্য প্রথম বলে, দুঃখ পাওয়ার কিচ্ছু নেই, তোর জন্য একটা জানালা আছে, যেখান দিয়ে তোর আকাশের একান্ত স্বতন্ত্র প্রবেশ অবাধ। তিন্নি চুপ করে ভাবে। দীপক চলে যায়। ফেরার সময় তিন্নি সূর্যকে বলে,—'তোমার আমার জন্য কষ্ট হয় না?'

'না। কষ্ট কেন হবে?'

তিন্নি অস্থির গলায় বলে—'আমি তো তোমায় ভালোবাসি।'

'তাতে কী হল?'

'তুমি সবার সঙ্গে...'

'ভালোবাসা কি একটা পেসমেকার যে একটা বুকেই থাকবে?'

তিন্নি কাঁদে। গাড়ি চলতে থাকে। সূর্য একটা কাগজ আর পেন নিয়ে লিখতে শুরু করে। একসময় মুখ তুলে মুচকি হেসে তিন্নির মুখটা তুলে বলে—'শোনো, কী লিখলাম।' গেয়ে ওঠে—

'সংকীর্ণ মনের মানুষ যারা
তারাই তো ভালোবাসে একবার
যার মন বড় যত, দেখে ভালো অবিরত
তারাই তো ভালোবাসে বারবার।
যদি ভালোবাসি শুধু একজনকে
তবে পৃথিবীকে বলো—আই হেট ইউ।
ভালোবাসা কোনও পেসমেকার নয়,

কোনও এক বুকে নেবেই যা আশ্রয়।
ভালোবাসা তো মুক্ত হাওয়া
বহু মনে খুঁজে পাওয়া
নানা রাগে কোমল গান্ধার।'

দীপক সামনের সিটে বসে শোনে, হাসে—এ এক অদ্ভুত যুক্তি। যা সূর্যই দিতে পারে শুধু।

দীপক সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেপ রেকর্ডার চালায়। সূর্য গেয়ে ওঠে—

'যদি পেতাম সাগরের গভীরতা
আকাশের গান
তবে কি হারিয়ে যেতে দিতাম
ভুল পথে প্রাণ।'

দীপক ভাবে এত দ্বন্দ্ব, এত দ্বিধা, এত অতৃপ্তি নিয়ে কী করে ও বাঁচত? সু-ই-সা-ই-ড-টাই বা কেন করল? সাগরের গভীরতা, আকাশের উদারতাও তো ওর মধ্যে ছিল। তবু কেন? তবে কি পরদার আড়ালে কিছু ছিল যা কেউ জানত না? সত্যিই তো, দীপক তো আজও জানে না কেন সূর্যর স্ত্রী সুতপা, সূর্যকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওরা ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। সুতপা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। কানাডা যাওয়ার আগে, দীপক একবার ডিভোর্সের কাগজপত্র সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে সুতপার কাছে গিয়েছিল। ওই একবারই। কারণ সূর্যের সঙ্গে দীপকের বন্ধুত্ব হওয়ার অনেক আগেই ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। সূর্য তখন পথের ভিখারি। এর দরজায় ওর দরজায় ঘুরে বেড়ায় একটু সুযোগের আশায়। তখন দীপক সূর্যর জন্য লড়াই-এ ব্যস্ত থাকায় বিশেষ কিছু জানা যায়নি, বা জানা হয়নি বলাই ভালো। কারণ সূর্য বিষয়টা বরাবরই এড়িয়ে গেছে। সুতপাকে দীপক প্রশ্ন করায় সুতপা চুপ করে থাকে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। সুন্দর চেহারা, ফরসা গায়ের রং, ঘড়ি দেখে ইতস্তত করে বলে,—'আমার একটু তাড়া আছে।'

দীপক বোঝে তাকে যেতে বলা হচ্ছে। নমস্কার করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সুতপা পেছন থেকে বলে, 'শুনুন, আপনি জানতে চাইছেন, তাই না?' তারপর অন্যমনস্ক গলায় বলে,—'কেন আমি ওর সঙ্গে থাকলাম না? আসলে ওইরকম স্বার্থপর, নিষ্ঠুর মানুষের সঙ্গে থাকা যায় না।' স্বর পালটে যায় সুতপার—'ব্যস, আর কিছু জানতে চাইবেন না।' সুতপা পাশের ঘরে চলে যায়। দীপক ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

এখন দীপকের মনে হচ্ছে, কেন অমন কথা বলছিল, সুতপা? সূর্যকে তো

একমুহূর্তের জন্যেও তার স্বার্থপর মনে হয়নি। তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠুরতা—একজন খুনিকে যদি নিষ্ঠুর বলা যায় তবে সূর্য অবশ্যই নিষ্ঠুর ছিল। দীপকের প্রায় সামনেই সেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল।

একদিন দুপুরে দীপকের অফিসে সূর্য এল। বলল, 'চল, বেরোব। কথা আছে।' সূর্যর মুখ ফ্যাকাসে। ওরা বাইরে এসে সামনের একট রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল। সূর্য বলল, 'শোন।'

দীপক ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে কিছু খা, কিছু খাসনি মনে হচ্ছে।'

'শুধু জল।'

সূর্যর তখন সবে নাম হতে শুরু করেছে। এইচএমভি ডেকে পাঠিয়েছে। এক ঢোঁকে জলটা শেষ করে সূর্য শুরু করে—'বছর কয়েক আগের ঘটনা। তুই তখনও আসিসনি। আমার এক বন্ধু সৌমেন, তখন আমায় জুড়ে ছিল। হঠাৎই সৌমেন ড্রাগ নিতে শুরু করে, প্রথম প্রথম আমি বুঝিনি। পরে জানলাম, ওর নাম হেরোইন, ধরলে ছাড়া যায় না। সৌমেন নষ্ট হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করলাম। কিছু হল না। ভালো কবিতা লিখত। সত্যি বলতে কি, আমরা দুজনে একসঙ্গেই লিখতে শুরু করেছিলাম। ওর বাড়ির লোক ওকে কাঁকুড়গাছিতে একটা নার্সিংহোমে রেখে দিল। ওখানে সব রোগীই শালা পাতাখোর। আমি দেখতে যেতাম।

প্রথমে আমাকেও ঢুকতে দিচ্ছিল না। সৌমেনের বাবা ডাক্তারদের বলে কয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন আমার যাওয়ার। এত কড়াকড়ির কারণ, নার্সিংহোমে নাকি ড্রাগ সাপ্লাই হয়। যাই হোক, আমায় পারমিশন দিল, আমি যেতাম।

একদিন সৌমেন বলল ওর এক বন্ধু আমায় একটা বই দিয়ে যাবে, আমি যেন নার্সিংহোমে সেই বইটা ওকে দিয়ে যাই, সবাইকে তো ঢুকতে দেয় না। আমি শালা বুঝিনি। বইটা আমায় একটা ছেলে দিয়ে গেল। আমি সৌমেনকে নার্সিংহোমে সেটা দিয়ে এলাম। তারপর এভাবে মাঝেমাঝেই বই দিয়ে আসতাম। তারপর আমি কিছু ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়াতে ক'দিন যাওয়া হয়নি। একদিন শুনলাম সৌমেন মারা গেছে। বেশি করে হেরোইন সাপ্লাই হত বাইরে থেকে। শুনে তো আমার হাত-পা ঠান্ডা, ঘুমোতে পারছি না। যে ছেলেটা আমায় বই দিয়ে যেত সে শালা হাপিস। বেঁচে গেলাম সৌমেনের বাবা-মা আর জল ঘোলা করতে না চাওয়ায়।

এরপর বছর দুয়েক কেটে গেছে। সমস্যা হল, দিন সাতেক আগে, তোকে বলিনি, কারণ ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিনি, একটা লোক জোর করে আলাপ করল বাসস্ট্যান্ডে। শালা শকুনের মতো দেখতে, হাতে অনেকগুলো আংটি, চেককাটা জামা, টেরিকটের প্যান্ট, আমার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল যেন। আমার সামনে এসে বলল,—'কী গুরু, কাঁকুড়গাছি নার্সিংহোম মনে আছে?' আমার তো শালা মাথায় বাজ।

লোকটা বলল,—'তোমার তো এখন অনেক নাম, আমার একটা কাজ একটু করে দাও তো।' আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। ভাগ্যিস সুবাসরা চলে এল। আমিও ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। পরশু ব্যাটা আবার রাস্তায় ধরল, লোকটা শালা আমায় ইনডাইরেক্ট পেডলার বানাতে চায়। দু তিনটে ছেলেকে আমার দলে ভেড়াতে চায়, যারা বাকিদের নেশা ধরিয়ে দেবে।'

সূর্য স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল—'মানে বুঝছিস? আমি একটু প্রশ্রয় দিলে প্রথমে আমার ছায়ায়, পরে আমাকে দিয়ে মাল বেচাবে। আমি তো শালা প্রচুর খিস্তি করে ভাগিয়ে দিলাম। আজ সকালে বাঞ্চোৎ আবার এসেছে। বলছে আমি রাজি না হলে ও নাকি পুলিশকে বলবে আমি নার্সিংহোমে ড্রাগ সাপ্লাই করতাম। ডাক্তারদের দিয়ে শনাক্তও করিয়ে দেবে। আমি ভাবতে সময় নিয়েছি। এবার বল কী করব?'

দীপক এতক্ষণ দম বন্ধ করে শুনছিল, সবে সূর্য ফ্লারিশ করতে শুরু করেছে, এই সময়ই এত বড় একটা বিপর্যয়—দীপকের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনও মতে বলল—'লোকটা কে?'

লোকটা বলল, 'ওর নাম ছকু সাহা, এটা ওর ব্যাবসা। মাল স্টক করে, পেডলারদের বিক্রি করতে দেয়।'

'ওর কোনও পার্টনার আছে কি? মানে তোর ব্যাপারটা আর কেউ জানে কি?'

মনে হয় না। তার কারণ আমি মোটামুটি একটা ফিগার হতে চলেছি। তাই আমি ওর হয়ে কাজ করলে সে ব্যাপারটা গোপন করলে ওরই লাভ।'

'কিন্তু ওই ছেলেটা, যে তোকে বই দিত?'

সূর্য চিন্তিত গলায় বলে,—'না, সেটা জানি না। দেখি আজ রাতে লোকটা আসবে আমার বাড়িতে। তখন শুনব।'

সে-রাতে লোকটা এসেছিল। সূর্য লোকটাকে আশ্বাস দেয় যে সে লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। দীপক বোঝে সূর্য কত বড় অভিনেতা। ছকু সাহা আনন্দে ডগমগ। সূর্যকে বোঝায় সূর্যেরও নাকি এতে প্রচুর টাকা লাভ।

সূর্য ছকুকে বলে,—'আপনার তা হলে এ দশা কেন?'

'কেন?'

ছকু সাহা হাসে—'আমার একটা মাছের ভেরি আছে, দুটো বাস আছে, তিনটে বাড়ি। আসলে সবাই তো আপনার মতো ভদ্রলোক নয়। পেডলারগুলো শালা বহুৎ হারামি। ওদের কাছে সবসময় দেখাতে হয় আমার কোনও লাভই হয় না। বুঝলেন না' ছকু সাহা চোখ মারে।

সূর্য হো হো করে হাসে। এরপর ছকু, সূর্যের দু-একটা অনুষ্ঠানেও এল। সূর্যের দ্রুত বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তা দেখে লোকটা সূর্যকে বলে,—'আপনার

সঙ্গে থাকলে মাইরি প্রচুর টাকা কামানো যাবে।'

দীপক পরে সূর্যকে বলে,—'কী করবি তুই কিছু ভেবেছিস?'

সূর্য এড়িয়ে যায়। বলে,—'ভাবছি।'

এক সন্ধ্যায় ছকু সাহা সূর্যের কাছে এল। বলল,—'কী গুরু, কাল দুটো ছেলেকে মাল দিয়ে পাঠিয়ে দিই?'

সূর্য একটু ভেবে বলে,—'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।'

তারপর দীপকের দিকে ভাসিয়ে বলে,—'কীরে, আজ এই দিনটা সেলিব্রেট করি, কী বল?'

ছকু বলে, 'চলুন, কী খাবেন? রাম না হুইস্কি?'

সূর্য হাসে,—'বাংলা।'

ছকু থমকায়,—'বেশ, তবে আমার ঠেকে চলুন।'

সূর্যরা ওদের বাড়ির রকে বসে ছিল।

সূর্য বলল,—'কোথায়?'

—'দমদমে, রেল লাইনের ধারে। সবকটা ঝুপড়িই আমার। লাইনের ধারে বসে আকাশের নীচে, হাওয়া খেতে খেতে'—ছকু চোখ মারে।

সূর্য বলে,—'আপনি এগোন, আমরা আপনাকে ধরে নিচ্ছি। একসঙ্গে বেরোনো ঠিক হবে না।'

ছকু হা হা করে হাসে,—'ঠিক বলেছেন।'

সূর্যরা পাতিপুকুর লোহার ব্রিজে উঠে স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেল টর্চ হাতে নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছকু ওদের ডাকছে। জায়গাটা উঁচু ঢিবি মতো, সামনে রেল লাইন, নীচে সার দিয়ে কয়েকটা ঝুপড়ি। কেরোসিনের কুপি জ্বলছে, আটা পোড়ার গন্ধ আসছে। রেল লাইনের দিকে পিছন করে ঝুপড়িগুলো যেন উবু হয়ে বসে আছে। ছকু বলে,—'বসুন এখানে—'

ওরা ঢিবিটাতে বসে, চার-পাঁচ হাত দূরে রেল লাইন। ছকু চেঁচায়—'এ কালুয়া, তোর মাকে বল তিনটে গ্লাস আর জল দিতে', এক বড় ভাঁড় মাংস আর দুটো বড় বাংলা মদের বোতল একটা থলের মধ্যে থেকে বের করে ছকু। একটা বাচ্চা ছেলে ঢাল বেয়ে উঠে আসে। হাতে তিনটে কাচের গ্লাস আর একটা প্লাস্টিকের জগ নিয়ে।

ওরা শুরু করে। ছকু ওর জীবনের নানা গল্প শোনায়। দীপকের কানে কিছুই ঢুকছে না। দীপক একটা গ্লাস নিয়েই বসে থাকে। সূর্য মন দিয়ে গল্প শুনছে।

একটা বোতল শেষ হয়ে যায়। ছকু শব্দ করে বোতলটা ছুঁড়ে দেয় রেল লাইনে।

রাত বাড়ছে। ঝুপড়ির আলোগুলো দপদপ করছে। একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বোধ হয় রাতে বৃষ্টি হবে।

দীপকের মাথা ঝিমঝিম করছে। সূর্য আর ছকু তখন জমে গেছে। ছকু জামা খুলে ফেলেছে। পকেট থেকে মানিব্যাগ আর একটা ক্ষুর বের করে সামনে রাখে। বলে,—'বোঝেনই তো, কতরকম মানুষ নিয়ে কারবার।'

দীপকের অস্বস্তি লাগছে। একটু হালকা হওয়া দরকার। ছকু নানা রকম আদিরসাত্মক গল্প শোনাচ্ছে। সূর্য হো হো করে হাসছে। দীপক ওদের বলে,—'আমি একটু পেচ্ছাপ করে আসছি।'

ছকু জড়ানো গলায় বলে—'এখানে যে-কোনও জায়গায় করে দিন না। এটা আমার এলাকা।' দীপক এগিয়ে যায় অন্ধকারে। লাইন পেরিয়ে একটা বুনো ঝোপের সামনে। সূর্যদের কথা কানে আসছে অস্পষ্টভাবে। একটা মালগাড়ি এগিয়ে আসছে। মালগাড়িটা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে দীপক টিবিটার কাছে এসে মিটমিট করে জ্বলা ঝুপড়িগুলোর আলোয় দেখল—ছকু সাহা চিত হয়ে পড়ে আছে। গলাটা দু'ফাঁক। সূর্য একটা রুমালে হাতের আর ক্ষুরের রক্ত মুছছে। ছকুর শরীরটা তখনও নড়ছে। দীপকের পায়ের আওয়াজে সূর্য মুখ তুলে বলে, 'এ ছাড়া উপায় ছিল না।' তারপর বলে,—'তুই পা-দুটো ধর।' নিজে ছকুর হাতদুটো ধরে। দীপক যন্ত্রের মতো পা-দুটো ধরে ছকুর শরীরটা আপ লাইনে নিয়ে যায়। গলাটা লাইনের ওপর রেখে—সূর্য দৌড়ে এসে মদের বোতল আর গ্লাস তিনটে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। দীপককে বলে, 'চল।'

দুজনে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। লাইন ধরে কিছুটা গিয়ে ওরা নীচে নামে। তারপর জনবসতির কাছে সূর্য একটা পুকুরের মধ্যে ক্ষুরটা ছুড়ে ফেলে। সে-রাতে বেদম বৃষ্টি হয়েছিল।

একটা পার্টি থেকে ফিরছেন সুবীর চ্যাটার্জি। এইচএমভি-র প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার। ড্রাইভার দ্রুত চালাচ্ছে সল্টলেকের দিকে। ৫২ বছরের সুবীরের উচ্চতা ৬ ফিট, বিশাল আয়তন। চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু মুখটার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি আছে। আজ তারই এক প্রোডাক্ট হৈমন্তী রায়ের ক্যাসেট রিলিজ উপলক্ষ্যে হৈমন্তীদের বাড়িতে পার্টি ছিল। সুবীর সেখান থেকেই ফিরছেন। খুব হই হুল্লোড় হলেও সুবীরের আজ মন ভালো নেই। এই ক্যাসেটটা মোটামুটি চলবে কিন্তু সেরকম হিট হবে না। হিট বললেই একটা নাম মনে হয় সুবীরের। 'আগুনপাখি'। সত্যিই সেটা ছিল একটা স্বর্ণ সময়। আগুনপাখির যে-কোনও

ক্যাসেটই হিট। আগুনপাখি মানেই—সূর্য। সূর্যকে তিনি বহুবার দেখেছেন স্টুডিও চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে, নোটেশন লিখে দিতে, মিউজিসিয়ানদের খাবার এনে দিতে, অ্যারেঞ্জারদের ব্রিফকেস বইতে, কোরাসে গলা মেলাতে, সারাদিন বসে থেকে ভাউচারে সই করে কোরাস গাইয়েদের ভিড়ে লাইন দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিতে।

মনে পড়ে সেদিনও...সুবীর চ্যাটার্জি গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল, দেখলেন বাসস্ট্যান্ডে সূর্য।

সুবীরের কী খেয়াল হল, সূর্যকে তুলে নিলেন—'চলো, তোমায় কিছুটা এগিয়ে দিই।'

যেতে যেতে নানা কথায় সূর্য বলে, সে গান লেখে, সুর করে—

সুবীর বলেন,—'গাও তো।'

সূর্য খালি গলায় কয়েকটা গান শোনায়।

গান শুনে সুবীর সোজা হয়ে বসেন। এ তো একদম অন্যরকম! অসাধারণ সব কনসেপ্ট!

অদ্ভুত রিদ্‌মের গিমিক, সহজ অথচ অন্যরকম সুর। সব থেকে আশ্চর্যজনক, কী সাবলীল গাওয়ার ধরন। এ তো একদম আজকের গান, এই প্রজন্মের গান! সুবীর সূর্যের ঠিকানাটা নেন।

সূর্য নেমে যায়। সুবীর ভাবেন, এই ছেলেটাকে প্রোমোট করতে হবে।

কোম্পানিতে সুবীর অবশ্য এখন একটু কোণঠাসা। জাহাঙ্গির আহমেদ তার রাইভ্যাল। সুবীরের সব প্রোডাক্টকেই সাবোতেজ করে চলেছেন। সুবীর হেরে যাচ্ছেন বারবার। এবার সূর্য হবে সুবীরের তুরুপের তাস। সুবীর দৃঢ় সংকল্পে সোজা হয়ে বসেন।

সঙ্গে সঙ্গে হল না। প্রায় একবছর পর সূর্যের প্রথম অ্যালবাম রেকর্ডিং হল—'আগুনপাখির গান।' প্রথম লটে মার্কেটে ছাড়া হল পাঁচ হাজার ক্যাসেট। চার হাজার ফেরত এল প্রথম সপ্তাহেই। ডিফেকটিভ প্রিন্টিং।

সুবীর বুঝলেন, পিছনে লাগা শুরু হয়ে গেছে। সূর্য প্রায় কাঁদতে কাঁদতে সুবীরের কাছে এল। সুবীর তাকে বোঝালেন, একটা নোংরা পলিটিক্স চলছে। যা তাঁর সহকর্মীরা করছেন, সূর্য তারই শিকার। সূর্য গম্ভীর হয়ে সব খুঁটিয়ে শুনল। তারপর চলে গেল।

সাতদিন পর জানা গেল, ইস্টার্ন বাইপাসে গাড়ি থামিয়ে একদল লোক জাহাঙ্গির আহমেদকে প্রচুর মার মারে। জাহাঙ্গির নার্সিংহোমে। সারা শরীরে সাতটা হাড় ভেঙে গেছে।

সে সপ্তাহে কোনও ডিফেকটিভ ক্যাসেট ফেরত এল না। শোনা যায়, সূর্য নাকি রিভলভার নিয়ে জাহাঙ্গির-লবির প্রত্যেকের কাছে গিয়েছিল। বলেছিল,—'একটা ডিফেকটিভ ক্যাসেট—একটা হাড়।'

সূর্যর ক্যাসেট নিয়ে আর কোনও ঝামেলা হয়নি। প্রথম ক্যাসেট ডাবল প্ল্যাটিনাম ডিস্ক হয়েছিল। সূর্য ইতিহাস হয়ে গেল।

খবরের কাগজে সূর্যর আত্মহত্যার খবর পড়ে সুবীরের মন খারাপ হয়ে আছে। কেন সুইসাইড করল ছেলেটা? পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরে এসেই সুইসাইড? না। দীপককে ফোন করতে হবে। দীপক নিশ্চয়ই জানে।

দীপক উঠে জানালার কাছে দাঁড়ায়। আকাশ ফরসা হতে চলেছে। লোপা চাইত না দীপক সূর্যময় হয়ে থাকুক।

'তোমার নিজের পরিচয় আছে।'

'সূর্য আর আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আগুনপাখি ওর একার নাম নয়।' লোপা মাথা নাড়ত—'তা হলে তুমিও ওর ওই সব ভাষণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ?' দীপক লোপাকে বোঝাতে পারত না। একটা অদৃশ্য পাঁচিল তৈরি হতে থাকে দুজনের মধ্যে। সূর্যর থেকে দীপক যত সরে আসে, লোপার ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর দিনটা। সূর্য আর দীপক মুখোমুখি।

'আর নতুন কোনও অনুষ্ঠান নিস না।'

'কত দিনের জন্য?'

সূর্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

'ফর এভার।'

দীপক অবাক হয়—'কেন?'

সূর্য মাথা নীচু করে থাকে। তারপর মাথা তুলে স্পষ্ট গলায় কেটে কেটে বলে—'আমি আর গান গাইব না। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

সূর্য উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,—'অন্য কোথাও অন্য এক পৃথিবীর খোঁজে।'

'আর আমি?'

'তোকে এই পৃথিবীটা দিয়ে গেলাম। এই যাত্রায় তুই নেই। তোর মধ্যে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। তাই আমার সঙ্গে সে-ই যাবে যে প্রায় প্রথম থেকে আজ অবধি আমার সঙ্গে দ্বিধাহীন পায়ে পা মিলিয়েছে।' সূর্য জানতে চায়,—'এখনও পর্যন্ত শেষ অনুষ্ঠানটি কবে আছে?'

দীপক বলে,—'ডিসেম্বরের ২৭ মনে হয়।'

'বেশ, তবে ওটাই আমার শেষ অনুষ্ঠান হবে।'

'—চললাম।' সূর্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ওর গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ভেসে আসে। দীপক চুপ করে বসে থাকে। তার মানে সূর্য আর থাকবে না। সূর্য তা হলে ওর রহস্যময়ী সেই প্রেমিকার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তা ছেড়ে—ওর প্রিয় চরিত্র বার্নিং ডে লাইটের মতো।

সূর্যর এই প্রেমিকাকে দীপক চেনে না। শুধু অস্তিত্ব অনুভব করেছে সব সময়। সূর্য খুব সন্তর্পণে ওর প্রেমিকাকে আড়াল করে রেখেছিল। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সূর্য মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। সূর্যর সমস্ত গতিবিধিই দীপকের জানা থাকত, শুধু এই একটা ব্যাপারই সূর্য সবার কাছে গোপন করত। দু-একদিন ডুব মেরে সূর্য ফিরে আসত, কখনও খুব মুডে, কখনও দারুণ ডিপ্রেশন নিয়ে। একটা সময় সূর্যর গলায় একটা সমস্যা দেখা দেয়। ডাক্তার দু মাস গলাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে বলেন। সূর্য দুটো মাস উধাও হয়ে যায়। ও যে কোথায় ছিল দীপক আজও জানে না। সূর্যকে প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যেত। দীপক বেশি কৌতূহল দেখাতে পারেনি। কারণ ওদের দুজনের মধ্যে একটা অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি ছিল—কেউ কারওর ব্যাপারে বেশি কৌতূহল দেখাবে না।

তবে দীপক অনুমান করে, ভদ্রমহিলা একা থাকেন, স্বনির্ভর এবং সূর্যকে ছোটবেলা থেকেই জানেন। আজ কি সূর্য তার হাত ধরেই অন্য পৃথিবীর পথ হাঁটতে চাইছে?

এরপর দু মাস যন্ত্রের মতো অনুষ্ঠান করে গেল। তারপর ওর সম্পত্তির চল্লিশ শতাংশ 'ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার'কে, কুড়ি শতাংশ দীপককে, কুড়ি শতাংশ দুঃস্থদের দিয়ে, বাকি কুড়ি শতাংশ নিজে নিয়ে গাড়ি আর ফ্ল্যাটের চাবিটা দীপকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পাঁচ বছর পর, সেদিন রাত্রে হঠাৎ সূর্য দীপকের দরজায়, একগাল হেসে বলে,—'আমার ফ্ল্যাটের চাবিটা দিবি।' সূর্যকে চেনা যাচ্ছে না। রোগা হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি। দীপক বলে,—'ভেতরে আয়।'

'না, আজ না, কাল সকালে আমার ফ্ল্যাটে চলে আয়। সব্বাইকে খবর দে। সবাই এলে ভালো হয়।'

চাবিটা নিয়ে সূর্য চলে যায়। একবারও ঘরে ঢোকে না।

দীপক সেই রাত্রেই সবাইকে ফোন করে—

'সূর্য ফিরে এসেছে...হ্যাঁ, কাল সকালে...ওর ফ্ল্যাটে।'

লোপার মুখ গম্ভীর। আবার সূর্য, মানে আবার এই শান্ত সংসারে কালবৈশাখী। দীপক ইচ্ছে করেই লক্ষ করে না লোপার এই পরিবর্তন। পূর্ণ উদ্যমে সবাইকে ফোন করে যায়।

সকালে সূর্যর ফ্ল্যাটের সামনে ভিড়। সূর্য দরজা খুলছে না। জনা চল্লিশেক মানুষ সবাই এসেছে সূর্যর ডাকে। অথচ...। দরজা ভাঙা হল। বিছানায় সূর্য শুয়ে। সারা ঘরে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বাঁ হাতের শিরাটা কাটা। ডান হাতে একটা ধারালো ক্ষুর রক্ত লেগে কালো হয়ে আছে।

দীপক সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রামুর ডাকে ঘুম ভাঙল—'দাদাবাবু, ন'টা বাজে। অফিস যাবেন না।'

দীপক মাথা তুলতে পারছে না। প্রচণ্ড গা গুলোচ্ছে। কোনওরকমে উঠে বলে—'তোর বউদি কই?'

—'বউদি সকালে চলে গেছে। আপনাকে ডাকতে বারণ করল।'

দীপক বোঝে, লোপা ওর বাপের বাড়ি চলে গেছে। কাল রাতের মেজাজের শাস্তি। যাক। দীপক ঠিক করে লোপাকে ও আনতে যাবে না। আসার অনুরোধও করবে না।

দীপক উঠতে পারছে না, মাথা ঘুরছে। মাথার দুপাশের রগ দুটো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায়। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে একটু ভালো লাগে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোনে ফোনটা বাজছে। রাত্রে ওটা নামানো ছিল, রামু বোধ হয় তুলে দিয়েছে। ফোন তুললেই আবার সূর্যকে নিয়ে প্রশ্ন, কৌতূহল। ফোনটা বেজেই চলে। এবার দীপক ফোনটা তোলে।

—'আমি অরিন্দম, কাল বারোটায় সূর্যদার বডি শ্মশানে নিয়ে যাব। তুমি কি এবারেও আসবে না।'

দীপক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,—'দেখি।'

কেন যাবে সে? গেলেই তো সেই একই প্রশ্ন—'কেন? কী বলবে দীপক?'

'আমি জানি না!' সূর্যর একমাত্র বন্ধু, প্রতিটা লড়াইয়ের সঙ্গী, প্রতিদিনের ছায়াসঙ্গী। সে আসলে কিছুই জানে না। কেউ বিশ্বাস করবে এ কথা? প্রচণ্ড রাগ জমেছে দীপকের মধ্যে। তার মানে আসলে সূর্য তাকেও বিশ্বাস করত না।

বোঝার মতো শরীরটাকে কোনওরকমে পাঁচ তলায় তুলে অফিসে ঢোকে দীপক। সবার দৃষ্টি তার দিকে। নিজের টেবিলে গিয়ে বসে। দু চোখ জুড়ে ঘুম। একরাশ ক্লান্তি। এক রাতের ক্লান্তিতেই...সূর্য হয়তো কত অসংখ্য রাতের ক্লান্তি নিয়ে...

—'দীপকদা আজ এলেন কেন? শরীর ভালো নেই যখন।'

—'এটা কি মার্ডার, না সুইসাইড?'

—'কোনও মেয়েছেলে-টেলে নেই তো ভেতরে।'

—'আপনাদের সব সময়ে কাদা ছেটানো স্বভাব।'

দীপক চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, কথাগুলো যেন ভাসছে—শব্দগুলো চেনা চেনা কিন্তু মানে বোঝা যাচ্ছে না।

—'দীপকদা আপনার একটা চিঠি এসেছে।'

দীপক কোনওরকমে চোখ তুলে চিঠিটা নিয়ে জামার পকেটে রাখে। আবার চোখ বোজে। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে শব্দ করে। দীপক বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

—স্যার, ম্যানেজারবাবু আপনাকে ডাকছেন।' দীপক কোনওরকমে নিজের দেহটাকে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে যায়।

—'আসুন, আসুন, আপনি আজ এলেন কেন? বসুন?', চৌধুরী সিগারেট ধরায়। মধ্যবয়স, টাক মাথা, মোটা গোঁফ, উশখুশ করছে যেন, দীপক মনে মনে ভাবে—'শালা, কিছু জানতে চায় নিশ্চয়ই।'

চৌধুরী বলে,—'আপনার লোন তো স্যাংশন হয়ে গেল।'

দীপক মাথা নাড়ে, সে জানে।

চৌধুরী সিগারেটে টান দেয়, যেন কথা খুঁজছে। দীপকের চোখ বুজে আসছে। 'দীপকবাবু, আপনার বন্ধুর ব্যাপারটা আসলে কী বলুন তো?'—চৌধুরীর গলা শোনা গেল। দীপকের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। দীপক সোজা দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে, তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বাড়িতেই যাবে সে। বাড়িটাই নিরাপদ। বাড়িতে এসে জামাকাপড় খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। যেন অনেক কালের ঘুম জমা ছিল। আধঘুমন্ত দীপক টের পায়, রামু এসে মাথার নীচে বালিশ দিয়ে গেল, জানালার পরদাগুলো টেনে দিল, দলা পাকানো জামাকাপড়গুলো নিয়ে গেল। রামুর মধ্যে একটা মাতৃহৃদয় আছে। মাঝে মাঝেই যেটা বেরিয়ে আসে—কিন্তু সূর্য কেন?...ভাবতে ভাবতে দীপক তলিয়ে যায় ঘুমে।

ঘুম ভাঙল পরের দিন সকালে। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। বাথরুমে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে বেরোয়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। দেখে, রামু কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে।

—'দাদাবাবু, একটা ভুল হয়ে গেছে।'

—'কী হয়েছে বলেই ফ্যালো।'

রামু হাতের মুঠো খোলে, একটা দলা পাকানো ভেজা কাগজ।'

—'আপনার জামার পকেটে ছিল। আমি বুঝিনি, কাচার পর বুঝলাম'। দীপকের মনে পড়ে অফিসে একটা চিঠি এসেছিল। এটাই সেটা—হাত বাড়িয়ে নেয়, কোনওরকমে খামটা খুলে ভেতর থেকে কাগজটা বের করে। ভিজে কাগজ, কষ্ট

করে মেলে ধরে দু-হাত দিয়ে। দীপকের বুকটা ধক করে ওঠে—এ তার চেনা হাতের লেখা। এই হাতের লেখা নিয়ে দিনের পর দিন ঝগড়া হয়েছে, 'হাতের লেখাটা ভালো করো।' ফুলস্কেপ কাগজে শুধু নীল রঙের ছোপ। সাদা নীলে মিশে যেন আকাশের আদল। ওপরে একটা লাইন শুধু পড়া যাচ্ছে। 'আজ তোকে কতগুলো সত্যি কথা বলব...'

তারপর লেখাগুলো ধুয়ে গেছে—আকাশ হয়ে গেছে। তার মানে, যেদিন ও সুইসাইড করে সেই দিনই চিঠিটা লিখে পোস্ট করেছিল। ফোনটা বেজে ওঠে—

—'কে?'

—'আমি অরিন্দম, সূর্যদার বডি এখানে, এক্ষুনি দাহ হবে। তুমি আসবে না?' দীপক ফোন নামিয়ে রাখে। টেবিলের ওপর নীল ছোপ ছোপ সাদা কাগজটা যেন তাকিয়ে আছে। 'আগুনপাখি'কে এখন আগুনে সমর্পণ করা হতে চলেছে। একটু বাদেই ধোঁয়া হয়ে আগুনপাখি আকাশ পাবে। আর দীপকের টেবিলে আগুনপাখির একান্ত আকাশ এক টুকরো কাগজের আদলে, সে আকাশ আজও দুর্বোধ্য, অজানা।

ঘুম

বিকেলের নিভে আসা আলোয় পৃথিবীটাকে ভীষণ বিষণ্ণ মনে হয়, দূরের গাছগুলোকে মনে হয় আকাশের দিকে মাথা তুলে বিষণ্ণতার কারণ খোঁজার চেষ্টায় ব্যর্থ। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল কেমন সারি বেঁধে আকাশের বুকে অদ্ভুত সব রেখার সৃষ্টি করে উধাও হয়ে যায় অজানায়। তাদের মধ্যে দলছুট কয়েকজন ইতস্তত পাক খাচ্ছে আকাশে, মানুষের চিন্তার মতো।

আর একটু পরেই আকাশটা চোখ বুজবে, প্রকৃতি ঘুমোবে। ঘুম মানেই তো স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, প্রকৃতির ঘুমন্ত মুখে রাতের শিশির জলছবি আঁকবে। ঘুম গাঢ় হবে। প্রকৃতি কি স্বপ্ন দেখতে পারে? কে জানে!

ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছে চঞ্চল, চঞ্চল বসাক। এই ধরনের ভাবনা ভাবতে তার বেশ ভালো লাগে। অনেকেই অনেক কিছু দেখে কিন্তু কল্পনার রং দিয়ে তাকে বর্ণময় সবাই করতে পারে না—একথা তার বাবা বীরেন বসাক প্রায়ই বলতেন। বাবা অনেক কিছুই বলতেন যা চঞ্চল, ছোটবেলায় হাঁ করে শুনত, ভাবত—আমার বাবা সব জানে। সত্যিই অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বীরেন বসাকের, শিল্প-সংস্কৃতির একজন উঁচুদরের সমঝদার ছিলেন তিনি, প্রতি শনিবার তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসত সাহিত্যবাসর, সাহিত্য জগতের সমস্ত নামি-দামি মানুষের সমাগম হত। সবাই তাঁদের নিজেদের লেখা পাঠ করতেন। সে লেখার বিশ্লেষণ হত, সমালোচনাও। তবে শুধু যে নামি লোকেরাই আসতেন তা নয়—বহু অনামি প্রতিভারাও আসত। সাহিত্যবাসরের শেষে একটা চমক থাকত। সবার রচনা পাঠ হওয়ার শেষে বীরেন বসাক তাঁর নিজের একটি রচনা পাঠ করতেন। সবাইকে হতবাক করে দিতেন বীরেন বসাক। সবাই তাঁকে বলত,—দাদা, আপনি কেন লেখেন না? মানে আপনার লেখা কেন প্রকাশিত হয় না? আপনি চাইলে তো সব প্রকাশকই ছুটে আসবে।

বীরেন বসাক হাসতেন,—আরে না না আমরা হলাম গিয়ে অ্যামেচার।

আসল কথাটা কাউকে বলতেন না, আসলে তিনি অপ্রকাশিত হয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন।

ঘনিষ্ঠ মহলে মাঝে মাঝে বলতেন, 'আমার লেখা প্রকাশিত হল কি হল না তাতে কী যায়—প্রশংসা করার কোনও চোখই যেখানে পৌঁছায় না, তার মানে কি সে ফুল ফোটা অসার্থক? তার সার্থকতা তার ফোটার আনন্দেই।' চঞ্চল তখন ছোট, এসবের মানে খুব ভালো করে বুঝত না। দেখত সবাই বাবাকে কেমন শ্রদ্ধা করে।

মা রীতা বসাককে দেখত চঞ্চল—নামি-অনামি সব লেখককে পাত পেড়ে খাওয়াতেন, সারাক্ষণ তার মুখে হাসি। স্বামীর গর্বে গরবিনী ছিলেন রীতা বসাক।

চঞ্চল তখন একটু বড় হয়েছে। সাহিত্য বাসরে এসে বসে থাকে, শোনে।

এই সময় থেকেই তাদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। বাবা সবাইকে বিশ্বাস করে অবশেষে ঠকলেন। বীরেন বসাকের এই সময় একটা স্ট্রোক হয়। মানুষটা আমূল বদলে গেলেন। যে মানুষটা সারাদিন ব্যাবসাবাণিজ্য ছেড়ে পড়াশুনোয় মগ্ন থাকতেন, অসংখ্য মানুষকে তার শিক্ষার, জ্ঞানের শরিক করতেন—সেই মানুষটা আর কারও সঙ্গে মিশতেন না। সমস্ত বই বিক্রি করে দিলেন। সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। চঞ্চল মাঝে মাঝে শুনতে পেত বাবা, মাকে বলছেন,—রীতা তুমি ভাবতে পারো যে মানুষগুলোকে আমি এত বিশ্বাস করতাম, তারা আমায় ঠকাল? চঞ্চল দেখত তাদের সংসারের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

হাল ছাড়েনি তখন একজন—তার মা রীতা বসাক। তিনি চঞ্চলকে বলতেন,—খোকা বাবার পথ ধরিস না, ওই মানুষটা সরল, লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুজনকে একসঙ্গে আরাধনা করতে পারেনি। তুই কিন্তু লক্ষ্মীর আরাধনাই করিস, সরস্বতী আজকের পৃথিবীতে উপেক্ষিত। বাবা মারা গেলেন সেও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, পরের বছরই মা। মারা যাওয়ার আগে বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন,—রীতা আমি আর পৃথিবীতে থাকতে চাই না। পুনর্জন্ম আছে কি না জানি না তবে আমি আর জন্মাতেও চাই না! এই পৃথিবীটার প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা রইল না, মোহও নয়।

বাবা কেমন ফ্যালফ্যালে চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাবা জিজ্ঞাসা করতেন,—আমার মতো একটা অপদার্থ মানুষকে পেয়ে তোমার জীবনটার সেইভাবে বিকাশ হল না রীতা, আমায় ক্ষমা করো।

মা স্থির গলায় বলতেন তুমি আমার অহংকার, তোমার মূল্যায়ন অন্য কেউ না করলেও আমি তোমার মূল্য জানি, তোমায় পেয়ে আমার কোনও আপশোশ নেই—গর্ব আছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমি পরজন্মেও যেন তোমাকেই পাই স্বামী হিসেবে। প্রায় একই ধরনের কথোপকথন হত মা-বাবার মধ্যে। আসলে বাবা বীরেন বসাকের গোটা জীবনের বোধটাই কেমন নড়ে গেছিল। তাই বোধ হয় একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো। মা রীতা বসাক ধীর স্থির হয়ে তার স্বামীকে বোঝাতেন, আগলাতেন।

*

গাড়ির স্পিড প্রায় আশি, কোয়ালিস। চঞ্চলের খুব প্রিয় এই গাড়ি। গাড়ি চালাতে তার খুব ভালো লাগে, মনে হয় সময়ের ডানায় বসে সে বর্তমানকে অতিক্রম করছে।

অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে সে এই জায়গায় আসতে। কী না করতে হয়েছে তাকে? গুণ্ডা পুষতে হয়েছে, ঘুষ দিতে হয়েছে, মেয়েছেলেও সাপ্লাই করতে হয়েছে। পুরোনো দিনগুলো তার আর মনে করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় দুঃস্বপ্ন।

আজ সে সুখী। দু-বছর হল বিয়ে করেছে বেলাকে। তাদের একটি ছেলে—এক বছরের, নাম যুগ।

সে সারাজীবন শুধু কাজই করে গেছে মা রীতা বসাকের কথা মতো। সরস্বতীর উপাসনা ছেড়ে। কিন্তু বাবা বীরেন বসাক রয়েই গেছেন তার রক্তে। এখনও তার মনে হয় "আমি ক্লান্ত প্রাণ, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন", তবু সে সুখী কারণ, তার ক্লান্তি মোছাতে বনলতা সেন হয়ে তার জীবনে এসেছে বেলা।

অনেক যুদ্ধ করে বেলাকে বিয়ে করেছে সে। বেলার বাবা-মা রাজি ছিলেন না সে বিয়েতে। তারপর যখন ধীরে ধীরে চঞ্চলের ব্যাবসা জমে উঠল, তখন মেনে নিলেন। চঞ্চল মনে মনে হাসে—সরস্বতী উপেক্ষিত, লক্ষ্মীর দাপটে।

এখন চঞ্চল বাড়ির পথে হলদিয়া থেকে। একটা বড় কনট্রাক্ট পেয়েছে সে, বেলাকে খবরটা ফোনে দিতে পারত কিন্তু দেয়নি, চমক দেবে বলেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে ছেলে যুগের মুখটা মনে পড়ে চঞ্চলের, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে—এরই নাম বোধ হয় স্নেহ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে চঞ্চল দেখে একটা লরি একেবারে সামনে এসে গেছে। ডান দিকে ঘোরাতে গিয়ে দেখে আর সময় নেই। লরিটা সশব্দে তার গাড়িতে ধাক্কা মারে। সামনের কাচটা চুরমার হয়ে যায়—স্টিয়ারিংটা বুকের ওপর চেপে বসে। চঞ্চলের চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায়।

তারপর সে বসেই থাকে। বসে না থেকে উপায়ও নেই কারণ গাড়িটা দুমড়ে মুচড়ে এমন একটা অবস্থায় যে তার কোথায় দরজা কী কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর স্টিয়ারিংটাও বুকের মধ্যে চেপে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখে কিছু লোক জমা হয়েছে। তারা গাড়িটার মধ্যে থেকে তাকে বার করার চেষ্টা করছে। চঞ্চল তখন খুব বিরক্ত। এতক্ষণ ধরে ভাঙা গাড়িটার মধ্যে বসে বসে সে ভাবছিল একটা লোকও উদ্ধারের জন্য আসছে না কেন? তারপর যখন এল

তাও, এত পরে!

লোকগুলো তাকে বার করছে কিন্তু চঞ্চল এত বিরক্ত যে তার কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। একটা ভাঙা অ্যাম্বাসাডারে তাকে তুলে লোকগুলো একটা হাসপাতালের সামনে এল। হাসপাতালটার নামটা চঞ্চল ভালো করে পড়তে পারল না। হড়বড় করে লোকগুলো তাকে একটা স্ট্রেচারে করে ভেতরে নিয়ে গেল।

চঞ্চল বুঝতে পারছে—এটা অপারেশন থিয়েটার, সে অপারেশন টেবিলটার ওপর শুয়ে আছে। কয়েকজন ডাক্তার তার পেটের কাছে ঝুঁকে পড়ে কী সব করছে। প্রচুর ব্যস্ততা।

বালিগঞ্জের একটা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বেলা তখন তার স্বামী চঞ্চল বসাকের অপেক্ষায় বসে আছে, ছেলে যুগ ঘুমোচ্ছে। যুগ অদ্ভুত ভাবে ঘুমোয়—উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুটো মাথার ওপর রেখে। চঞ্চল ওকে ঘুমোতে দেখলেই খুব হাসে। বেলা যুগকে দেখছে এমন সময় একটা ফোন বেজে ওঠে। বেলা গিয়ে ফোন ধরে। ও পাশের কণ্ঠস্বর দ্রুত কিছু কথা বলে। বেলার হাত থেকে ফোন পড়ে যায়, তার চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—তারপর ছুটে বাথরুমে গিয়ে। অ্যাসিডের বোতলটা নিয়ে গলায় উপুড় করে দেয় সে।

চঞ্চল টেবিলের ওপর শুয়েই আছে। এবার ডাক্তারদের ব্যস্ততা আর নেই। যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। চঞ্চল ভাবে—এই তো হাসপাতালের ব্যবস্থা, ডাক্তারদের ওপর মানুষ এমনি ক্ষেপে যায়?

সে শুয়েই আছে, ভাবে—গাফিলতির একটা সীমা থাকে। তাকে তো এবার ছেড়ে দিতে পারে? এবার চঞ্চল খুব বিরক্ত বোধ করে, ভাবে কিছু বলবে কিন্তু এই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না তার। হঠাৎ কিছু লোক এসে তাকে একটা স্ট্রেচারে করে একটা কাচ ঢাকা গাড়িতে তুলে ফেলল তারপর গাড়িটা গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়াল, তাকে নামিয়ে একটা খাটের মতো জায়গায় শুইয়ে দিল। শুয়ে শুয়ে চঞ্চল সিলিং আর দেওয়ালের দিকে দেখে কাঠকয়লা দিয়ে কী সব লেখা, ভালো করে পড়তে পারে না সে। তাকে ঘিরে অনেক মুখ। এক সময় তাকে ঠেলে এক দিকে নিয়ে যায় সবাই। দেখে একটা চুল্লি তার মাথার কাছে দাউদাউ করে জ্বলছে। কাছাকাছি যেতেই চড়চড় করে মাথার চুলগুলো পুড়তে শুরু করল চুল্লির মধ্যে—উঃ কী গরম!

*

ধড়মড় করে উঠে বসে মানুষটা। সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, মানুষটা ভাবে স্বপ্ন না ছাই দুঃস্বপ্নেরও অধম। একটা গোটা জীবনের স্বপ্ন দেখল—প্রায় চল্লিশ বছর দীর্ঘ, বিরাট লম্বা দুঃস্বপ্ন—ভাবা যায় না। মানুষটা চোখ কচলায়, এদিক ওদিক তাকায়। এই তো সেই গাছ, যার নীচে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারপরই এই অলক্ষুণে দুঃস্বপ্নটা। না সে আর ভাবতে চায় না, কিন্তু তবুও একটু মনে করার চেষ্টা করে—লরি-কবিতা-চুল্লি...আর কিছুই মনে পড়ে না। যেমন হয় আর কী। স্বপ্ন দেখার শেষে ঘুম ভেঙে স্বপ্নের ছবিটা যেমন ঘোলাটে হয়ে যায় তেমনই ভাঙা ভাঙা দু-চার কথা তার মনে পড়ল, বাকিগুলো স্মৃতি হাতড়েও পাওয়া গেল না। যাকগে, ওঠা যাক, কখন ঘুমিয়েছি কে জানে? মানুষটা উঠে দাঁড়ায়—পায়ে পায়ে এগোতে গিয়ে মনে পড়ে স্বপ্নে তার নাম ছিল চঞ্চল। এটা একটা উপত্যকার মত জায়গা—পায়ে চলা পথটা এঁকে বেঁকে গেছে চঞ্চল আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। এ পথ তার ভীষণ পরিচিত লাগছে, যেন কতবার এপথ ধরে সে হেঁটে বেরিয়েছে। এখানে সব সময়ই একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে—এ পরিবেশে চঞ্চল অভ্যস্ত।

সামনের পথ দিয়ে কত মানুষের দল তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। সবাইকে সে চেনেও না। অনেককে চেনে। এক জায়গায় বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একজনকে বেশ ভালো লাগল চঞ্চলের—সেই মানুষটাও চঞ্চলকে দেখে, মাথা নাড়ে, হাসে। মানুষটার, শান্ত, সৌম্যদর্শন চেহারা। চঞ্চল তাকে বলে,—আমি চঞ্চল। মানুষটা প্রশ্ন করে—এই ঘুম ভাঙল? চঞ্চল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। মানুষটা নিজে থেকেই বলে আমি বীরেন। আমার প্রায় দশ বছর আগে ঘুম ভেঙেছে। চঞ্চল আরও এগিয়ে যায়। একজন নারী পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখে হাসে। সেও হাসে। সে হাসিতে কেমন লজ্জা লজ্জা ভাব। তাই দেখে আর একজন প্রৌঢ়া নারী হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে বলে,—কী গো বাপু আমাদের মেয়েকে মনে ধরেছে নাকি? আশেপাশের অন্যসব নারীরা হেসে ওঠে। চঞ্চল অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাই দেখে সেই প্রৌঢ়া বলে,—না গো বাপু রাগ কোরো না, মশকরা করছিলাম। আমার নাম রীতা—আমার ঘুম ভেঙেছে প্রায় ন'বছর।

চঞ্চল এগিয়ে চলে, দেখে একটা গাছতলায় অনেকে ঘুমিয়ে আছে। একজনের শোয়াটা বড় অদ্ভুত। চঞ্চল এগিয়ে যায়, দেখতে থাকে। তাকে ওরকম ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন হেসে এগিয়ে এসে বলে,—ও ভাবেই ও ঘুমোয়, ওর নাম যুগ, ও এখন আরও ঘুমোবে। এখন জাগবে না। চঞ্চল উপত্যকার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। নীচে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না—সাদা মেঘের আস্তরণ।

চঞ্চল আস্তে আস্তে সেখানে বসে। এমন সময় দেখে একজন নারী আরেকজন নারীকে ধরে ধরে একটা গাছতলায় দাঁড় করাচ্ছে। চঞ্চলের দিকে চোখ পড়ে সে নারীর, হাসে। চঞ্চল বলে,—কী হয়েছে? পাশের নারীটি বলে,—এই মাত্র ঘুম ভাঙল ওর, এখনও রেশ যায়নি তাই মাথা ঘুরছে। চঞ্চল বলে,—তুমি কে গো? অস্ফুট স্বরে নিদ্রাতুর নারী বলে,—আমি বেলা।

চঞ্চল বসে আছে। সাদা মেঘ বিক্ষিপ্ত ভাবে তাকে ঢেকে দিচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। কোথা থেকে ভেসে আসছে—একঘেয়ে একটানা...। উপত্যকার মানুষদের মধ্যে কয়েকজন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে গাছের নীচে আশ্রয় নেয়—তাদের বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দ চলতেই থাকে...চলতেই থাকে...

চঞ্চলের চোখের পাতা দুটো কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল ভাবে—যা বাব্বা এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলাম, আবার দেখি ঘুম পাচ্ছে। চঞ্চল গাছের তলায় আশ্রয় নিতে এগিয়ে যায়—তার বড্ড ঘুম পাচ্ছে...।

ঘর্মাক্ত সত্যেন মাধুরীর শরীরের ওপর থেকে ওঠে—মাধুরী সত্যেনের সেক্রেটারি। সত্যেন এক বেসরকারি ফার্মের ম্যানেজার। জায়গাটা একটা গেস্ট হাউস। সত্যেন হাসছে, মাধুরী জামাকাপড় পরতে পরতে বলে—কিছু হবে না তো? তুমি তো আজ কণ্ডোমও ইউজ করলে না।

সাপলুডো

পেশেন্ট-৬৩ ঃ

অন্ধকার একটা রাস্তা, দূরে একটা আলোর উৎস। কিন্তু যত এগোচ্ছি, আলো পিছিয়ে চলেছে। রাস্তাটা ধীরে ধীরে একটা সুড়ঙ্গের রূপ নিল যার স্যাঁতসেঁতে দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দেওয়ার মতো কী সব লেগে আছে। একটু পরে বোঝা গেল ওগুলো মানুষের রূপ।

মুখগুলোর অভিব্যক্তি বদলাচ্ছে কিছু সময় অন্তর। আমি এগোচ্ছি অন্ধকারে, পায়ের নীচে আঠা আঠা কী যেন লাগছে। আঠার ঘনত্ব বাড়ছে, পা জড়িয়ে যাচ্ছে, হাঁটতে পারছি না। এক একটা পদক্ষেপ মনে হচ্ছে এক এক যুগ...মাথার কাছে অন্ধকারে কী সব ওড়াউড়ি করছে তবু আমি এগিয়ে যাচ্ছি। এবার দেখা গেল সুড়ঙ্গের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা বিরাট সাপ আলোর উৎসকে আড়াল করে বসে আছে। বিরাট সে সাপটা—কী করব? সাপটা মুখ দিয়ে আগুন ছোড়ে।

৬.১২.০৩

মনোবিশেষজ্ঞের টীকা ঃ ইনি এক সাধারণ অনিরাপত্তামূলক ভাবনার মানসিকতাসম্পন্ন রোগী, ভেতরে ভেতরে দুর্বল যিনি জীবনে বিশেষ ধরনের কোনও কাজই করেননি।

পেশেন্ট-৬৩ ঃ

সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে আমি যেন উড়ে যাচ্ছি। নীচে পান্না সবুজ ঘাস, আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল চারপাশ, আমার পাশ দিয়ে গাছেরাও যেন উড়ে যাচ্ছে, একটা হিমেল হাওয়া আমার গায়ে ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে আমি যেন পাখি—খাঁচা ভেঙে আকাশের কোটরে মুখ ডোবাচ্ছি।

এবার আকাশটা যেন বেগুনি রং নিতে শুরু করছে। আকাশের

উজ্জ্বল রং কেমন আস্তে আস্তে বিবর্ণ হচ্ছে—মৃত্যু পথযাত্রীর চোখের মতো। নীচে একটা গ্রাম, কে যেন বলে দিল গ্রামটার নাম সন্ধ্যাজল। অপূর্ব নাম! গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে। আমার খুব ইচ্ছে করছে কোনও একটা কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়তে, মনে হচ্ছে ঢুকে পড়ি। মাটির দাওয়ায় মুখ গুঁজে ধুলোর গন্ধ নিই। আমি একটা ঘরের দিকে এগোচ্ছি। দাওয়ার সামনে হঠাৎ দেখি সাপটা বসে—মুখ দিয়ে সাদা আগুন ছোড়ে।

১৬.১২.০৩

মনোবিশেষজ্ঞের টীকা ঃ আমাদের চিকিৎসায় মানুষটির মানসিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা কাটবে বলে আশা করছি। আর দু-একটা সিটিং-এর পর মনে হয় ওনার সাপ নামক প্রতিবন্ধকতা কাটাতে পারব।

অনেক অনেক বছর আগের একটা জগৎ—যে জগতে আমি দাঁড়িয়ে। চারপাশে অদ্ভুত কুয়াশা। দূরে কতগুলো ন্যাড়া পাহাড় মাটির বুক চিরে হঠাৎই যেন মাথা তুলেছে বিদ্রোহ করবে বলে। আমি দাঁড়িয়েই আছি, দূরে কিছু মানুষ শিকার করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সূর্যের আলোয় ওদের বল্লম ঝিকমিক করছে। একদল মহিলা পাথরের ওপর বসে একটা জন্তুর নাড়িভুঁড়ি বার করছে, তাদের সামনে একটা বিরাট আগুন জ্বলছে—হয়তো ঝলসিয়ে খাবে। একজন বিরাট চেহারার মানুষ উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পা নেড়ে কী সব বলে যাচ্ছে বাকিরা সবাই তার কথা শুনছে। এক সময় একটা বলগা হরিণ দেখতে পায় সবাই। পৈশাচিক উল্লাসে সবাই তাকে ধাওয়া করে, হরিণটা দৌড়োতে দৌড়োতে আমার সামনে এসে পড়ে। আমার সামনে এসে কেমন যেন হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। আমি তাকে আড়াল করে দাঁড়াব ভেবে এগোতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি আমার আর হরিণটার মাঝখানে সাপটা। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। অস্ত্র হাতে মানুষগুলো এগিয়ে আসছে। আমার অস্থির লাগছে—হরিণটা ছটফট করছে—করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে—আমার দুটো পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে যাচ্ছে, নড়তে পারছি না, সাপটা লেজ ঝাপটাচ্ছে।

আমার এই সাপটার হাত থেকে কি মুক্তি নেই? এই সাপটা থাকলে আমার বাঁচার কোনও আশাই নেই। সাপটাকে মরতেই হবে, সাপটা মুখ দিয়ে সাদা আগুন ছুড়ছে।

২৬.১২.০৩

মনোবিশেষজ্ঞের টীকা ঃ মানুষটি তার দুর্বলতা কাটাতে চাইছে, আমাদের চিকিৎসা কার্যকরী হতে চলেছে। মানুষটি তার জীবনের সব প্রতিবন্ধকতার প্রতীক মারার কথা ভাবছে। তার মানে তার সাপ বা কোনও বাধার সম্মুখীন হয়ে কোনওরকম স্নায়বিক দুর্বলতা কাজ করছে না।

পেশেন্ট-৬৩ ঃ

আমি নারীটির বুকের ওপর শুয়ে আছি, তার চুল উড়ে উড়ে আমার মুখের ওপর এসে পড়ছে। নারী শরীরের একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে, কেমন যেন নেশা হয় সে গন্ধে। জুতোর কালি বা নতুন কেনা বইয়ের মধ্যে যে গন্ধ থাকে খানিকটা সেরকম অথবা জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে জল ঢেলে দিলে যেমন একটা মন খারাপ করা গন্ধ আসে খানিকটা সেরকম। নারীটি আমার মাথার চুলে হাত বোলায়, তার আঙুলগুলো যেন একেকটা পুরোনো গান। আমার মাথার মধ্যে দিয়ে সেইসব গান আমায় আমার ছোটবেলায় নিয়ে যাচ্ছে যেন। আমার কেমন শীত করছে। দূরে একরাশ কুয়াশা এগিয়ে আসছে, কুয়াশারা আমাদের মাথার ওপর এসে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে থাকে, আমি ভিজছি। হঠাৎ সেই নারী উঠে দাঁড়ায়, আমাকে সরিয়ে হাঁটতে থাকে, বৃষ্টি অতিক্রম করে চলে যেতে চায় এবং যায়ও। আমি ভিজছি, আমি তাকে ডাকি, সে মুখ ঘুরিয়ে দেখে আমায়। তার চোখে অদ্ভুত তাচ্ছিল্য আর আহ্বান দুটোই ছিল, আমি তার দিকে এগোতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সে আমার থেকে অনেক দূরে। আমি এগোচ্ছি কিন্তু দূরত্ব কমছে না। আমি বৃষ্টিতে ভিজতেই থাকি আর সে বৃষ্টি অতিক্রম করে এগিয়েই চলেছে আর ফিরছে না। হঠাৎই বৃষ্টির স্পর্শ বদলে গেল, বৃষ্টির জল এখন আর ঠান্ডা নয়—গরম। সেই বৃষ্টির ধারায় আমার মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন হতে শুরু করছে। আমার সমস্ত দুর্বলতা, আমার ক্লীবত্ব, আমার হতাশা, সবই যেন কেমন আমার শরীর ধুয়ে মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে। চোখের সামনে বিদ্যুতের মতো কতগুলো ছবি ভেসে উঠছে। ছোটবেলায় খেলতে খেলতে মাথায় ব্যাটের আঘাত, আয়নায় ব্যান্ডেজ বাঁধা নিজের মাথা, ওষুধ-ইঞ্জেকশন, আত্মীয়স্বজনের হতাশভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, বাবার বলিরেখায় ঢাকা কপাল কুঁচকে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা, বন্ধুদের বিদ্রুপ—ও একটা ভেজিটেবল, প্রতিবার পরীক্ষায় ফেল করে আসা, মৃত্যুশয্যায় বাবার অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা, ঠাকুরের কাছে মায়ের মিনতি—ঠাকুর, ও কি জীবনে কিছুই করতে পারবে না? এসব, সব-সব-সব ছবি কেমন দুমড়ে মুচড়ে বৃষ্টির জল হয়ে

শরীর ধুয়ে আমায় হালকা করছে। চিৎকার করে বলি,—হ্যাঁ আমি পারব, আমি-আমি ছুটছি, আমি বৃষ্টি অতিক্রম করে নারীটির কাছাকাছি এমন সময় হঠাৎ আমার আর সেই নারীর মাঝে সাপটা এসে দাঁড়ায়। সাপটা ফুঁসে ওঠে, মুখ দিয়ে সাদা আগুন ছোড়ে। নাঃ সাপটাকে মারতে হবে, সবসময় আমার আর আমার কাঙ্ক্ষিত যে-কোনও বস্তুর মাঝখানে সাপটা এসে দাঁড়ায়। আমার দুর্বলতা, আমার অক্ষমতা মনে করিয়ে দেয়। আমি সাপটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছি। সাপটার লেজে প্রচণ্ড জোর, লেজটাকে আটকাতে না পারলে ওর কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে না, সুতরাং ওর লেজটাকে বর্শা দিয়ে মাটিতে গেঁথে দিতে হবে, আর বুকটাকেও গেঁথে দিতে হবে বর্শা দিয়ে যাতে ছোবল মারতে না পারে। তারপর গলা কেটে দেওয়াটা অনেক সহজ হবে।

১০.২.০৪

***মনোবিশেষজ্ঞের টীকা ঃ** আমাদের চিকিৎসা সফল হয়েছে, আমাদের রোগী এখন পুরোপুরি সুস্থ, এক্ষেত্রে...*

এটুকু লিখতে পেরেছিলেন ডাঃ সেন—৬৩ নম্বর পেশেন্টের ফাইল পড়া বন্ধ করে, ইন্সপেক্টর অমিত ভদ্র তার সুপিরিয়র, ডিটেকটিভ সুবীর করনজাইকে বললেন,—এইটুকুই লিখতে পেরেছিলেন কারণ ১০ তারিখের পরই তিনি খুন হন। সুবীর করনজাই কান চুলকোতে চুলকোতে বললেন,—৬৩ নম্বর পেশেন্ট কখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এসেছিল? অমিত ফাইল দেখে বলল,—সন্ধে ছ'টায়। সুবীর বলে,—আর খুন তো হয়েছে দশটায়। কিছুক্ষণ কান চুলকে আবার বলেন,—অত রাত্রি অবধি উনি চেম্বারে বসে কী করছিলেন? অমিত বলে,—ডাঃ সেন অনেক রাত অবধি পেশেন্টদের কেস হিস্ট্রি অ্যানালিসিস করতেন চেম্বারে বসে, সেদিনও তাই করছিলেন বোধহয়। সুবীর বলে,—এটা কী করে জানা গেল? অমিত বলে,—ডাঃ সেনেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাঃ রণদেবের কাছ থেকে।

—উনি সেদিন কোথায় ছিলেন? অমিত বলে,—উনি সেদিন ছুটিতে ছিলেন। সুবীর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে যতগুলো রুগির কেস হিস্ট্রি পড়লাম, তার মধ্যে থেকে তো এই লোকটাকেই সন্দেহ হচ্ছে। অমিত বলে—শুধুমাত্র কেস হিস্ট্রির ওপর বেস করে এই সিদ্ধান্তে আসা কি ঠিক হবে স্যার? মানসিক রোগীরা ওষুধে আচ্ছন্ন হয়ে অনেক কথাই বলে থাকে। সেগুলো ডাক্তার রেকর্ড করে তার মনের গতিবিধি বোঝার জন্য। একেক ডাক্তারের কিন্তু একেকরকম ব্যাখ্যা হয়। সুবীর খেঁকিয়ে ওঠে—থামুন তো মশাই, এইসব পাগলদের

আপনি চেনেন না, এরা আচ্ছন্ন হয়ে যেটা ভাবে সেটাই করে। এদের আলাদা একটা জগৎ থাকে, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিলই নেই। এই দেখুন না ডাক্তার সেন কী করে মারা গেলেন। চেয়ারের দুটো পায়ার সঙ্গে পা দুটো পেরেক দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তারপর বুকে তিনটে পেরেক গুঁজে বুকটাকে আটকে দিয়েছে, অতঃপর কণ্ঠনালিটা কেটে দিয়েছে। আর এই লোকটা সাপটাকে কীভাবে মারতে চেয়েছে দেখুন না, মিলে গেল কিনা।

অমিত বলে,—কিন্তু সে তো আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রলাপ...সুবীর ঝাঁপিয়ে ওঠে—আরে রাখুন মশাই আপনার প্রলাপ, এদের গোটা জীবনটাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কেন ওই ছবিটা দেখেননি—সাইকো! অমিত আমতা আমতা করে। সুবীর বলে,—এই ৬৩ নম্বরের পাগলটার ঠিকানা খুঁজে বার করুন। আর কাল ওটাকে তুলে আনুন। আমি শিওর এটা ওরই কাজ।

পুলিশের ভ্যান গিয়ে দাঁড়ায় বালিগঞ্জের একটা অভিজাত পাড়ায়। পুলিশ গিয়ে একটা ফ্ল্যাটের দরজায় নক করে। একজন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ দরজা খোলে। অমিত তার আইডেন্টিটি কার্ড দেখায়। মানুষটা কার্ডটা দেখে তারপর চোখ তুলে হেসে বলে,—হ্যাঁ আমিই সাপটাকে মেরেছি, আমি ভেজিটেবল নই।

রণদেব তার এক কামরার ফ্ল্যাটে একটা গেঞ্জি আর একটা বারমুডা পরে আঙুলে বরফ ঘষছে। তার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা নীল হয়ে আছে। অতগুলো পেরেক গাঁথতে গিয়ে হাতুড়িটা একবার মিস হয়ে তার বুড়ো আঙুলে পড়েছিল, পুলিশ যদিও কিছু বোঝেনি, কিন্তু ব্যথাটা খুব বেড়েছে, এমন সময় ফোন বেজে ওঠে, রণদেব উঠে গিয়ে ফোন ধরে, ওপাশ থেকে লীনার কণ্ঠস্বর—আমি বলছি। রণদেব চাপা গলায় রাগত ভাবে বলে,—তোমায় বলেছি না আমাকে এখন ফোন করবে না। ওপাশ থেকে লীনা বলে,—আমার ভীষণ নার্ভাস লাগছে। রণদেব তাড়াহুড়োতে বলে,—নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছ'মাসের মধ্যে আমাকে ফোন করবে না বলেছিলাম না, হয়তো তোমার ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। ওপাশ থেকে বলে,—আমি বুথ থেকে করছি। রণদেব বলে ওঠে—তাতে কী হয়েছে! হয়তো পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে, আমার ফোন ট্যাপ করছে। ফোন রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি তো আছি। রণদেব ফোনটা রেখে দেয়। তারপর আবার ধীরে ধীরে ফিরে এসে আঙুলে বরফ ঘষতে থাকে আর ভাবতে থাকে লীনাই না তাকে বিপদে ফেলে। লীনা, ডাঃ সেনের বিধবা

স্ত্রী। ডাঃ সেন নিঃসন্তান, লীনা যুবতী-সুন্দরী, মৃত স্বামীর রেখে যাওয়া প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মালিক। এই মেয়েগুলোর কি একটু ধৈর্য থাকে না। আপনমনেই বলে ওঠে রণদেব।

একটা সেলের মধ্যে নিরীহ মানুষটা শুয়ে আছে। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। ভাবছে—আমি এখন ছুটছি, আমার পা আটকে যাচ্ছে না, একেকটা পদক্ষেপ মনে হচ্ছে না একেকটা যুগ, সুড়ঙ্গের কালো দেওয়াল সরে সরে যাচ্ছে, আমি ছুটে চলেছি আলোর উৎসমুখে। সুড়ঙ্গের আঁধার পেরিয়ে আমি এখন আলোর নীচে, আমার নিজেকে আর দুর্বল মনে হচ্ছে না। আমি ভাসতে ভাসতে গ্রামের মাটিতে নামলাম, একছুটে কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়, ধুলোয় মুখ ঘষছি। আমি আর ধুলোর মাঝে, ধুলোর গন্ধ ছাড়া কিছু নেই। বলগা হরিণটা আমার পায়ের কাছে হাঁপাচ্ছে, শিকারিদের অস্ত্র আর ওর মাঝখানে আমি আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। শিকারিদের অস্ত্র প্রতিহত হচ্ছে, আমার আর নিজেকে অক্ষম বলে মনে হচ্ছে না। আমি বৃষ্টি অতিক্রম করে ছুটছি, বৃষ্টি আর আমাকে ভেজাতে পারছে না। সেই নারী এখন আমার বাহুবন্ধনে, তার উষ্ণতা আমায় উষ্ণ করছে, আমার আর নিজেকে ক্লীব বলে মনে হচ্ছে না, কারণ—সাপটা তো আর নেই, সাপটা আর সাদা আগুন ছুড়তে পারবে না। সর্ষের মধ্যেই যেমন ভূত থাকে, সাদা আগুনের মধ্যেই সাপটার মৃত্যুবাণ সে নিজে পাঠিয়েছিল, সাপটা আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। কিন্তু আদালতের লোকগুলো কী সব বলছিল—গলাকাটা, পেরেকবিদ্ধ...না-না সাপটাকে তো ওভাবে মারিনি আমি, সাপটাতো আগুন, সাদা আগুন ছুড়তে গিয়ে মরবে, মরেওছে। তাহলে কী সব বলছে লোকজন, যাকগে পাগলের কথায় কান দিয়ে কী হবে। সাপটা তো আমাকে আর মনে করিয়ে দেবে না যে আমি দুর্বল, এখন আর কেউ আমাকে দুর্বল ভাববে না। আদালতে সবার চোখ দেখেই আমি বুঝেছি, তাদের কারোর দৃষ্টিতেই আর করুণা নেই, আছে ভয়, সম্ভ্রম আছে।

অনেকদিন বাদে রণদেব, ডাঃ সেনের চেম্বারে এল। এতদিন বন্ধই ছিল। ডাঃ সেনের চেয়ারে এসে বসে রণদেব, এ চেয়ারটার ওপর তার অনেকদিনের লোভ ছিল। শুধু চেয়ারটাই নয়, চেম্বারটার ওপরেও। পার্ক স্ট্রিটের ওপর এতবড় চেম্বার, এখন তো এটা লীনার, মানে তারই, এখন থেকে এটা তার চেম্বারও হবে। ডাঃ সেনের সমস্ত পেশেন্ট তো তারই পেশেন্ট, তাদের সমস্ত কেস হিস্ট্রি তো ডাঃ সেনের সহকারী হিসাবে সে-ই লিখত, সবই তো তার নখদর্পণে।

নেমপ্লেটটা খালি বদলে যাবে, ডাঃ সেনের জায়গায় হবে ডাঃ রণদেব চৌধুরী। সে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে তার পসার জমে উঠেছে, লীনা আর ৫০ লক্ষ টাকার সঙ্গে তার সুখের সংসার। সে ফোন তোলে, ডায়াল করে, ওপাশ থেকে লীনা হেসে ওঠে—কখন আসছ? আসছি গো আসছি—রণদেব বলে। রাজকন্যা তো পেলাম, রাজত্বটা একটু দেখে যাব না? খবরের কাগজটা দেখেছ তো, ৬৩ নম্বরের শাস্তি হল ডাঃ সেনের খুনের জন্যে, কী বলিনি সব ঠিক করে দেব। লীনা বলে,—আহাঃ কী এমন বীরপুরুষ, নিজেও তো ভয়ে ভয়ে ছিলে।

রণদেব কপট রাগ দেখায়—কী আমি ভিতু? আমি তোমার জন্য মরতে-মারতে কিছুতেই ভয় পাই না। মারতে যে ভয় পাই না সে তো দেখেইছ, মরতেও ভয় পাই না সেও দেখিয়ে দেব। লীনা ওপাশ থেকে খিলখিল করে হেসে ওঠে তারপর হঠাৎই বলে,—এই প্লিজ ফোনটা একটু ধরবে, আমি রান্নাটা বসিয়ে এসেছিলাম, গ্যাসটা অফ করে আসি। তোমার জন্যেই রান্না করছিলাম মশাই, প্লিজ একটু হোল্ড করো। রণদেব বলে,—অগত্যা। রণদেব ফোন ধারে থাকে, রান্নাঘরের টুংটাং আওয়াজ পাচ্ছে সে ফোনের ভেতর দিয়ে, এক হাতে ফোন নিয়ে ড্রয়ারটা খোলে, এমনিই খোলে। ডাঃ সেনের অনেক জিনিসপত্র এই ড্রয়ারে থাকে। একটা সুন্দর কাঠের বাক্স দেখতে পায় সে, মনে মনে ভাবে এটা আবার কী, বাক্সটা বার করে খোলে, দেখে সিগারেটের বাক্স, অনেক সিগারেট ওর মধ্যে পাট করে রাখা। ডাঃ সেন তো চেইন স্মোকার ছিলেন, সারাক্ষণ মুখ দিয়ে সাদা ধোঁয়া ছুড়ে চলেছেন। লীনারও ডাঃ সেনকে অপছন্দের এটা একটা কারণ, ড্রাগন যেমন আগুন ছোড়ে ডাঃ সেনও সারাক্ষণ সেভাবেই ধোঁয়া ছুড়তেন। হঠাৎই রণদেবের মনে পড়ে—আরে এই বাক্সটাই ৬৩ নম্বর পেশেন্ট নিয়ে এসেছিল শেষ দিনে ডাঃ সেনকে উপহার দিতে। এরকম বহু পেশেন্টই ডাক্তারের জন্যে নানান জিনিস নিয়ে আসত। বাক্সটা তুলে দেখে ডাঃ সেন একটা সিগারেটও খাননি। রণদেব মনে মনে ভাবে, খাননি না খাওয়ার সুযোগ পাননি? বাক্সটা হাতে নিয়ে তার বেশ মজা লাগে। এই ৬৩ নম্বর, ডাক্তারের খুনের অভিযোগে শাস্তি পেতে চলেছে, আর সেই কিনা এই বাক্সটা ডাক্তারকে উপহার দিয়েছিল। ভাগ্যিস পুলিশ এটা জানে না। রণদেব একটা সিগারেট তোলে, পাশেই রয়েছে লাইটার, রণদেব যে-কোনও দিন সিগারেট খায়নি তা নয়, হোস্টেলে থাকবার সময় সে সিগারেট খেয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে, অবশ্য পরে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এখন তার একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, আর লীনাই বা ফোন ধরছে না কেন? একটা সিগারেট আর লাইটারটা তোলে, সিগারেটটা মুখের কাছে নিয়ে আসে—হ্যালো—লীনার গলা শোনা যায়—সরি, একটু দেরি হয়ে গেল, কী করছিলে এতক্ষণ? রণদেব কপট হতাশা দেখিয়ে বলে,—কী করব, তোমার বিরহে একটা সিগারেট ধরাব বলে ভাবছিলাম।—এ মা সে কী! তুমিও সিগারেট!—লীনা বলে ওঠে, রণদেব বলে,—

না না অ্যাডিকশন নয়, রাজকন্যা, রাজত্বের সঙ্গে কিছু নজরানাও তো আছে, আই মিন ডাক্তারবাবুর জন্যে গিফট। রাজকন্যাকে বা রানিকেও চেখে দেখেছি, রাজত্বও দেখছিলাম, একটু নজরানা চেখে দেখব ভাবছিলাম। দেখব ভাবছিলাম কোনটার টেস্ট কত ভালো। লীনা ওপাশ থেকে হেসে বলে,—বেশ তো কোনটা বেশি ভালো দেখো। রণদেব সিগারেট ধরায়, একটা টান দিয়ে কেমন বিস্বাদ লাগে। মুখ কুঁচকে, সামনে ধরা ফোনে বলে—কীরকম তীব্র, কড়া—কফি কফি গন্ধ। কেমন একটা যেন—সিগারেটের মতো নয়। ওপাশে লীনা হেসেই চলেছে—না না সিগারেটের মতো নয় বললে তো হবে না, কোনটা ভালো বলতে হবে—রানি-রাজকন্যা-রাজত্ব না নজরানা? রণদেবের কানে তখন কিছুই ঢুকছে না, সিগারেটের ফিল্টারটাতে কেমন একটা স্বাদ। সে অনেক পড়েছে এই স্বাদটার নাম তার ডাক্তারি পড়ার সময়, কিন্তু এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না। ওপাশ থেকে লীনা বলে,—কী গো সিগারেটের স্বাদ কেমন লাগছে, অন্য কোনও রাজকন্যার মতো নয় তো? চেয়ারশুদ্ধ পড়ে যেতে যেতে রণদেবের মনে পড়ে গেল স্বাদটা কীসের মতো, কিন্তু লীনাকে বলতে পারল না,—বলা হল না। ওটা পটাশিয়াম সায়নাইডের মতো।

ঝুলে থাকা ফোনটার মধ্যে দিয়ে লীনার উদবিগ্ন গলা শোনা যায়—হ্যালো হ্যালো রণ, কী হয়েছে? শুনতে পাচ্ছ?...

অভিযোজন

মশারির মধ্যে একটা মশা ঢুকে পড়েছিল গত রাতে। সাধের ঘুমের দফারফা। সাধারণত জোরালো ঘুমটা ভোরের দিকেই আসে—কিন্তু হতচ্ছাড়া মশাটা...দিল।

তবু ঘাপটি মেরে শুয়েছিল টোটোন, যদি হারানো ঘুমটা কোনওক্রমে ফিরে আসে। বাধ সাধল মা-এর গলা—আর কত ঘুমাইবি,...ওঠ ছ্যামরা, মা-এর গলা তীক্ষ্ণ হতে থাকে...র‍্যাশন তোলতে হইব, সারাদিন আল্লার ষাঁড় হইয়া ঘোরলেই হইব? সংসারের একটা কুটা নাড়াইতেও হাজার নছল্লা।

টোটোনের মনে পড়ে গেল আজ মঙ্গলবার, র‍্যাশন তোলার দিন। এ কাজটা তাকেই করতে হয়, আটটার মধ্যে গিয়ে লাইন দিয়ে, র‍্যাশন তুলে সাড়ে দশটায় কলেজ যেতে হবে। "সুখের কাঁথায় আগুন"...গজ গজ করতে করতে টোটোন বিছানায় উঠে বসে, উঁকি দিয়ে দেখে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ, সেটা এখন দাদার শাসনাধীনে। মশারির দড়ি খুলে। ভাঁজ করে বিছানা তুলে, আবার উঁকি দিয়ে দেখল—এবার বাথরুম দাদার শাসনমুক্ত। চট করে বাথরুমে সেঁধিয়ে গেল টোটোন, একেবারে স্নান করেই বেরোল।

ঘরে এসে দেখল টেবিলে কাপে চা রাখা, মুখ দিয়ে বুঝল ওটা আর চা নেই—জল। রান্নাঘর থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর—নবাবপুত্তুর অখন গাত্রোত্থান করো, র‍্যাশনটা আন।

গম্ভীর মুখে থলি, কার্ড আর টাকা নিয়ে টোটোন পথে নামে, আড় চোখে দেখে দাদার ঘরের দরজা ভেজানো অর্থাৎ বউদি আর সোনাই এখনও ঘুমোচ্ছে।

এটা একটা হাউজিং এস্টেট। টোটোনের বাবা সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পরে দাদা সে চাকরি পেয়েছে—বৃদ্ধা মা, টোটোন, দাদা বউদি ও তাদের মেয়ে সোনাই—এই তাদের সংসার। টোটোন থার্ড ইয়ারে পড়ে।

ফ্ল্যাটে দুটো ঘর, একটা দাদা বউদি কবজা করেছে, একটা টোটোন আর তার মা, তবে টোটোন বুঝতে পারছে বেশি দিন সে এই ঘর দখল করে থাকতে পারবে না। সোনাই বড় হচ্ছে, দাদা বউদি ওকে অন্য ঘরে পাচার করার চেষ্টা

করছে কারণ ওদের দাম্পত্য সুখে ভাটা পড়ছে। বউদি টোটোনকে সহ্য করতে পারে না। দাদা মুখে কিছু বলে না কিন্তু বোঝা যায় সে বউদিরই অনুগামী। মা নির্দল পার্টির মতো ভারী দিকেই জোট বেঁধেছে, টোটোন একা, হাতে তার বেশিদিন সময় নেই।

টোটোন রাস্তায় বেরিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে দেখে বাবাই জানলায় বসে পড়াশুনো করছে। টোটোনকে দেখে হাসে, টোটোন মাথা নাড়ে। বাবাইকে টোটোনের বেশ ভালো লাগে, ছেলেটা টোটোনের ন্যাওটা। টোটোনের কেন জানি না ছেলেটার অনেক কিছুই ভালো লাগে, কেমন আপন আপন মনে হয়। হঠাৎ কানে আসে প্রচণ্ড চিৎকার। টোটোন প্রথমে চমকে ওঠে তারপর চিৎকারের উৎসটা দেখে নির্বিকার হয়ে যায়। ঝণ্টুদা, ঝণ্টুদা খেপেছে। কাপ, ডিশ ভাঙছে। ঝণ্টুদার মা, বউদি তাকে সামলাতে ব্যস্ত। ঝণ্টুদা-রা টোটোনদের মতোই একতলায় থাকে। যেতে আসতে টোটোন জানলা দিয়ে দেখে—খাটের ওপর রক্ত-চক্ষু করে খালি গায়ে ঝণ্টুদা বসে আছে। ঝণ্টুদার মা আর বউদি নানাভাবে তাকে কাকুতি-মিনতি করছে ভাঙাভাঙি বন্ধ করার জন্য, এ প্রায় রোজকার গল্প। ঝণ্টুদা আসলে বদ্ধ পাগল। এমনিতে শান্তই থাকে, মাঝে মাঝে একটু ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, উপদ্রবের ঝড় অবশ্য জড় পদার্থের ওপর দিয়েই যায়—কাপ, ডিশ, থালা, বাসন ইত্যাদি।

ঝণ্টুদা নাকি আগে বেশ সুস্থই ছিল। এখন ঝণ্টুদার প্রায় ৪৫ বছর বয়েস। বড়রা অনেকেই বলে,—ঝণ্টুদা নাকি বেশ ভালো ক্রিকেট খেলত। তবে টোটোনরা ছোট থেকেই ঝণ্টুদাকে এরকমই দেখছে।

বড় রাস্তায় পড়ে টোটোন প্রফুল্লদার দোকানে গিয়ে বিড়ি কেনে। তারপর র‍্যাশন দোকানে লাইন দেয়। প্রচণ্ড রোদ, তার সামনে প্রায় ১৫ জনের লাইন। বিড়ি ধরায়, সামনে দিয়ে গৌতম জামা জুতো পরে গম্ভীর মুখে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, গৌতম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। টোটোনের বন্ধু, একই রকে বসে আড্ডা দেয়, কিন্তু টোটোন দেখেছে যখনই ও জামা-জুতো পরে সেজেগুজে বেরোয় তখন আর টোটোনের সঙ্গে কথা বলে না, তাকায়ও না। ওকে কেমন দুঃস্থ দুঃস্থ মনে করে। টোটোন ভাবে, হয়তো প্র্যাকটিস করছে—ভবিষ্যতে তো এইভাবেই টোটোনদের মাড়িয়ে যাবে যেভাবে জুতো দিয়ে পাড়াটাকে মাড়িয়ে চলে যায়।

অবশেষে কলেজ—

বাস থেকে নামতেই বেশ বেগ পেতে হল এত ভিড়। কলেজে গেটে পৌঁছোতেই প্রবালের গালাগালির মুখোমুখি—এই যে গাণ্ডু, কাল কোথায় ছিলি? এলি না কেন?

বাড়িতে একটু প্রবলেম ছিল।

—হ্যাঁরে শালা, পয়সা খরচ করার ব্যাপার হলেই পেছন ফাটে, না? প্রবাল হেসে বলে, টোটোনও ম্লান হাসে। আসলে গতকাল বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল, যে যার পয়সায়। টোটোনের প্রবলেমটা এইখানেই। হাতখরচার যে পয়সাটা তাকে মায়ের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় তার অঙ্কটা শুনলে বন্ধুরা হার্টফেল করবে। কমন রুমে যায়। একদল ছেলে টেবিল টেনিস খেলছে, একদল ক্যারাম। টোটোনদের দেখে একদল জুনিয়ার ছেলে যারা বসে গুলতানি মারছিল, উঠে দাঁড়ায়। নিজেদের মধ্যে বলে,—লে কেটে পড় নইলে, মার্কস-লেনিনের পিত্তি গিলিয়ে ছাড়বে। তারা সত্যিই কেটে পড়ে। টোটোনরা কমনরুমে বসে। এক এক করে বাকিরা আসতে শুরু করে—অনুপ, হিমাংশু, রবি...।

প্রথমে রাজনৈতিক আলোচনা দিয়ে শুরু হলেও পরে কলেজের কোন মেয়ের শরীরের কোন অংশটা উল্লেখযোগ্য, সে নিয়েই সবাই মগ্ন হয়ে গেল। টোটোন উঠে দাঁড়ায়, বলে,—যাই ক্লাসটা করি।

সবাই আওয়াজ দেয়—বিদ্যাসাগরের ছেলে রামানন্দসাগর।

সন্ধেটা কীরকম ঝুপ করে নামে শীতকালে। কালো অন্ধকার কেমন গেরিলাদের মতো ঘিরে ধরে ধোঁয়া আর ধুলোমাখা শহরটাকে, বুঝতেই পারা যায় না। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো ল্যাম্পপোস্টের গায়ের বাল্‌বগুলো ঝুঁকে পড়ে তাকায়। রাস্তা ফাঁকা হতে থাকে। টোটোন পাড়ায় ঢোকে, ভাবে বাড়ি গিয়ে তো সেই একই মায়ের গঞ্জনা—রকেই বসে একটা বিড়ি ধরায়। কিছুক্ষণ বাদে চন্দন এসে পাশে বসে। প্রশ্ন করে,—কলেজ থেকে? টোটোন জিগ্যেস করে,—তুই মাঠে যাসনি? নারে, পায়ে একটা চোট লেগেছে, এখন দুদিন বন্ধ—চন্দন বলে। চন্দন ফুটবল খেলে, স্বপ্ন দেখে ফার্স্ট ডিভিশনে বড় ক্লাবে খেলবে।

তারপর ওরা দুজন চুপ করে মুখোমুখি বসে থাকে।

হঠাৎ নামা সন্ধ্যার গাম্ভীর্য বোধহয় মানুষকে ভাষাহীন হয়ে থাকতে নির্দেশ দেয়।

রকের ওপর ওরা বসে থাকে কথা ছাড়াই। এমন সময় একটা ফ্যাসফ্যাসে ভাঙা গলা ওদের চমকে দেয়—একটা বিড়ি হবে?

মাথায় কাঁচা পাকা চুল, একটা লুঙ্গি আর আধ ময়লা একটা গেঞ্জি পরে ঝণ্টুদা। কালো কালো দাঁত বের করে, ওদের সামনে। গায়ে একটা বোঁটকা গন্ধ, অন্ধকারে চোখ দুটোয় ল্যাম্পপোস্টের ধূসর আলো চকচক করছে মনে হল। টোটোন অস্বস্তির মধ্যেই একটা বিড়ি এগিয়ে দেয়।

—দেশলাই হবে?

টোটোন দেশলাই দেয়। ঝণ্টুদা বিড়ি ধরিয়ে দেশলাই ফেরত দেয়। তারপর বিড়িতে শব্দ করে একটা জোর টান মেরে বিড়িসুদ্ধ হাতটা আকাশের দিকে তুলে দেয়, যেন আকাশের মেঘের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাত নামিয়ে টোটোনদের

পাশে বসে পড়ল গ্যাঁট হয়ে। এটাই ঝণ্টুদার স্টাইল। ছোটবেলা থেকে টোটোনরা দেখে আসছে এ ঘটনাই। এইভাবে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ে, কাউকে ডিসটার্ব করে না। ছোটবেলায় টোটোন দেখেছে ঝণ্টুদা টোটোনদের সিনিয়ারদের সঙ্গেও একই ব্যবহার করত।

চন্দন বলে—চল ওঠ, এই গন্ধ গোকুলটার পাশে বসে থাকলে, আমাদের গায়েও একই রকম গন্ধ হয়ে যাবে।

ওরা উঠে অন্য দিকে হাঁটতে থাকে।

ডালের বাটিটা ঠিক মতো কবজা করতে পারছে না দাদা, রুটিটা ডোবাতে গেলেই একদিক হেলে যাচ্ছে।

বারান্দায় বসে টোটোনও খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘরের দিকে চোখ বোলাচ্ছে।

—সামনের মাস থেকে নিজের পড়ার খরচ নিজে চালাবি, আধ দামড়া হয়ে পরের ঘাড়ে বোঝা হতে লজ্জা করে না? দেখো মা, অনেকদিন হল—এবার একটু বোঝাও। আমি এ সব প্যারাসাইটকে বরদাস্ত করতে পারব না, after all I am a self made man। টোটোন মনে মনে ভাবে—শালা, বাবার চাকরিটা তো করিস, বাবার আকস্মিক মৃত্যুর ইংরেজি যদি self হয় তাহলে তুই নিশ্চয়ই self made man.

ছুটির দিন, পাড়ায় ভলিবল খেলা হচ্ছে, একদল খেলছে আর-একদল রকে বসে উৎসাহ দিচ্ছে। টোটোনও আছে তবে উৎসাহদানকারীদের দলে। অলস সকাল, কোনও টেনশন নেই, সবাই বেসরকারি ষাঁড়ের মতো অলসতার জাবর কাটছে। এমন সময় চিৎকার...ধর...ধর...পালাল...পালাল। তিরবেগে ঝণ্টুদা ছুটছে। ঝণ্টুদার মা, বউদি, দাদা তাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ভলিবল খেলা ছেড়ে তখন সবাই 'ঝণ্টুদা ধরা'র চেষ্টায় ব্রতী হল। চন্দন আর কালু স্পোর্টসম্যান সুতরাং ওরাই শেষ পর্যন্ত ঝণ্টুদাকে অনেক ছুটে পাকড়াও করে, ঝণ্টুদাকে বগলদাবা করে তার মা, বউদির কাছে হ্যান্ডওভার করল, ঝণ্টুদা তখনও ফুঁসছে।

একজন প্রশ্ন করল,—কী ব্যাপার হল আজ আবার?

ঝণ্টুদার মা বলল,—কী বলব বাবা, মুড়ি খেতে চাইছে না, সব ছুড়ে ফেলে...সবই আমার অদৃষ্ট...। ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করলেন।

ঝণ্টুদারা বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হওয়ার পরই আবার ভলিবল খেলা জমে উঠেছে এমন সময়ে টোটোনকে তার দাদার মেয়ে সোনাই এসে ডাকে—ছোটকা, তোমায় দিদা ডাকছে।

টোটোন ওঠে, মনে পড়ে আজ মা-কে মামাবাড়িতে দিয়ে আসতে হবে।

মামাবাড়ি যেতে তার একদম ইচ্ছে করে না। মামা মামির বড় বড় চাল—কী রে কিছু কর? পাতি গ্র্যাজুয়েশন করে কী হবে? এখন স্পেশালাইজেশন এর যুগ, এই তো সদা (মামার ছেলে) কম্পিউটার কোর্স করে এখন ৮০০০ কামায়...।

টোটোন জানে এবারেও এইসব কথাবার্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কিন্তু কিছু করার নেই। বাড়ির দিকে যেতে যেতে দেখতে পায়—ঝণ্টুদা জানলায় বসে মন দিয়ে লুচি খাচ্ছে, পাগলামির ঝড় থেমেছে।

শীতকালেরপুরিটা খুব অদ্ভুত। ভাত খাওয়া সেরে, চাদর গায়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসাটা আরও অদ্ভুত আনন্দের। মোটামুটি টোটোন সহ আরও চার-পাঁচ জন রকে বসে পিঠ সেঁকছে। দিলু বলে,—আমাদের কী হবে মাইরি, ভালো করে ইংরেজি বলতে পারি না, পাতি বেঙ্গলি মিডিয়াম।

আর শালা নেতাগুলোকে দেখ—বানচোৎদের ছেলেমেয়েরা—কনভেন্টেই পড়ে।

মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ মানে আমরা জনগণ দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়েই থাকব চিরদিন আর ওদের ছেলেমেয়েরাই চিকেন মাটন প্যাঁদাবে।

গৌতম বলে,—দূর শালা, ছাড় তো। তোদের শালা সমস্যা ছাড়া কোনও কথাই নেই...।

দিলু বলে,—তোমার আর ক গান্ডু—এরপর ইঞ্জিনিয়ার হবে তারপর এখান থেকে ধাঁ।

বিশু বলে,—আপনা হাত জগন্নাথ, দরকার হলে রিকশা চালাব, বিড়ি বাঁধব।

বাকিরা সবাই হাসে। হ্যাঁরে শালা, ক্লাস এইটও তো পাশ করতে পারলি না, বিড়ি না বেঁধে যাবি কোথায়?

বিশু বলে,—শোন দু-শ্রেণির লোকই বাঁচে, এক যারা উঁচুতে থাকে আর যারা নীচুতে থাকে—মাঝে থাকে যারা, ঘটি হারায় তারা। সবাই হাসতে থাকে টোটোন মনে মনে ভাবে সত্যিই তো সেও তো মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে। তার পক্ষে তো বিশুর মতো বিড়ি বাঁধা সম্ভব নয়, আবার গৌতমের মতো ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও তো দূরের কথা।

সত্যি টোটোনের হাতে তো আর সময় নেই। দাদা পড়ার খরচ আর দিচ্ছে না।

টোটোন এখন ঘরছাড়া। তার জায়গায় সোনাই ঢুকে পড়েছে। তার ঘরটা এখন সোনাই আর মা-এর দখলে। এখন সে ডাইনিং প্লেসটায় শোয়, সেখান থেকে বাইরের দরজার দূরত্ব মাত্র পাঁচ ফুট। যে কোনওদিন তার জায়গা ছ'ফুট দূরে হয়ে

যেতে পারে। এই শীতকালেও টোটোন ঘামতে থাকে। একটা সময় সবাই আড্ডা ছেড়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। টোটোন বসে থাকে। সূর্যের তেজ আর নেই, বিকেল হয়ে গেছে, বাচ্চারা বেরিয়ে পড়েছে খেলার জন্য।

—ও টোটোনদা একটা গল্প বলবে? বাবাই এসে টোটোনের পাশে বসে, বাবাই এখন ক্লাস এইটে পড়ে। মুখটা খুব সুন্দর, দেবদূতের মতো, হাসলে গালে টোল পড়ে। বাবাই-এর মা নেই—বাবা আর একটা বিয়ে করেছে। এ পক্ষের একটা মেয়েও হয়েছে। বাবাইকে টোটনের কেমন যেন আপন আপন মনে হয়।

টোটোন বলে,—কীসের গল্প শুনবি? বাবাই বলে,—ভূতের গল্প।

টোটোন প্রায়ই বাবাইকে গল্প বলে বানিয়ে বানিয়ে। শুরুটা ঠিকই থাকে—শেষের দিকে বাবাই-এর বাড়ি চলে যাওয়ার সময় এসে যায়, তাই কোনওদিন আর গল্পের শেষটা বলা হয় না। টোটোন ভাবে এটা বোধহয় একদিক থেকে ভালোই কারণ তার গল্পের শেষগুলো সে নিজেই ভালো করে ঠিক করে উঠতে পারে না।

টোটোন একটা গল্প শুরু করে...

একসময় সন্ধে নামে, বাবাই বাড়ি চলে লাফাতে লাফাতে। টোটোনকে এবার উঠতে হবে। একটা টিউশনি পেয়েছে সে, ছাত্রীর বাবা খুব হিসেবি, দুদিন কামাই হলে মাইনে কাটে।

আসলে জীবনে সবাই হিসেবি—কেউ জেনে, কেউ না জেনে। কিন্তু টোটোন জীবনের হিসেবটা এখনও মেলাতে পারছে না, তার হাতে বেশি সময় নেই...।

—একটা বিড়ি হবে?

টোটোন চমকে ওঠে—ও ঝণ্টুদা। টোটোন আশ্বস্ত হয়। টোটোন একটা বিড়ি দেয়। ঝণ্টুদা বিড়ি ধরিয়ে বসে পড়ে পাশে। টোটোন ধীরে ধীরে উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে।

বহ্নিকে দেখলেই টোটোনের বুকে কেমন একটা মোচড় দেয়, পেটের ভেতর গুড়গুড় করে। বহ্নি টোটোনের সঙ্গে হেসে কথা বললে টোটোনের হতাশা নিমেষে গায়েব। বহ্নিকে বাসস্ট্যান্ডে এগিয়ে দিতে গিয়ে টোটোনের খালি মনে হয়—এই পথ যদি না শেষ হয়। বহ্নি ওদের কলেজেই পড়ে, এক বছরের জুনিয়ার।

সেদিনও কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় টোটোন বহ্নিকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল, বহ্নি বলল,—তুমি কি এবার পরীক্ষা দেবে না? টোটোন বলল,—দেখি। বহ্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—তুমি যেন কেমন। কোনও বিষয়ে কি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারো না?

টোটোন ভাবে যার জীবনটাই এত অনিশ্চিত, তার পক্ষে নিশ্চিত কথা বলাটা কি সম্ভব? মুখে কিছু বলে না টোটোন। বহ্নি হয়তো কোনও উত্তর আশা করছিল। টোটোনের দিক থেকে কোনও উত্তর না আসায় সে মনে মনে বিরক্ত হয়।

ওরা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছায়।

বহ্নি একটি বাসে ওঠে। টোটোন দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে। বহ্নি জানে না, টোটোনকে এখন হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে বিড়ির পয়সা বাঁচাতে।

সরস্বতী পুজো—পাড়ায় প্যান্ডেলের সামনে চেয়ার পেতে আড্ডা চলছে।

এই দিনটায় সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে শাড়ি পরে। বোঝা যায় না কার কত বয়েস। এরকম প্রচুর ভুল হয়েছে—উৎসাহী হয়ে আলাপ করে দেখা গেছে সে তখনও স্কুলে পড়ে। ছোটখাটো খুনসুটি এর ওর পেছনে লাগা চলছিল হঠাৎ টোটোনের বুকে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল,—বহ্নি, সাদা শাড়ি পরে কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে তাদের পাড়ায় ঢুকছে। টোটোনকে দেখে অবাক—ওমা তুমি এখানে থাকো?...আমার মাসি তো ওই পাশের ব্লকটায় থাকে।

টোটোনের বন্ধুরা কথা থামিয়ে বহ্নিকে দেখছে। টোটোন কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবেই বলে,—বোসো না। একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়।

তারপর বলে,—এরা আমার বন্ধু, আর ওর নাম বহ্নি, আমার কলেজের বন্ধু। এক এক করে সবার সঙ্গে আলাপ হয়, বহ্নি ওর সঙ্গে থাকা মেয়েদের বলে,—তোরা যা, আমি একটু পরে আসছি।

তারপর সবাই মিলে আড্ডা শুরু হল। টোটোন দেখল বহ্নি বেশ কথা বলতে পারে। সবার সঙ্গে বেশ জমে গেছে। বহ্নি বেশ সুন্দর করে হাসছে। সবার চোখে সে হাসির ছায়া পড়ছে...।

গৌতম বেশ হাত-পা নেড়ে কী সব বলছে, টোটোনের কানে কিছুই ঢুকছে না, সে শুধু আশ্চর্য হয়ে বহ্নিক দেখেই যাচ্ছে। বহ্নি বেশ উচ্ছল। টোটোনের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন তো এতো প্রাণবন্ত মনে হয় না? টোটোনের মনে হয়—আসলে টোটোনের আয়নায় বহ্নি নিজেকে যখন দেখে তখন হয়তো আপনা আপনিই সে বিমর্ষ হয়ে যায়। টোটোন যে একটা ধূসর কাচ ছাড়া নিজেকে আয়না ভাবতেই পারে না।

একটা সময় বহ্নি বলে যাই মাসির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

টোটোন বলে,—আমি আছি, তুমি ঘুরে এসো। বহ্নি চলে যায়।

আবার ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরে, সবাইকে হাত নাড়ে। টোটোন বহ্নিকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোতে যায়, গৌতম বলে,—চলো আমিও যাচ্ছি। বহ্নি বাসে উঠে হাত নাড়ে। টোটোনের কেমন যেন মনে হল—বহ্নি, হাতটা বোধ হয় ওকে নয়, গৌতমকে দেখেই নাড়ল।

*

টোটোন কখনও সমুদ্র দেখেনি কিন্তু বালি দেখেছে। দেখেছে বালি হাতে মুঠো করে ধরা যায় না সহজে, একটু একটু করে ঠিক আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে যায়। টোটোনের কাছে জীবনটা বালির মতো মনে হচ্ছে এখন, যত জোরে ধরতে যাচ্ছে ফসকে যাচ্ছে—মুঠো খুললেই ফাঁকা। শেষ-মেস পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি তার। সব বন্ধুরা মোটামুটি এসটাব্লিশড।

সে এখনও বাজার করে, র‍্যাশন তোলে, সবার ফাইফরমাশ খাটে।

গৌতম আর বহ্নির সামনেই বিয়ে।

এখনও মায়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার তার ঘুম ভাঙায়। সে বোঝে, তার প্রতি মা যত বিরক্তি দেখাতে পারে মায়ের পয়েন্ট তত বাড়ে দাদা বউদির কাছে। মায়ের নিরাপত্তা বাড়ে। বউদির বোধহয় আরেকটা বাচ্চা হতে চলেছে। এবার?

অন্ধকার রকে বসে টোটোন ভেবেই চলেছে। কোথায় যাবে? চাকরি বাকরির চান্স তো নেই। বিশু এখন রাস্তায় মুরগি কেটে বিক্রি করে। আমদানি মন্দ নয়। টোটোন তো তাও পারবে না—তার যে রক্ত দেখলেই মাথা ঘোরে...।

টোটোনের মাথা গরম হয়ে যায়। মনে হয় চিৎকার করে বলে,—শালা সবাই টিকে থাকতে পরে, বিশ্ব সংসারে সবার কোনও না কোনও ভাবে বাঁচার রাস্তা আছে, খালি আমারই নেই? হে ভগবান—ঠিক থাকার একটা রাস্তা দেখাও, একটা সুযোগ দাও। আমি দুর্বল এটাই কি আমার অপরাধ? আমি বিলু হতে পারব না যে পাড়ার 'দাদা'দের দলে নাম লেখাব। আমি পার্টির ক্যাডার হতে পারব না—যারা মূর্খের মতো, নির্বোধের মতো কতগুলো চোরের নির্দেশ মুখ বুজে পালন করবে। পৃথিবীতে সব মানুষই যদি সবল হবে তাহলে সবল শব্দটাই তো থাকবে না—কোনও না কোনও মানুষ কারুর না কারুর তুলনায় দুর্বল তো হবেই। অন্য কেউ তার তুলনায় দুর্বল, অন্য কেউ তার তুলনায়...। এইভাবে দেখলে শেষ দুর্বল লোকটার তা হলে বাঁচার অধিকারই নেই। সেই লোকটা মরে গেলে তার আগের লোকটার পালা। সে না থাকলে তার আগের লোকটা...এও কি সম্ভব? এত লোক তো বেঁচে আছে—কিন্তু কী করে?

—একটা বিড়ি হবে?

প্রথমে চমকে ওঠে টোটোন তারপর আশ্বস্ত হয়—ও ঝন্টুদা। ঝন্টুদা বিড়ি ধরিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে টোটোনের পাশে। টোটোন চুপ করে ভেবে যায়...। একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। আশেপাশের গাছগুলো ভীষণ দুলছে। ঝন্টুদা নিজের মনে বিড় বিড় করে চলেছে, টোটোনের ভাবনাগুলো লাট খাচ্ছে ঘুড়ির মতো।

লাইটপোস্টের বালবগুলো হাওয়ায় দুলছে তাতে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা দোলনায় দুলছে। পাড়া ফাঁকা হয়ে গেছে ঝড়ের আশঙ্কায়। দুধের ডিপোর ভাঙা

টিনের চালটার মধ্যে হাওয়া ঢুকে একটা অদ্ভুত শব্দে সংকেত দিচ্ছে যেন।

হঠাৎ ঝণ্টুদা জিগ্যেস করল,—তোর কী হয়েছে? সাধারণত ঝণ্টুদা কারুর সঙ্গে কথা বলে না। টোটোন অন্যমনস্ক হয় বলে,—তুমি বুঝবে না ঝণ্টুদা...।

হাওয়া বেড়েই চলেছে, একটু শীত শীত করছে। রাত বাড়ছে। অদ্ভুত একটা ছায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে, চেনা জিনিসগুলোকেও কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।

আধো অন্ধকারে ঝণ্টুদার ফ্যাসফ্যাসে গলা শোনা যায়—একটা কাজ করতে পারবি? তিনদিন ঘুমোবি না, চেষ্টা করবি চারদিন না ঘুমোতে। ঘুম পেলেও ঘুমোবি না। চানও করবি না, কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলবি না, এই চারদিনে। পাঁচ দিনের দিন সকাল থেকে বিছানার ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবি, একবারও নামবি না, ছ'দিনের দিন বিছানার মধ্যে পেচ্ছাপ করে দিবি। সাত দিনের দিন হাতের কাছে যা পাবি সব আছাড় মেরে ভেঙে ফেলবি। আট দিনের দিন দেখবি তোর কোনও সমস্যাই থাকবে না—তোকে আর কেউ কোনও কথাই বলবে না...। টোটোন চমকে উঠে ঝণ্টুদার দিকে তাকায়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, বৃষ্টি আসছে। বিদ্যুতের আলোয় টোটোন দেখল ঝণ্টুদা কালো কালো দাঁত বের করে হাসছে—ঝণ্টুদার চোখ দুটো চকচক করছে...।

শীতকালে এভাবেই হঠাৎ সন্ধ্যা নামে, আলো থাকতে বোঝা যায় না। কলেজ থেকে ফেরার পথে টিউশনি করিয়ে এবার পাড়ায় ঢুকছে বাবাই। বাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করে না, একই গঞ্জনা চলছে দিনের পর দিন, প্রায় গা সওয়া হয়ে গেছে। বাবাই অন্ধকার রকে এসে বসে, একটা বিড়ি ধরায়। এখন সে অনেক বড়, এখন আর তার ভূতের গল্প ভালো লাগে না—নিজেকেই ভূত মনে হয়। যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই, অন্তত বাবাই দেখতে পায় না।

অন্ধকার রকের দিকে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আধময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

বাবাই নিজের মনে ভেবেই চলেছে...এবার? বাবা তাকে ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছে। সামনের মাস থেকে আর পড়ার খরচ দিতে পারবে না...বাবার এ পক্ষের মেয়ের পেছনে নাকি অনেক খরচ হচ্ছে। বাবাই ভাবে, তার হাতে আর বেশি সময় নেই কিন্তু কোথায় যাবে? কী করবে...ভীষণ কনফিউসড...

—একটা বিড়ি হবে?

অন্ধকারে ফ্যাসফ্যাসে একটা গলা শোনা যায়—বাবাই চমকে ওঠে প্রথমে তারপর আশ্বস্ত হয়—ও টোটোনদা। বাবাই একটা বিড়ি এগিয়ে দেয় তার টোটোনদার দিকে।

যমের অরুচি

ঋষিকেশের মতো একগুঁয়ে মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সততা যে কোনও মানুষকে এতটা গ্রাস করতে পারে, তা ওকে না দেখলে বুঝতাম না। মনে হত, 'সততা তো নয়, যেন আমাশা!' যে কোনও বঙ্গসন্তানের জীবনকে আমৃত্যু যা আচ্ছন্ন করে রাখে, যেমন চোরা পাইলস, বা না-পাকা ছানি যা অপারেশন করা যায় না, থেকেই যায়, অনেকটা ওইরকম।

সততা বস্তুটা গাড়ির মতো। কিনতে বা অর্জন করতে যান, প্রচুর দাম দিতে হবে; প্রয়োজনে বেচতে যান, দাম পাবেন কিন্তু নামমাত্র। সততা শব্দটা বইয়ের পাতায় বা অন্য কাউকে ধারণ করতে দেখলে বেশ লাগে; কিন্তু নিজে সততার বেঢপ জামা পরে পথ চলতে কেউই চায় না! হতভাগা ঋষিকেশ শুধু সেই জামা পরে ছিল না, জামায় কোনও দাগ লাগলে প্রতিবাদে প্রায় নিজেরই নাক কাটত। হেঁয়ালির মতো ঠেকছে, তাই তো?

বিষয়টা আর কিছুই নয়, আসলে যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন থেকেই আমি ওকে চিনি। আমারই ক্লাসমেট ছিল। পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিল না, স্কুলে বিখ্যাত ছিল ওর একরোখামি, জেদ ও রাগের জন্য।

বিষয়টা শুরু হয়েছিল এরকম! বড়লোকের ছেলে অমিত টিফিনে ফ্লুরিস-এর প্যাটিস এনেছিল। টিফিনের সময় অমিত ওটা গলাধঃকরণ করছিল, আমরা জুলজুল করে দেখছিলাম। তখন ঋষি সবাইকে অবাক করে সরাসরি অমিতের কাছে গিয়ে প্যাটিসের একটু ভাগ চেয়ে বসে। যথারীতি উত্তর আসে 'না'।

ঋষিকেশ ফিরে আসে, তারপর গুম হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে বিড়বিড় করে বলেছিল, 'আমরা কেন গরিব?'

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে দেওয়ালে সজোরে একটা ঘুসি মারে! যেন দেওয়ালটা দেওয়াল নয়; ওর দারিদ্র্য, যাকে ও মুষ্টিযোগে দূরে হটাতে চেষ্টা করল। কিন্তু দারিদ্র্য দূরে হটল না। মাঝখান থেকে ওর হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেল।

আমরা পরে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোর চাইবার কী দরকার ছিল?'

ও বলেছিল, 'বা রে! আমারও তো খেতে ইচ্ছে করছিল। সেই ইচ্ছেটা লুকিয়ে রাখাটাও তো একটা পাপ!'

সংক্ষেপে বললে এই ছিল ঋষিকেশের শুরু।

এরপর দিন কেটেছে সিলেবাসের পাতায়, রোয়া ওঠা ঘেসো জমির ধুলোয়, টিচারদের ক্লাসে ডাস্টার পেটার আওয়াজে। ঋষিকেশের সততা আবার মাথা চাড়া দিল ক্লাস নাইনে। আমাদের ক্লাসের স্বরূপ দাসের অনেকদিনের মাইনে বাকি ছিল। স্বরূপের মা অনেক কষ্টে ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছিলেন।

কিন্তু স্কুল তো আর দাতব্য চিকিৎসালয় নয়! 'তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে।' স্কুলের হেডস্যার স্বরূপকে বলেছিলেন এই কথা। এরপর স্বরূপ স্কুল ছেড়ে দেয়।

আমাদের অনেক খারাপ লাগা ভেসে গেল স্কুল ছুটির পর ফেরার রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে আসন্ন হিন্দি ছবির পোস্টারে।

কিন্তু, সবই তো আর ভেসে যায় না, যেমন নদী, ভাসতে ভাসতেও একেবারে ভেসে যায় না! তেমনই আমাদের ঋষিকেশও ভেসে গেল না। তিনদিন গুম হয়ে বসে রইল। চতুর্থ দিন একছুটে স্কুলের ছাতে উঠে গেল। আমরা বিস্ফারিত চোখে নীচে দাঁড়িয়ে, শিক্ষকেরা হতবাক!

ঋষিকেশ ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'এ আমার প্রতিবাদ! স্বরূপের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদে।'

হেডস্যারের গলা শুকিয়ে কাঠ। এই প্রতিবাদের মাশুল দিতে হবে তাঁকেই?

কিন্তু না, মাশুল দিতে হল গুপিদাকে। গুপিদা আমাদের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। স্কুলের সামনের রোয়াকটার থামটা ভেঙে গেছিল বলে সারাবার জন্য বালি আর সিমেন্ট জমা করা হয়েছিল। মিস্তিরিরা যে যার কাজ করছিল, আর তার তদারক করছিল গুপিদা। পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল বালি। পাশে রাখা সিমেন্টের বস্তা।

গুপিদা বালির পাহাড়ে উঠে একটা লাঠি দিয়ে বালির গভীরতা মেপে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছিল, কন্ট্রাক্টর ঠকিয়েছে কিনা!

এমন সময় উল্কার মতো ঋষিকেশ পতন! অর্ধেক বালিতে আর অর্ধেক গুপিদার ঘাড়ে। গুপিদার কাঁধের দুটো হাড় ভেঙে গেল। আজও গুপিদা গলায় মোটা বকলসের মতো কী একটা পরে ঘুরে বেড়ায়। যেটাকে নেক গার্ড বলা হয়।

সেদিন ঋষিকেশ কিন্তু অক্ষত ছিল। এরপর একমাস ঋষিকে ক্লাসের বাইরে পুরো এক পিরিয়ড কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল হেডস্যারের হুকুমে।

আমরা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পাগলামির মানেটা কী?'

ও বলেছিল, 'প্রতিবাদের এর চেয়ে সহজ উপায় আর আমার জানা নেই।'

স্কুলের সংস্কৃত স্যার বলেছিলেন, 'বাবা ঋষিকেশ, আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মা তার নিজের ইচ্ছেয় তোমার খাঁচা ছেড়ে যাবে। তুমি নিজে তাকে হত্যা করার চেষ্টা কোরো না।'

ঋষি মাথা নীচু করে শুনেছিল সেকথা। কিন্তু সেকথা সে যে বিশ্বাস করেনি,

সেটা বোঝা গেল বছর দুয়েক বাদে। তখন ঋষিকেশ প্রায় শয্যাশায়ী। ওর পেটে টিউমারের মতো হয়েছিল। সেটা ভালো করে ডায়াগনসিস করতে পারেনি পাড়ার হরেন ডাক্তার।

তখন ওর বড়দার সঙ্গে কী একটা নিয়ে ঝগড়া হয় এবং পুনর্বার সে আত্মাকে হত্যার চেষ্টা করে অর্থাৎ আবার আত্মহত্যায় ব্রতী হয়। বাথরুম পরিষ্কার করার ফিনাইল আর অ্যাসিড একসঙ্গে খেয়ে।

এরপর সরকারি হাসপাতালে পনেরো দিন। আর ঠিক একমাস বাদে পাড়ার রকে। হরেন ডাক্তার ঋষির সদ্য করানো পেটের এক্সরে দেখে ভুরু কুঁচকে বলেন, 'বিচিত্র কাণ্ড! টিউমারটা তো আর নেই!'

আমরা এই ঘটনার পর ঋষিকেশের একটা নাম দিয়েছিলাম, 'যমের অরুচি।'

এরপর আমি ওকে একান্তে জিগ্যেস করেছিলাম, 'হঠাৎ আবার মরবার শখ হল কেন তোর?'

ও জবাব দিয়েছিল, 'দ্যাখ, আমার বড়দা কর্পোরেশনে চাকরি করে। তোরা জানিস ব্যাটা কত টাকা ঘুষ খায়, সল্টলেকে একটা আস্ত তিনতলা বাড়িও বানিয়েছে। সে যখন সারা জীবন ধরে সৎ থাকা পেনশনভোগী বাবাকে চোখ পাকিয়ে কথা বলে, তখন প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করবে না? আর যেটা করেছি, সেটার চেয়ে প্রতিবাদের ভালো রাস্তা আমার আর জানা নেই।'

আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, তাই বলে আত্মহত্যা অর্থাৎ কিনা আত্মাকে হননের চেষ্টা? অথচ সেটাই বারবার করতে চাইছে ঋষিকেশ।

ঋষিকেশ যে সত্যিই যমের অরুচি, সেটা বোঝা গেল আরও দু'বছর বাদে। প্রেমিকা মল্লিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ফিরে টিভির পিছনের ক্যাবিনেটটা খুলে চলন্ত টিভির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয় ঋষিকেশ! সঙ্গে সঙ্গে একটি বিস্ফোরণ! যে পাড়ায় আমরা থাকতাম সেই পাড়ার গোটা ট্রান্সফর্মারটাই উড়ে যায়। তাতে তিনদিন আলো-জল বাতাস সব বন্ধ।

যখন সারা পাড়া এই কারণে ওকে গালাগাল দিচ্ছে, ও তখন ওদের ছাদের চিলেকোঠায় চুপিচুপি বসে আমাকে বলছে, 'তুই বল, মল্লিকা অন্যায় করেনি আমায় ছেড়ে কুণালের প্রেমে পড়ে?'

'তাই বলে তোর বিরহের দায় গোটা পাড়া নেবে কেন?'

'প্রতিবাদের এর চেয়ে ভালো রাস্তা আমার জানা নেই।'

আমি বলেছিলাম, 'তুই কি জানিস লোকে তোকে যমের অরুচি বলে? তোর কোনও প্রতিবাদের তো কোনও ফল হয় না। স্বয়ং যমরাজই তোর প্রতিবাদপত্র সরাসরি নাকচ করে দেয় বারবার।'

ও সেই অদ্ভুতভাবেই বলেছিল, 'একদিন আমি জিতবই।'

তবু ঋষিকেশ জেতেনি। ওর যমের অরুচি নাম অমর করে রেখে দেয়।

বিয়ের ঠিক একমাস বাদে নিজেরই বেডরুমে, পাশে শায়িত-ঘুমন্ত স্ত্রীকে রেখে খাটের ওপরে জলচৌকি তুলে সিলিং ফ্যানে দড়ি বেঁধে গলায় পরে ঝুলে পড়েছিল। কিন্তু যমরাজ ওর মতো সত্যনিষ্ঠ-নীতিবান মানুষকে তার চৌহদ্দির মধ্যে কিছুতেই আসতে দিতে চাননি।

সিলিং ফ্যান সমেত দড়ি ছিঁড়ে আবার খাটের ওপরেই ঋষিকেশ-পতন এবং সিলিং ফ্যানটা পড়ে ওর স্ত্রী প্রমিতার মাথায়। ফলাফল, তৎক্ষণাৎ প্রমিতার মৃত্যু। ঋষিকেশ অক্ষত এবং হাজতবাস। নানা কাঠখড় পুড়িয়ে তিন মাসের মধ্যে ওর ঘুষখোর বড়দাই ওকে হাজতমুক্ত করে।

জিগ্যেস করেছিলাম ঋষিকেশকে, 'আবার কেন?'

ও বলেছিল, 'প্রমিতার একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড ছিল জানিস কি?'

আমি বলেছিলাম, 'তাই বলে ওকে মেরে ফেলবি?'

ও উত্তরে বলেছিল, 'আমি মেরেছি? আমিই তো মরতে চেয়েছিলাম। ওটা তো অ্যাকসিডেন্ট!'

আমি নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। গালাগাল দিয়েছিলাম, 'শালা যমের অরুচি, তুই কেন বুঝছিস না যে তোর মরণ নেই, তোর পক্ষে আত্মহত্যা সম্ভব নয়। যমও তোকে রিজেক্ট করেছে।'

ও হাত কচলে বলেছিল, 'দেখিস একদিন আমি জিতবই।'

কিন্তু কিছু কিছু মানুষ পরাজিত হতেই জন্মায়। তিন বছর বাদে আবার বোঝা গেল। ও নাকি ওর অফিসের বসের দুর্নীতি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল, ফলস্বরূপ ওর চাকরি চলে যায়। তিনদিন গুম হয়ে বাড়িতে বসেছিল। চতুর্থ দিন চলে যায় দমদম স্টেশনে।

বিষয়টা বিস্তারিতভাবে না বললে বোঝানো যাবে না। দমদম স্টেশনে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দু-একটা আরপিএফ ও হকার ছাড়া ওই দুপুরবেলা আর কিছুর দেখা পেল না। দেখতে পেল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা ট্রেন।

দ্রুত প্ল্যাটফর্ম পার করে লাইনের ওপর এসে, লাইনে গলা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। কখন আসবে তার অধরা দেবতা, অর্থাৎ লোকাল ট্রেনটা।

চোখ বুজে ধাতব ঈষদুষ্ণ লাইনটাকে গলায় ঠেকিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেল ঋষিকেশ। স্কুলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেওয়া...অ্যাসিড খাওয়া...চলন্ত টিভি'র ক্যাবিনেট খুলে হাত ঢুকিয়ে দেওয়া...গলায় দড়ি দেওয়া, মনে-মনে এসব অসম্পূর্ণ কাজগুলোকে কলা দেখাতে লাগল সে!

'এবার, এবার মিস্টার যমকুমার, Now I am coming to your place in front of you!'

কুঁউউঁ...! একটা শব্দ হল।

লোকাল ট্রেনটা হর্ন দিয়েছে। অর্থাৎ এগিয়ে আসছে ঋষিকেশের আজন্ম আরাধ্য দেবতা! যে এতদিন অধরা ছিল, সে ধরা দিতে চলেছে।

আবার হল শব্দটা—'কুঁউউঁ...!

ঋষিকেশ হৃষ্টচিত্তে চোখ বুঁজে রেললাইনের পাথরের গন্ধ নেয়। ধাতব লাইনটা কাঁপছে! তার বুকের ভেতর Come September-এর মিউজিক বেজে উঠছে। এমন সময় তার ঘাড়ে ও জামার কলারে কে যেন হাত রাখে! সে ভাবে, 'মৃত্যু!'

এক ঝটকায় রেললাইন চ্যুত হয়ে দেখে, না মৃত্যু নয়! আরপিএফ!

তখনই পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে, ট্রেনটা দূরে বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রেনটা ঋষিকেশের দিকে আসছিল না। বরং উলটো, তাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে এগোচ্ছিল। লোকাল ট্রেনের হর্ন সামনে নয়, পিছনে থাকে, এটা ওর জানা ছিল না।

তারপর আবার হাজতবাস। এরপর থেকে শুধু আমরাই নয়, আমাদের পরের এবং তারও পরের জেনারেশনের কাছেও ও 'যমের অরুচি' নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে থাকল।

আমি ওকে ডেকে একদিন বলেছিলাম, 'তোর এই প্রতিবাদ করার পদ্ধতিটা এবার একটু চেঞ্জ কর। এতদিনে নিশ্চয়ই কনফার্মড হয়েছিস যে আত্মহননের চেষ্টা বৃথা। আর সুইসাইড করতে যাস না। তোর সততাকে এবার একটু মেডিকেল লিভে পাঠিয়ে দে।'

ও আবার বাধ্য ছেলের মতো মাথা নীচু করে শুনেছিল। বুঝেছিল কিনা তা জানতেও পারিনি। কারণ তার একমাসের মধ্যে ও বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল, আর আমিও চাকরিসূত্রে বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে চলে গেলাম।

বছর সাতেক বাদে বিদেশ থেকে শহরে ফিরে দেখি, ঋষির খবর কেউ জানে না। বছর তিনেক কেটে গেছে দেশে ফিরে।

একবার অফিসের কাজে দিল্লি গেছি। ফেরার পথে হঠাৎই এয়ারপোর্টে ঋষিকেশের সঙ্গে দেখা। চমকে উঠেছি! এ কোন ঋষিকেশ? থলথলে মোটা চেহারা, চোখের নীচদুটো ফুলে বালিশের মতো হয়ে আছে। গলায় মোটা সোনার চেন, দশ আঙুলে দশটা আংটি। সঙ্গে ছ'টা বডিগার্ড। জেড-ক্যাটিগরি সিকিউরিটি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম, বোধহয় কোনও মন্ত্রী। কিন্তু ভুল ভাঙল, ও আমার নাম ধরে ডেকে উঠল, এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। পার্শ্বচর ও সিকিউরিটিদের বলে উঠল, 'কফিশপ'। তারপর আমার কাঁধ খামচে নিয়ে গেল কফিশপে।

আলো-আঁধারি কফিশপ। আমি আর ঋষিকেশ মুখোমুখি। মাঝখানে একটা টেবিল। কফিশপের কতগুলো আলো বোধহয় জ্বলছিল না। পরিবেশটা বেশ ছায়াময়।

ঋষি আমায় বলল, 'তুই তো বিদেশে ছিলি। কবে ফিরলি?'

আমি জবাব দিলাম। কিন্তু আমার মন তখন অন্য কথা শুনতে চাইছে। কফিশপের কাচের বাইরে ছ'জন বডিগার্ড ও কিছু লোক তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি আর জিগ্যেস না করে থাকতে পারছিলাম না। বললাম, 'তুই এখন কী করছিস ঋষি?'

ঋষি একটু মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই অমুক কোম্পানির নাম তো শুনেছিস?'

আমি বললাম, 'বলিস কী রে! ওই কোম্পানির নাম শুনব না? ওই কোম্পানির নামে এয়ারলাইনস, ইনসিওরেন্স, টিভি চ্যানেল, আরও কত কী! এ দেশে থেকে ওই কোম্পানির নাম না শুনে কি থাকা যায়?'

ও মুচকি হেসে বলল, 'আমি ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান ও মালিক।'

বললাম—'কী বাজে বকছিস? ওই কোম্পানির মালিক তো...'

আমায় থামিয়ে ঋষি বলল, 'ওটা আমার আর একটা নাম।'

আমি বললাম, 'বলিস কী রে? এসব কী করে হল?'

ও বলল, 'সে অনেক কথা। আসলে আমাদের দেশের অনেক বড় বড় বিগশর্ট মানে ফিল্ম স্টার-পলিটিসিয়ান, এদের কালো টাকা আমি খাটাই। মানে বিষয়টা সাদা নয়। তোকে বলেই ফেললাম। আর বললেই বা কী? এখানে তো কোনও টিভি চ্যানেল বা জার্নালিস্ট নেই।'

বলেই হা হা করে হেসে উঠল। আমার গা-টা কেমন ঘিনঘিন করে উঠল।

ওর সেলফোনটা বেজে উঠল। ও গুজরাটি ভাষায় কী সব জবাব দিতে লাগল। তারপর একটা ওয়েটারকে ডেকে তার হাতে পাঁচটা হাজার টাকার নোট ধরিয়ে বলল, 'কিপ দ্য চেঞ্জ।'

ওয়েটারের একটা লম্বা স্যালুটের সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ঋষিকেশ আমাকে বলল, 'তোর কফিটা এখনও শেষ হয়নি। আমার একটা জরুরি কাজ এসে গেছে। চললাম। তুই কিন্তু কফিটা শেষ করে উঠিস।'

বলেই কফিশপের গেটের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। গেটের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। আমার খুব কাছে এসে বলল, 'তোরা তো আমাকে যমের অরুচি বলতিস, তাই না! আমি কিন্তু আর যমের অরুচি নই। যমরাজ আমার অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করতে পারেনি। অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য করিয়েছি আমি। আমি আত্মহত্যা করতে পেরেছি। শরীরটাকে না পারলেও আমার আত্মাকে আমি হত্যা করেই ছেড়েছি।'

কফিশপের সুইংডোরটা ঠেলে বেরিয়ে গেল ঋষিকেশ। দরজাটা ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে দুলতে লাগল। যেন বলল, ঠিক ঠিক ঠিক।

অস্তাচলের দুর্গ

'জায়গাটার নাম আমি বলব না। আমি এক বুড়ো বেদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' কথাটা বলেছিলেন ঘটাদা। স্থান অন্ধকার রুম। মাঠের মাঝখানে আমরাই কাঠ দিয়ে সেটা বানিয়েছিলাম। সময়টা শীতকাল। পাত্রপাত্রী আমরা চারজন। আমি, অনিন্দ্য, রাজা ও চন্দন।

প্রথমে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায়। একের পর এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন আমাদের, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জেরবার করে চলেছে। খবরের কাগজ খুললেই, খুন।

অনিন্দ্য বলল, 'এভাবে বেশিদিন চললে স্কুল-কলেজে পড়াশুনোর বদলে গেরিলা ট্রেনিং শেখানো হবে।'

রাজা বলল, 'রাজনৈতিক নেতাগুলোকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। এদের জন্যই এই নরমেধ যজ্ঞ।'

চন্দন বলল, 'নিজেদের মধ্যে এই মারামারির মানে কী? এ তো মহাভারতের মুষলপর্বের মতো।'

এমন সময় ছায়াময় আকাশকে পেছনে রেখে ঘটাদার প্রবেশ।

ঘটাদা সম্পর্কে কিছু বলার দুঃসাহস আমার নেই! কারণ ঘটাদার তুলনা ঘটাদা নিজেই। কেউ বলেন ঘটাদা প্রচণ্ড জ্ঞানী, কেউ বলেন, 'পুরো ভাট। মহামূর্খ।' কেউ বলে 'ধান্ধাবাজ—কেউ বলে দার্শনিক।'

সেই ঘটাদা অন্ধকারে হঠাৎ আমাদের রকের সামনে আবির্ভূত হলেন, এবং বললেন, 'মুষলপর্ব নিয়ে কী যেন বলছিলে?'

চন্দন হঠাৎ আবির্ভূত ঘটাদাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। একটু সামলে বলল, 'ওই তো শুনেছিলাম যদুকুল ধ্বংস হয়ে গেছিল। একটি মুষলের জন্য।'

ঘটাদা চুপ করে থেকে বললেন, 'শুনেছিস?'

চন্দন বলল, 'হ্যাঁ শুনেছি।'

ঘটাদা উদাসচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'শোনা এবং জানার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে।'

রাজা তির্যকভাবে বলে উঠল, 'মনে হয়, তুমি যেন মুষল প্রসবের সময় নার্স অথবা ডাক্তার ছিলে!'

ঘটাদা হঠাৎই ঘাড় ঘুরিয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে কাটা কাটা ভাবে বলে উঠলেন, 'মুষল পর্বের আতুর ঘরটা অন্তত স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল।'

আমরা সবাই চুপ। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো কেমন ভূতুড়ে ভাবে জ্বলছে। শীতকালে উত্তুরে হাওয়া চাদরগুলোকে আমাদের জাপটে ধরতে বলছে...ঘটাদার সদ্য শেষ হওয়া কথাগুলো কেমন নৈঃশব্দিক প্রতিধ্বনি তুলছে বায়ুমণ্ডলে...আমাদের জিভ আটকে আছে! যেন কারুর অমোঘ নির্দেশে।

এবার ঘটাদা বললেন, 'শোন, তোদের একটা গল্প বলি। গল্প না বলে অভিজ্ঞতা বলা ভালো। জায়গাটার নাম আমি বলব না। আমি এক বুড়ো বেদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বছর কুড়ি আগের কথা। তখন আমার ভরা যৌবন। অফিস ম্যাচে ফুটবল খেলতে গিয়ে ডান পা-টা গেল ভেঙে। পায়ে তখন গোটা একটা প্লাস্টার।

সে-ই প্রথম তালটা তুলল, 'চল বেড়িয়ে আসি।' অবনী, যে কিনা ঐতিহাসিক এবং মহাভারত-বিশেষজ্ঞ। জুটে গেল আরও তিনজন। পলাশ, বিক্রম ও তার স্ত্রী প্রমীলা।

আমি বললাম, 'আমার পায়ের এই অবস্থায়?'

ওরা বলল, 'তোকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব।'

বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ট্রেন। তারপর একটা গাড়ি ভাড়া করে। রাজ্যটা গুজরাট। সমুদ্রের ধারে দুদিন ছুটে বেড়ালাম। মানে ওরাই ছুটে বেড়াল। আমি বসে কাটালাম। আগেই বলেছি অবনী ইতিহাসের ছাত্র, একটা কলেজে পড়ায়। সে জানাল, এই সমুদ্রের নীচেই হারিয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগর।

একদিন সকালবেলা সবাই মিলে সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম। এমন সময় একজন নোংরা পোশাক পরা মানুষ এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পলাশ লোকটিকে ভিখারি ভেবে একটা টাকা দিল। লোকটা অদ্ভুতভাবে হেসে পয়সাটা ছুড়ে সমুদ্রে ফেলে দিল। আমরা তো অবাক!

লোকটাকে ডেকে বসিয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা খেতে দিলাম। লোকটা খুশি মনে চা খেতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে, কী করেন?'

লোকটা হিন্দিতে বলল, 'আমি শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। প্রমীলা রসিকতা করে বলল, 'তা আপনার সমস্ত আপনি খোয়ালেন কী করে?'

লোকটা নির্বিকার মুখে বলল, 'খোয়াইনি তো, সব রাখা আছে।'

আমরা সবাই জানতে চাইলাম, কোথায় রাখা আছে।

লোকটা মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অস্তাচলের দুর্গে।' বলেই লোকটা হনহন করে এগিয়ে গেল এবং ক্রমে একটা বিন্দুতে পরিণত হল।

দুপুরবেলা খাওয়ার টেবিলে, পান্থনিবাসের ম্যানেজার পাঁড়েজিকে লোকটার কথা জানতে চাইলাম। পাঁড়েজি হেসে বলে, 'আরে ও তো একটা পাগল। মাঝে মাঝে এদিকটায় আসে। তবে বিপজ্জনক নয়।'

অবনী বলল, 'ও একটা দুর্গের নাম করল। অস্তাচলের দুর্গ—সেটা কোথায়?'

পাঁড়েজি বললেন, 'আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে একটা জনপদ ছিল। যেটা আজ সমুদ্রগর্ভে। সেটাই নাকি দ্বারকানগরী। কৃষ্ণ ভগবান যেটা বানিয়েছিলেন। তবে এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিমি দূরে দুর্গ একটা আছে। সেটার বয়েসও প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর। তবে জায়গাটা দুর্গম, কোনও লোকালয় নেই। একদল ভবঘুরে বেদেরাই সেখানে থাকে বলে শুনেছি। কোনও রাস্তাটাস্তা নেই প্রায়।'

সেদিন সারা রাত অবনী না ঘুমিয়ে একটা ম্যাপ নিয়ে কী সব লেখালেখি করে কাটাল। আমরা ব্যাচেলার তিনজন একটা রুমে ছিলাম। পলাশেরও সকালে দেখলাম, চোখ দুটো লাল। অর্থাৎ সেও ঘুমোয়নি।

সকালে লনে বসে চা খাচ্ছি। দেখলাম প্রমীলা অন্যদিকে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে একা। মুখটা ভার। রাতে মনে হয় বিক্রমের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছে। বিক্রমকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

দুপুরবেলা অবনী হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে নে, বেরোতে হবে! দুর্গের সন্ধান পেয়েছি! এখান থেকে পশ্চিমদিকে চল্লিশ কিলোমিটার। তিরিশ কিলোমিটার পরে জঙ্গল। জঙ্গলের পথে হাঁটতে হবে।' বাকি সবাই চুপ করে রইল, অর্থাৎ সম্মতি জানাল। আমি একটু আমতা-আমতা করছিলাম। কিন্তু বাকিরা পাত্তাই দিল না। একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছিলাম না। সবার মধ্যেই কেমন একটা চাপা উত্তেজনার আভাস।

যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে কাহিনিকে লম্বা করব না। সে ছিল এক দুর্বিষহ জার্নি।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা যখন জঙ্গলের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন মাথার ওপর সন্ধে সামিয়ানা খাটিয়েছে। আমরা দুটো তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বালালাম খাবার তৈরির জন্যে।

সেদিন রাতেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলল না। যেন অপেক্ষা, কখন ভোর হবে। ভোর থেকে হাঁটা শুরু হল। আমার পায়ের কারণে আমি সবার শেষে, দেখলাম আমার জন্য কেউ অপেক্ষাই করছে না। অদৃশ্য কোনও চুম্বকের টানে সবাই এগিয়ে চলেছে।

ওই ভয়ংকর যাত্রাপথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা যখন আমাদের লক্ষ্যের সামনে পৌঁছোলাম, তখন অন্ধকার ঘনাতে চলেছে। একটা পাথরের দেওয়াল। ওপাশটা কালের নিয়মে ধ্বসে গেছে, নয়তো পৃথিবীর নীচের প্লেট সরে যাওয়ার ফলে সামনের পাহাড়টা গ্রাস করে নিয়েছে।

দৃশ্যটা খানিকটা এরকম, একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা দেওয়াল। দেওয়ালটার মাথায় ভাঙা ভাঙা দেউড়ি, কোনও এক সময় সেখানে প্রহরীরা পাহারা দিত। দেওয়ালটা প্রায় দেড়শো ফিট উঁচু এবং মসৃণ, দেওয়ালটা ঘিরে সুগভীর গর্ত বা পরিখা। কতটা গভীর সেটা অন্ধকার হয়ে আসায় বোঝা গেল না।

তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া হল। দেখলাম আজ আর কেউ রান্নাবান্নার দিকে গেলই না। দূর্গের দেওয়ালটা থেকে কারুর চোখ সরছে না।

সকালবেলা প্রমীলার চিৎকারে ঘুম ভাঙল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি, চারজনই রেডি পরিখা পার হওয়ার জন্য। চারজনই পরিখার সামনে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি সুগভীর পরিখার গর্তের দিকে। আমি ভাঙা পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। দেখি, পরিখার অনেক নীচে ছুঁচোলো অনেক বাঁশ পোতা শরশয্যার মতন। অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা দেহ বাঁশবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওকে চিনতে পারলাম। রামদয়াল! আমাদের গাড়ির ড্রাইভার। কিন্তু রামদয়াল এখানে এল কী করে? ওকে তো দুদিন আগে জঙ্গলের বাইরে আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তার মানে রামদয়াল আমাদের ফলো করেছিল। কাল রাতে ও একাই পরিখা পার হয়ে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তখনই পা ফসকে পড়ে যায় ও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

দেখলাম অবনী ব্যাগের ভেতর থেকে একটা লম্বা দড়ি বের করল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে পরিখা বরাবর হাঁটতে শুরু করল। অর্থাৎ ও ওপারে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছে। বাকি তিনজনও দেখলাম আলাদা হয়ে গেল। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। অদ্ভুত যন্ত্রের মতো আচরণ করছে সবাই।

আমি ধীরে ধীরে তাঁবুতে ফিরে এলাম। ঘণ্টা পাঁচেক পরে আবার একটা চিৎকার শুনে তাঁবুর বাইরে বেরোলাম। দেখলাম অবনী পরিখার ওপারে দেওয়ালটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এবারের চিৎকারটা উল্লাসের।

আমি আবার তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। প্রচণ্ড খিদেতে মাথা ঘুরছিল। ব্যাগ থেকে দু-চারটে বিস্কুট বার করে চিবোতে লাগলাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই দেখলাম সামনে অবনী। অদ্ভুতভাবে বসে আছে! চোখ দুটো চকচক করছে উত্তেজনায়। শরীরটা কাঁপছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?'

ও আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর চুপ করে বসে রইল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুর্গে ঢোকার রাস্তা পেলি?

ও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ না।

আমি বললাম 'তবে?'

ও আমার দিকে তাকাল। আমি ওর মুখটা দেখে চমকে উঠলাম! এ কোন অবনী?

ওর চোখ দুটো ঝলসে উঠল, 'ওই দেওয়ালটার কুড়ি ফুট ওপরে একটা ফুটো আছে। সেখান দিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম। দুর্গের ভেতরটা দেখা যায় কি না দেখতে...'

বলে চুপ করে রইল।

আমি বললাম, 'কী দেখলি?'

ও বলল, 'তুই ভাবতেও পারবি না। ভেতরে একটা অন্ধকার কক্ষ দেখতে পেলাম—আর তার মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে।'

আমি বললাম, 'প্রদীপ? অসম্ভব।'

ও আমার হাত চেপে ধরল। বলল, 'তুই বিশ্বাস না করলে আমার কিছু যায় আসে না। আর কী দেখলাম জানিস? একটা হাতির দাঁতের স্ট্যান্ডের ওপর একটা বিশাল বড় ঝিনুক আর তার মধ্যে স্যমন্তক মণি।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কী?'

ও বলল, 'রাজা সত্রাজিৎ ছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। তিনি ছিলেন সূর্যের উপাসক। সূর্যদেব স্বয়ং এই মণি সত্রাজিৎকে দিয়েছিলেন। এই মণি শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে সত্রাজিৎ লুকিয়ে ফেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে চোর সাব্যস্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ পরে এই মণি অনেক কষ্টে উদ্ধার করেন এবং নিজের করায়ত্ত করেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওটা তো গল্প কথা। এর কোনও সত্যতা আছে কি? আর ওটা যে স্যমন্তক মণি সেটাই বা বুঝলি কী করে?'

ও চোখ বড় বড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল পলাশের চিৎকারে।

অবনী ধড়ফড় করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরাও বেরোলাম। দেখলাম চিৎকার নয়। পলাশ হাসছে। অট্টহাসি! এভাবে ওকে হাসতে কখনও দেখিনি।

অবনীকে আর দেখতে পেলাম না। বোধহয় জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে। পলাশ পরিখার দিক থেকে হেঁটে আসছে। আমায় দেখে হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। একটা গাছের নীচে বসল। উত্তেজনায় ওর শরীরটাও কাঁপছে। আমি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওর পাশে গেলাম। বললাম, 'তুই কি দুর্গে ঢোকার পথ পেয়েছিস?'

ও বলল, 'না পাইনি। তবে দেওয়ালের কুড়ি ফুট ওপরে একটা ফাটল আছে।

তা দিয়ে ভেতরে দেখলাম—'

আমি বললাম, 'ক্-কী দেখলি?'

ও বলল, 'অস্তাচলের দুর্গ না ছাই! এটা উগ্রপন্থীদের একটা অস্ত্রাগার। ভেতরে খুব কম করে তিন হাজার AK47 সার দিয়ে রাখা।'

আমি বলতে গেলাম, AK47 বুঝলি কী করে? কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল পলাশ চার বছর মিলিটারিতে ছিল।

পলাশ বলল, 'এক-একটার দাম কম করে পাঁচ লাখ টাকা! ভাবতে পারিস।'

ওর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু অবনী যে বলল—'

পলাশ খ্যাক করে উঠল, 'ও ব্যাটাও সন্ধান পেয়েছে নাকি? দাঁড়া দেখাচ্ছি।'

বলেই পলাশ উঠে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল। বন্ধুদের অস্বাভাবিক আচরণে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার অচেনা মনে হতে লাগল সবাইকে। হঠাৎ এই মানুষগুলো বদলে গেল কী করে? জঙ্গলের মধ্যে ইতস্তত হাঁটার চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

তাঁবুর কাছে ফিরতে দেখি, পাশের তাঁবুর ভেতর থেকে প্রমীলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চাপাস্বর, 'ফাটল দিয়ে এক ঝলক দেখেছি! উঃ, অত সোনা আমি কোনওদিন দেখিনি।'

বিক্রমের গলা শুনলাম, 'আমি তো কোনও কিছুই খুঁজে পেলাম না।'

প্রমীলা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তুমি পাবে কী করে? সারা জীবন তো কোনও কর্মেই লাগলে না। মাস গেলে মাইনের টাকা ছাড়া কোনওদিন রোজগারের চেষ্টা করেছ? আমার কোনও সাধ আহ্লাদ মিটিয়েছ? মেয়েমুখো একটা অপদার্থ।'

বিক্রম ফস্ করে উঠল, 'মুখ সামলে কিন্তু! মেরে গুঁড়ো করে দেব।'

প্রমীলা চাপাস্বরে হেসে ওঠে। বলে, 'তাই নাকি?'

আমি তাঁবুর জানালা দিয়ে উঁকি মারি। দুজনকে দেখা যাচ্ছে।

বিক্রম হঠাৎই কাশতে শুরু করল। প্রমীলা খলখল করে হেসে উঠল, 'তোমার খাবার জলে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। সেটা তুমি এইমাত্র খেলে।'

বিক্রম কাশতে কাশতে শুয়ে পড়ে। বলে, 'বিষ? পেলে কোথায়?'

প্রমীলা ডাইনির মতো হাসছে। বলে, 'কেন, রাম দয়াল আসার দিন সকালে ওকে সব বলেছিলাম। ওই জোগাড় করেছিল। তারপর, সেদিন সবাই যখন ঘুমোচ্ছিলে, আমি ওকে জঙ্গল থেকে বের করে পরিখা পার হতে বলি...আর ধাক্কা মারি। সরল সমীকরণ! এ সোনা আমি কাউকে নিয়ে যেতে দেব না, এ শুধু আমার।'

আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এ মানুষগুলো আর মানুষ নেই। সব

হিংস্র জানোয়ার হয়ে গেছে। আমি তাঁবুতে ফেরার জন্য পা বাড়ালাম। দুর্ভাগ্য, একটা মরাডালে খোঁড়া পা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার তীক্ষ্ণ চিৎকার 'কে?'

তারপর তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রমীলা। হাতে তাঁবুর খুটি পোতার হাতুড়ি। সজোরে চালাল আমার কানের পাশে। আমি মুখ থুবড়ে ঘাসের ওপর! চোখ খুলতে গিয়ে দেখি, পারছি না। গরম তরল যে বস্তুটা আমার চোখ ঢেকে দিচ্ছে, তার নাম রক্ত।

আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম জঙ্গলের মধ্যে আমি একটা তাঁবুতে শুয়ে। সামনে একটা বৃদ্ধ লোক। আদিবাসী মনে হল। বুড়োটা বলল, ওরা একটা ভবঘুরে বেদের দল—জঙ্গলে আমায় আধমরা অবস্থায় পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছে। আমি সাতদিন নাকি অজ্ঞান ছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার বন্ধুরা কোথায়?'

বুড়ো উদাসভাবে হেসে বলল, 'একে অপরকে মেরে ফেলেছে—তুমিই একমাত্র বেঁচে আছ।' আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বন্ধুরা মরে গেল? অতিকষ্টে সামলে নিয়ে ওর কাছে জানতে চাইলাম দুর্গের ঢোকার পথ। বুড়ো বলল, 'আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায়নি।'

তারপর বুড়ো বলল, তারা এ অঞ্চলেই ঘুরে বেড়ায়। তারা বলরামের বংশধর।

আমি বিস্তারিত জানতে চাওয়ায় বলল, মুষল পর্বের অনেক আগে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে গোপনে এই দুর্গে আসেন দ্বারকা থেকে। দুর্গে প্রবেশ করার আগে তিনি বলরামকে এই অরণ্যে দাঁড় করিয়ে যান। দুর্গে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। এবং ওই দুর্গে তিনি কিছু গোপন জিনিস লুকিয়ে রাখেন। বলরাম দীর্ঘদিন অরণ্যে একা থাকতে থাকতে একজন অরণ্যবাসিনীকে বিবাহ করেন এবং তাদের বংশবিস্তার হয়। এই বেদের দলই বলরামের বংশধর।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বলরাম ওই দুর্গে প্রবেশ করেননি তাই তার বংশধররাও পাঁচ হাজার বছরে ওই দুর্গে ঢোকার চেষ্টাও করেনি।

বুড়ো বলে চলল, 'আমরা না গেলেও যাদবরা ওই দুর্গে গিয়েছিল—এবং তারপর নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে দ্বারকায় ফিরে যায়। এ ছিল মুষল পর্বের সূচনা—বাকিটা তো ইতিহাস।'

ঘটাদা চুপ করে গেল। কুয়াশার অন্ধকার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে চলেছে—।

চন্দন বলে ওঠে, 'তারপর?'

ঘটাদা বলে, 'তারপর ওই বেদেরই দল আমায় ফিরে আসতে সাহায্য করে।

ফিরে এলাম। এখন তোদের সামনে। কুড়ি বছর পরে।'

রাজা বলে উঠল, 'এখানেই শেষ?'

ঘটাদা চোখ কুঁচকে বললেন, 'না। এখানেই শেষ নয়। শেষ হল ছ'মাস আগে।'

আমি বললাম, 'কী করে?'

ঘটাদা বললেন, 'ছ'মাস আগে অফিসের কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। পার্লামেন্টের সামনের ক্রসিংটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তা পার হব বলে। এইসময় কনভয় সমেত একঝাঁক গাড়ি ক্রসিংটায় স্পিড আস্তে করল। মাঝখানের লালবাতি লাগানো সাদা গাড়িটার মধ্যে সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। এখন লোকটার নোংরা পোশাক নয়। এলোমেলো চুল-দাড়ি নয়। একদম ক্লিন শেভড। নিট অ্যান্ড ক্লিন। খদ্দরের পাঞ্জাবি। লোকটা আমায় দেখতে পায়নি—।'

চন্দন বলে উঠল, 'কোন লোকটা?'

ঘটাদা বললেন, 'সমুদ্রতীরে যে লোকটা টাকাটা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর চা খেতে-খেতে প্রথম আমাদের অস্তাচলের দুর্গের কথা বলেছিল।

আমি বললাম, 'তারপর?'

ঘটাদা বললেন, 'তারপর আর কী! কনভয়টা শব্দ করতে করতে পার্লামেন্টে ঢুকে গেল। আমি পরদিন কলকাতায় ফিরে এলাম।'

বলেই ঘড়ি দেখে ঘটাদা হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালেন, 'না যাই। মেয়ের বেবি ফুড কিনতে হবে। দোকানটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল।'

আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলাম, 'ঘটাদা, ঘটাদা—!'

ঘটাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কী?'

জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু তুমি তো বললে না অস্তাচলের দুর্গের আসল রহস্য। সত্যি-সত্যি কী ছিল দুর্গের পাঁচিলের আড়ালে মানে দুর্গের মধ্যে কী ছিল?'

ঘটাদা একটু হেসে হনহন করে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'দুর্গের মধ্যে লোভ ছিল।'

রম্যরচনা

আমার দেখা সবচেয়ে বড় গণেশ হল পলিটব্যুরো

ছোটবেলায় যখন পাড়ায় দুর্গাপ্রতিমা আসত, তখন দেখার জন্যে হামলে পড়ত কচিকাঁচারা, মানে আমরা। কী যে দেখতাম জানি না। নতুন কিছুই ছিল না, তবু দেখতাম। তার পরে নানা সমালোচনা—এবারে সিংহটা তেমন স্বাস্থ্যবান নয়, কার্তিকটা কেমন ম্যাদামারা, সরস্বতীর নাকটা বাঁকা—এই সব। একজনকে শুধু ভালো করে লক্ষ করা হত না। তিনি গণেশ। গণেশকে আসলে ভালো করে বুঝতে পারতাম না। কারণ, গণেশ যে কী কারণে দেবতা, সেটাই ভালো করে বুঝে উঠতে পারতাম না। উনি ভালো যোদ্ধা কি না, তা-ও ভালো ভাবে জানা যায় না। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ওঁর ভূমিকা যে কী, তা ওই বয়েসে বুঝতাম না। শুধু জানতাম, উনি নাকি সিদ্ধি দেন। সিদ্ধি বস্তুটার সঙ্গে তখন সম্যক ধারণা একটাই ছিল—ভাসানের দিন যেটা খেয়ে হাবুদা আমাদের সরকারি আবাসনের জলের ট্যাঙ্কে চড়ে গান ধরেন ঃ 'হাম কালে হ্যায় তো ক্যা হুয়া দিলওয়ালে হ্যায়', সুরজিৎদা টানা বারো ঘণ্টা নেচে চলেন, আমাদের আবাসনের ঝাড়ুদার চুড়ান নর্দমায় পড়ে নর্দমা অলঙ্কৃত করে, ব্যস এইটুকুই। গণেশ এই সিদ্ধির হোলসেল সাপ্লায়ার কী করে হলেন ছোট বয়সে বুঝতাম না।

আজ বুঝি তাঁর সিদ্ধির মাহাত্ম্য। তাঁর সিদ্ধি যিনি লাভ করেছেন, তাঁর আঙুল ফুলে কলাগাছ। যাঁরা লাভ করেননি, তাঁরাও সিদ্ধির নেশায় হাবুদা বা চুড়ান হয়ে নিজ নিজ স্থান অলঙ্কৃত করে চলেছেন। অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেও শান্তি, না লাভ করেও শান্তি।

সত্যি বলতে কী, আমিও ভালো করে বুঝতে পারি না, যখন জীবনের নানা স্তরে গণেশ দেখতে পাই। গণেশ দেখতে পাই আমাদের বাংলা সিনেমার এভারগ্রিন নায়কের মধ্যে। তিনিও সিদ্ধিদাতা। তিনি ক্রমাগত হিট ছবির সিদ্ধিদাতা। সে ছবি কোথায় হিট হয়, কারা হিট করায়, জানি না! ভক্তেরা বলে, জনগণ।

কিন্তু জনগণের মধ্যে তো আমরাও পড়ি। আমাদেরও মেনে নিতে হয় সিদ্ধি না খেয়ে সিদ্ধির নেশা। অর্থাৎ আমরা যাঁরা সিদ্ধি না খেয়ে সিদ্ধির নেশায় নেশাগ্রস্ত, তাঁদেরও হাবুদা বা চুড়ান হতে বাধ্য করে আমাদের হিরো গণেশ। সুতরাং সিদ্ধিলাভটাই আসল কথা নয়, সিদ্ধিলাভ করে বেঁচে থাকাটাই শেষ কথা। আর এটাই গণেশ মাহাত্ম্যের ম্যাজিক।

গণেশ এখন শুনছি দুধ খাচ্ছে, কিন্তু আমি জানি গণেশ অনেক কিছুই খায়; মাটি, জল, অনেক কিছু। নানারকম গণেশ আছে। যেমন, দক্ষিণমুখী গণেশ, মানে যার শুঁড় ডান দিকে। এ গণেশ পুঁজিপতি গণেশ। আবার বামমুখী গণেশও আছে, মানে যার শুঁড় বাঁ দিকে গেছে। এ গণেশকে সহজে বোঝা যায় না, অন্য চোখ লাগে। এ গণেশ সব খায়, শুধু দুধ নয়। যেমন, সাম্প্রতিক কালে আজিজুল হক সাহেবের একটি লেখা পড়ে জানলাম—এই বর্ধমান, হুগলি, সিঙ্গুর অঞ্চল জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাটাকে জমি দিচ্ছে মোটরগাড়ি কারখানার জন্যে। তা ভালো, উন্নয়ন হবে। কিন্তু একটি গাড়ি তৈরি করতে জল লাগে সতেরো হাজার লিটার। উৎপাদনের হার যদি ভদ্র ভাবেও চলে, ত হলে এক বছরে জল লাগবে দু-কোটি চার লক্ষ লিটার। এ জল আসবে কোথা থেকে? নদী তো অনেক দূরে।

যদি নদী থেকে জল পাইপলাইনে আসে, তা হলে তো বহু জমি অধিগ্রহণ হবে। সে কথা সরকার এখনও বলেনি, হয়তো আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নামে বামমুখী গণেশটি মাটি খাচ্ছে। আর যদি তা না হয়, তা হলে এ জল জোগাড় হবে মাটি ফুঁড়ে মাটির নীচ থেকে। কিন্তু যে অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে আটশো ষাট জন মানুষ বাস করে, সেখানে কি এটা করা যায়? কুড়ি বছর বাদে গোটা অঞ্চলটা মরুভূমিতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণমুখী গণেশ জল খাচ্ছে।

গণেশ সর্বস্তরে। হাটে-মাঠে-রান্নাঘরে। আমার দেখা সবচেয়ে বড় গণেশ হল পলিটব্যুরো। সুদূর নেপালে মাওবাদীদের উত্থান হল, পলিটব্যুরো সিদ্ধির গামলা হাতে ইয়েচুরিকে পাঠালেন। নেপালের মাওবাদীদের সিদ্ধিলাভের মহান দায়িত্ব পলিটব্যুরো ছাড়া কে নেবে? এ দিকে আমাদের রাজ্যে মাওবাদীদের প্রতি কড়া হাতে দমননীতি কিন্তু অটুট। এ যে কী বিচিত্র ব্যাপার, কী পবিত্র লীলা, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! নেপাল থেকে মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডকে এ রাজ্যে জামাই আদর করে নাকি নিয়ে আসা হচ্ছে। মিস্টার ইয়েচুরি ওঁকে এই কমিউনিস্ট রাজ্যের উন্নয়ন দেখাবেন! অর্থাৎ সিদ্ধি কাজে লেগেছে। কে একজন এ সব দেখে বলেছিলেন যেন 'আরে, প্রচণ্ডের দেখছি ইয়ে চুরি হয়ে গেল'। যাক সে সব কথা। গণেশমাহাত্ম্যের কথা বলতে এক জীবন যথেষ্ট নয়।

বিশ্বাস করুন, মাঝে মাঝে নিজের মধ্যেও গণেশ দেখতে পাই। অন্যেরা

যখন মনে করে যে কথা কেউ বলতে পারে না, নচিকেতা সে কথা বলে দিতে পারে, কী সাহস! সত্যিই কি আমার সাহস আছে? সত্যি কি আমি সব কথা অকপটে বলতে পারি?

আমিও কি সিদ্ধি ফেরি করছি না? আজ থেকে ৫০ বছর বাদে কোনও এক নচিকেতা যখন কলম ধরবে গণেশমাহাত্ম্য দেখানোর জন্যে, তখন সে-ও কি আজকের নচিকেতার মুখের মধ্যে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে গণেশকে দেখতে পাবে না?

‘এজ্ঞে, দু-গালে চড় মারার পর...’

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধি নামটা শুনলেই পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের কিছু রোঁয়া ওঠা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ডাণ্ডি অভিযান, ভারত ছাড়ো আন্দোলন—এ সবের অর্ধ সত্য ও অসমাপ্ত পাঠ্যক্রম, যা আমাদের পড়তে হয়েছিল, সব মনে পড়ে যায়। গাঁধিজি মহান মানুষ ছিলেন, ছিলেন জাতির জনক, কিন্তু তাঁর একটা স্টাইল ছিল একদম নিরালা। তা হল অহিংস আন্দোলন। এটাকেই বর্তমানে গাঁধিগিরি বলা হয়। গাঁধিগিরির নিয়মকানুন এরকম যে, প্রতিপক্ষ যতই মারমুখী হোক, আপনাকে তার সামনে ভোট চাইতে আসা কোনও ভ্রষ্ট নেতার মতোই থাকতে হবে, হাত জোড় করে, দাঁত বার করে। আপনার একটু উত্তেজনা বা অসন্তোষে রব উঠতে পারে—‘গাঁধিগিরি খতরে মে’। তখন যে আপনাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিল, তার কিন্তু কোনও দোষ বা দায় থাকে না, সব দোষই আপনার। আপনিই ঠিক ভাবে গাঁধিবাদী থাকলেন না।

গাঁধিজি কী ভেবে গাঁধিগিরি শুরু করেছিলেন, জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের পলিটিশিয়ানরা এর এক নতুন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ তৈরি করে ফেলেছেন। অর্থাৎ, আপনাকে ও আমাকে থাকতে হবে গাঁধিবাদী, আর ওঁরা, অর্থাৎ শাসকশ্রেণি গাঁধিবাদী না থাকলে কোনও অসুবিধে নেই। সব দায় আমাদের। লালগড়ের মানুষ খেতে না পেয়ে হাতে বন্দুক তুলে নিলে দায় লালগড়ের মানুষের। আর, সরকার পুলিশ পাঠিয়ে অত্যাচার করলে তার কোনও দায় সরকারের নয়। কারণ, সরকার তো আর গাঁধিগিরি করবে না। গাঁধি তো আমাদের। আমাদের জাতির জনক। আমরাই তো জাতি, সরকার বাহাদুর তো সে জাতে পড়েন না। তিনি তো বিরল প্রজাতি।

সিঙ্গুরে বা নন্দীগ্রামে আবদার করে জমি চাওয়াই যেতে পারে। আপনি না দিলে তো অভদ্রতা করা হচ্ছে। এ তো গাঁধিগিরির ‘খিলাফ’। তার পরে যদি জোর করে আপনাকে সন্ত্রস্ত করে কোনও নাবালিকাকে ধর্ষণ করে ও পুড়িয়ে আপনার চাষের জমি অধিকার করতে চাওয়া হয়, তখন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে না থাকাটা কি গাঁধিগিরি হল? হল না। সুতরাং, এ জাতির উন্নতি কে করবে? এদের উন্নতি

অসম্ভব। কী করে এ জাতির উন্নতি সম্ভব, যখন জগৎ শেঠের কোনও বংশধর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে পালাতে সে জাতিকে অভিশাপ দেয়। যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র গাঁধিগিরি নেই, সেই জাতির উন্নতি গাঁধিজিও করতে পারতেন না। প্রতিরোধকারী এক জনকে হাতের কাছে পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'এ তোমরা কী করলে? অহিংসার পথে ছেড়ে দিলে? গাঁধিজি কি এ কথা বলেছিলেন? তিনি তো বলেছিলেন, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দিতে হবে।' লোকটা ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে বলল, 'এজ্ঞে, বাবু, তাই তো করেছিলুম।' আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'কী করেছিলে?' সে আবার মাথা চুলকে বলেছিল, 'এজ্ঞে, এক গালে মারার পরে আর এক গাল তো পেতে দিয়েছিলুম, সে গালেও তো মারল।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তার পর?' সে আবার একইভাবে বলেছিল, 'এজ্ঞে, দু-গালেই চড় মারার পরে কী করতে হবে, এ কথা তো গাঁধিজি বলে যাননি।'

বর্তমানে গাঁধিগিরির ইস্তেহারের যদি সংক্ষিপ্তসার করতে হয়, তা হলে আমার একটি কবিতার কথা বলতে হয়—

চালাও বুলেট বুকে আমার
বুক আমার চাঁদমারি তোমার
আমি দীন সাধারণ, নিশ্বাসে প্রয়োজন।
আমি দর্শক, তুমি মায়াজাল
আমি ভাবনাকে খাই
তুমি করো তা যাচাই
আমি দাস,
তুমি ক্যাপিটাল।

সুভাষদা জিতে গেলেন

সুভাষদার সঙ্গে আমার পরিচয় '৯২ সাল নাগাদ। বাবরি মসজিদ ভাঙার আগে। বাবরি মসজিদের ঘটনার পর উনি 'জ্বালো মৈত্রীর আলো' বলে একটা অনুষ্ঠান করেন। বারাসাত থেকে পাতিপুকুর পর্যন্ত যশোর রোড ধরে মানবশৃঙ্খল তৈরি করেছিলেন। ভেবে দেখুন, ডিসেম্বর মাস, সন্ধে বেলা। খুব বেশি হাওয়া দেয় না তো, প্রত্যেকটা মানুষের হাতে একটা করে মোমবাতি জ্বলছে। যেন একটা বিরাট রানওয়ে। এমন দৃশ্য তৈরি করতে একমাত্র সুভাষ চক্রবর্তীই পারেন।

দেখেছেন, এখনও 'পারেন' লিখছি। সুভাষদা যে আর নেই, সে কথাটাই বিশ্বাস হচ্ছে না যে। শেষ দেখা হয়েছিল তিন বছর আগে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ওঁর বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে দেখা করতে গিয়েছিলাম, নিজেই। আজকে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে এটা ভেবে যে, ওঁর সঙ্গে তার পর আর যোগাযোগ হয়নি। উনি যে অসুস্থ, সেটাই তো কাউকে জানাতে চাননি। আর আমিও ভেবে গেছি, উনি ঠিক কাম ব্যাক করবেন অসুখকেও হারিয়ে দিয়ে। আর মঙ্গলবার পর্যন্ত ভেবে গেছি, যে ভদ্রলোক অতগুলো মিরাকল করেছেন, কাম ব্যাক করেছেন পর পর, তিনি তো হঠাৎ উঠে পড়তেও পারেন শেষশয্যা থেকে।

সেই বাবরি মসজিদের মানবশৃঙ্খলে আমি দুটো গান গেয়েছিলাম। একটা ছিল 'এই বেশ ভালো আছি।' সেখানে সুভাষদা ছিলেন না। কিন্তু যে-কোনও ভাবে ওঁর কানে পৌঁছে যায় যে, ছেলেটা অন্যরকম গান গাইছে। তার পর সুভাষদা গঙ্গা উৎসব করলেন। গঙ্গার বুকে লঞ্চের ওপর হওয়া সেই অনুষ্ঠানে সুভাষদা আমায় আবার সুযোগ করে দিলেন। নিজস্ব স্টাইলে যেমন বলতেন, ওইরকম করে বলেছিলেন, "দুইখান কি তিনখান গাইতে পারবি।" শেষে আট-ন'খানা গেয়েছিলাম। সেই সুভাষদা আমার গান শুনলেন ভালো করে।

এইচএমভি থেকে প্রথম অ্যালবাম বেরোনোর পর সেটা যে পপুলার হয়েছে, সে খবর আমার আগে সুভাষদা পেয়েছিলেন। আসলে তখন সবাই জানত সুভাষদার ঘরের ছেলে নচিকেতা।

তার পর নানা অনুষ্ঠানে আমায় পাঠাতে শুরু করলেন সুভাষদা। কিন্তু কিছু জায়গায় সঙ্গে যেতেন। ওঁর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বুঝতাম ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা কত অন্য রকম ছিল। একবার ট্রেনে যাওয়ার সময় অনেক রাতে দেখি সুভাষদা পড়ছেন। কী? না বাংলার বাউল গানের ইতিহাস। আমায় বলেছিলেন, "জানিস, শ্রম যদি বিপ্লবের উৎস হয়, আর শ্রমজীবীদের কথা যদি কেউ সংগীতে বলে, তা হলে বাংল গানে বাউলরাই প্রথম রেবেল।"

উনি বুঝতেন কাকে দিয়ে হবে, কার মধ্যে আগুন আছে। সেই আমি, যে সুভাষদার বাড়ির প্রায় বড় ছেলের মতো ছিলাম, তার আর সুভাষদার মধ্যে কিছু লোক বিরোধ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। ভুল বোঝাবুঝি করিয়েছিল। তারা যে খানিকটা সফলও হয়েছিল সে কথাও অস্বীকার করব না।

দীর্ঘ সময় আমাদের দু-জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। পরে বুঝেছিলাম, সুভাষদা মনে করতেন আমার মতো ছেলেকে আটকে রাখা যায় না, উচিতও নয়।

আর সুভাষদার একনিষ্ঠ ভক্ত আমি, হাজার বিরোধ সত্ত্বেও বরাবর চাইতাম, মানুষটা জিতে যাক। সেই অপারেশন সানশাইন থেকে যুব উৎসব—ভদ্রলোককে তো কর্নার করার চেষ্টা কম হয়নি। আর প্রত্যেক বারই আমার মনে একই রকম অনুভূতি হত। আসলে সুভাষদা যে আমার কাছে রাজনীতির ঊর্ধ্বে, এক জন সামাজিক মানুষ ছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধ পার্টির কত জনকে কত সাহায্য করেছেন, নিজের চোখে দেখেছি।

সিপিএম পার্টির বিরোধিতা আমি শুরু করি নন্দীগ্রামের পর। নন্দীগ্রামের ঘটনার পর আমি তো বলেইছিলাম যে, মানুষটাকে আমি যতটুকু চিনি, তাতে জানি, সুভাষদা, সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছেন এসব দেখে। সে কথা যে কত সত্যি, তা তো প্রমাণিত হল স্টার আনন্দে দেওয়া লোকসভা নির্বাচনের আগে ওঁর সাক্ষাৎকারে। কিছু দিন আগে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠে যে গান গাইলাম, তা নিয়েও একমাত্র উনিই কোনও মন্তব্য করেননি। পরে শুনেছিলাম, উনি নাকি সে বিষয়ে বলেছিলেন, এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার।

আমি গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়াই তো, সুভাষ চক্রবর্তী যে কী ছিলেন এই সব প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে, না দেখলে বোঝা যাবে না। আমি দেখেছি। ওঁর গাড়ি যাচ্ছে মালদার ইন্টিরিয়রে। রাস্তার ধারে দু-চারটে বাড়ি। তাদের গরিব বললেও কম বলা হবে। সেখানেও লোকে লাল ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কী না, সুভাষ চক্রবর্তী যাবেন।

আর সুভাষদা এ সব বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে দিব্যি বসে পড়তেন, তাদের সঙ্গে মুড়ি খেতেন। এমনকী জলও। সে জলের রং দেখলে আমি খেতে পারব না। পারিওনি সে দিন। উনি পারতেন। উনিই একমাত্র পারতেন।

এই যোগাযোগটা না থাকলে কখনও অমন জনসংগঠক হওয়া যায়? কলকাতা শহরে ধপধপে জামাকাপড় পরে নিজেদের সিপিএম বলে দাবি করে যাঁরা, তাঁদের গ্রামে কেউ চেনে না। সুভাষ চক্রবর্তীকে কিন্তু ওরা চিনত। ও সব জায়গায় সিপিএম মানে একমাত্র উনিই। সবাই জানবে, মানুষটা মারা গেছেন ক্যান্সারে। কিন্তু রোগটা তো একটা অনুঘটক মাত্র। আসলে তো মারা গেছেন মনঃকষ্টে। কম অপমানিত হয়েছেন? রাজ্য কমিটিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। শেষে জ্যোতিবাবুর কথায় ওঁদের রাজি হতে হয়।

আজকে সেই তাঁরাই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। এটাকেই বোধহয় বলে কুমিরের কান্না। মঙ্গলবার যে মানুষের ঢল নামল রাস্তায়, তা দেখে আমার অন্তত মনে হয়নি, সুভাষ চক্রবর্তী তাঁর শ্রেষ্ঠ মরণোত্তর পুরস্কারটা পেয়ে গেলেন। মানুষটা চোখের সামনে ছিলেন তো, কী অসাধ্যসাধন কত জনের জন্য করে দিতেন, সেটা লোকে বোঝেনি। মারা যাওয়ার পর বোধহয় বুঝছে যে, মুখ দিয়ে কথা ফেললেই মুশকিল আসান আর হাজির হবে না। সেই ভিড়টা বোধহয় ওই কারণেই। সুভাষদা শেষ দিন পর্যন্ত 'আন্ডাররেটেড'ই থেকে গেলেন। কাকে হারাল, সে কথা ওঁর দলও বুঝতে পারল কি না, সে নিয়েও প্রশ্ন থেকে গেল। আমার একটাই প্রশ্ন ঃ এই বার সিপিএমের বৈতরণীটা কে পার করবে?

আমার শুধু ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, সুভাষদা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অপরাজেয় থেকেই চলে গেলেন। যেমন বরাবর চেয়ে এসেছি আমি।

২০১১টা দেখতে হল না ওঁকে।

অমল রুদ্র

আমি ক্লান্ত প্রাণ। চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। আমি হাঁটছি। অন্তহীন হেঁটেই চলছি। কেন, জানি না। শুধু জানি, একটা জীবন। একটার পর একটা হার্ডল ক্রস করা। ব্যর্থ হলে কক্ষপথ পরিবর্তন করা। আর এভাবে হাঁটতে হাঁটতে, হার্ডল পেরোতে পেরোতে একদিন আচমকা মুখ থুবড়ে পড়া। তা হলে কেন এই হাঁটা? কীসের আশায়? জানি না। শুধু জানি, মস্তিষ্কের গভীরে কোথায় যেন একটাই প্রতিধ্বনি ঃ চরৈবেতি। চরৈবেতি। এগিয়ে চল। এগিয়ে চল। ওটাই গুরুমন্ত্র। মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে স্কুলে যাচ্ছে খাকি হাফ প্যান্ট সাদা জামা এক বাচ্চা ছেলে। তা, স্কুলে যেতে কারই বা ভালো লাগে? তাও আবার মাত্র চার বছর বয়সে?

স্কুলের নাম 'সান বিমস'। প্রথম কয়েক মাস দুরন্ত এই বাচ্চা ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বাড়ির লোকেদের। আজও সে কাঁদতে কাঁদতেই চলেছে। কিন্তু আজই শেষ। বাচ্চাটা জানত না, কাল থেকে সে আর কাঁদবে না। কারণ, কাল থেকে স্কুলের ফাংশনের রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবে। আর, সেই রিহার্সালে গাইয়ে হিসেবে সে চান্স পাবে।

তেত্রিশ বছর আগের সেই সকালে বাচ্চাটা আরও অনেক কিছুই জানত না। জানত না, এই স্কুল ছেড়ে যাওয়ার সময় সে মায়া আন্টির জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। মায়া আন্টিই তো প্রথম তাঁর ভেতরের গায়কটাকে চিনতে পেরেছিল।

মায়া আন্টি। বিশাল চেহারা। মধ্য পঞ্চাশ, ভালো করে হাঁটতেও পারতেন না। কিন্তু মুখটা ছিল মায়ের মতো। 'সান বিমস' স্কুলের সেই বাচ্চাদের কাছে মায়া আন্টি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। ওঁর ছোঁয়ায় ছিল সেই সত্যিকারের 'মায়া', যা আজও ভোলা যায়নি।

সময়ের নিয়ম মেনে বাচ্চাটা বড় হতেই থাকল। আর সেই বড় হওয়ার মুখেই প্রশ্ন, এ বার কোন স্কুল? সান বিমস নার্সারির পালা তত দিনে শেষ।

সবাই বলল, "ভালো স্কুলে দাও। ম্যানার্স শিখবে।" বাবা বললেন, "হ, হইসে। গ্র্যান্ড হোটেলের বাইরে যে পাগড়ি পরা দারোয়ানরা খাড়াইয়া থাকে, সেও

তো ওয়েল ম্যানার্ড। গাড়ির গেট খুইল্যা দেয়, 'বাও' কইর‍্যা গুডমর্নিং, ওয়েলকাম কয়। লোগডা তো ভালোই ম্যানার্স জানে। তার মানে কি সে শিক্ষিত?" বলতে বলতেই ঘোষণা করলেন, "ম্যানার্সের সঙ্গে শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নাই। বরং শিক্ষার সঙ্গে ম্যানার্সের সম্পর্ক আছে। যে শিক্ষিত হয়, সে আপনাআপনিই ম্যানার্স শেখে। আর শিক্ষার উপাদান প্রতিষ্ঠানের চকচকে দেওয়ালে থাকে না। বাবাসকল, সে উপাদান চার দেওয়ালের মধ্যে থাকে না। সে উপাদান আত্মস্থ করার চোখ চাই, মন চাই। সেইডা যার নাই, সে হাজার পইড়্যাও শিক্ষিত হয় না।"

ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকরি করতেন বাবা। স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, অনুশীলন দলের রীতিমতো সভ্য ছিলেন। স্বাধীনতা সৈনিক হিসেবে তাম্রপত্রও পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। বাবা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। তারপর ঘাত-প্রতিঘাতে, এই সেই ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে আরও অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে, বাড়িতে বাবার কাছে চারু মজুমদারকেও আসতে দেখত সেই বাচ্চা ছেলেটা।

বাবা জানতেন না, স্কুলে ভর্তির মোড়কে কী শিক্ষা পেয়ে গেল বাচ্চা ছেলেটা! বাবার ওই কথাগুলোই তো তিরিশ বছর বাদে গানের মোড়কে গাইবে সে,

ছড়িয়ে রয়েছে জীবন ইট কাঠ পাথরে / বাতাসের ছোঁয়াতে আর আকাশের চাদরে / প্রেমিকার আলিঙ্গনে, শ্বাপদের আঁচড়ে / সূর্যের উত্তাপে আর রাত্রির আদরে।

পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন নামের সেই স্কুলে ছেলেটা ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। গান আর গল্পের জন্য। ক্লাসরুমের টেবিল বাজিয়ে ছেলেটা যখন গান গাইত, বন্ধুরা হাঁ করে শুনত। এমনকী, করিডোর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে টিচাররাও দাঁড়িয়ে যেতেন। ছেলেটা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলত, বন্ধুরা সেটাও হাঁ করে শুনত। মাঝে মাঝে পড়ানোর শেষে মাস্টারমশাইরাও ওকে গল্প শোনাতে বলতেন। ছাত্রদের সঙ্গে অবাক হয়ে শুনতেন তাঁরাও।

গল্পগুলোর অধিকাংশই ছিল ছেলেটার নিজের বানানো। আর সেই বানানো গল্প অন্য বন্ধুরা, মাস্টারমশাইরা নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন। আশ্চর্য! কাল্পনিক চরিত্রও এত জীবন্ত হয়? স্বপ্নে দেখা গল্পও সারা ক্লাসরুমকে এত নিস্তব্ধ করে দিতে পারে? এতটা?

অমলবাবু ছিলেন সেই মাস্টারমশাইদেরই একজন। ছেলেটা লক্ষ করত, ক্লাসের পড়া থেকে গল্প বলা, প্রতিটি বিষয়েই অমলবাবু তাকে নিঃশব্দে খেয়াল করছেন। মাপছেন। পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু কেন?

ছেলেটা সেটা বুঝতে পারেনি। যেমন বুঝতে পারেনি, ইংরেজি পড়াতে পড়াতে অমলবাবু কেন রুশ বিপ্লবের কথা বলতেন। বলতেন ম্যাক্সিম গোর্কির কথা।

শুধু বুঝতে পারত, শোষণের কথা বলতে বলতে প্রতিবাদী ইতিহাসের কথা বলতে বলতে অমলবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঘেন্নায় মুখটা ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আজ, ২৩ বছর পরেও সেই বিকৃত মুখটাকে ভুলতে পারেনি ছেলেটা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ও যখন প্রতিবাদের গান গায়, লোকে বোঝে না ওর মুখের আড়ালে খেলা করছে আর-একটা মুখ। ওর মাস্টারমশাই অমল রুদ্রের মুখ।

অমলবাবু—অমল রুদ্র—রুদ্র স্যার। যে নামেই ডাকুন না কেন, আসল কথা একটাই। মাস্টারমশাইয়ের রুদ্ররূপের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল স্কুলের সেই আমলের গভর্নিং বডির দুর্নীতি। সুশীলবাবু স্যার অবসর নিয়ে দেখেছিলেন, তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডে একটা পয়সাও নেই। ঘুঘুর বাসাটা তৈরি হয়েছিল স্কুলের মধ্যেই। স্কুল উন্নয়নের যাবতীয় টাকা লোপাট করে দেওয়া! আমাদের মাস্টারমশাইদের কয়েক জন, এঁদের এক জন ছিলেন আবার রাজনৈতিক নেতা, এঁরা ছিলেন সেই দুষ্টচক্রের হোতা।

আর এই চক্রের বিরুদ্ধে, দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতারক এই গভর্নিং বডির বিরুদ্ধেই লড়ছিলেন রুদ্র স্যার আর নিরূপবাবু। ওঁরা কোর্টে কেসও করেছিলেন কমিটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যা হয়! বছরের পর বছর পিছিয়ে যেত মামলার তারিখ, আক্রোশে ফুঁসতে শুরু করেছিলেন রুদ্রবাবুরা। এভাবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া, ছাত্ররা কিছু জানে না? জানবে না?

এরকমই এক দিন একজন ছেলেটাকে এসে বলল, "রুদ্রবাবু তোর সঙ্গে কথা বলতে চান।"

পাইকপাড়া ফার্স্ট রো। রুদ্রবাবুর বাড়িটা ছিল সেখানেই।

ঘরের মধ্যে কয়েকজন লোক। রুদ্রবাবু আর নিরূপ স্যার কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে, ছেলেটা গিয়ে ঢুকল।

চোখ তুলে তাকালেন রুদ্রবাবু। সাফ বললেন, "আমি যা বলব, যা করতে চলেছি, তার সঙ্গে যদি একমত না হও, বিস্কুট খাও, তারপর বাড়ি চলে যাও। এক মুহূর্ত থাকার দরকার নেই।"

ছেলেটা সম্মোহিত। রুদ্রবাবু বলে চলেছেন, "এবার এই দুর্নীতির কথা ছাত্র এবং অভিভাবকদের জানানোর সময় হয়েছে। এ বার সেই অচলায়তন ভাঙতে হবে।" ছেলেটার দু-চোখে বিস্ময়ের ঘোর...মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে কোণে শোনা কথাগুলোই যেন রুদ্রবাবুর মুখে অমোঘ গুরুমন্ত্রের আকার নিচ্ছে...চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে প্রেক্ষাপট।

শুরু হচ্ছে আন্দোলন। ওই তো ছেলেটা। বক্তৃতা দিচ্ছে। বন্ধুদের নিয়ে মিছিলে যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার প্রতিবাদের গল্প শুনছে। শুনছে ফিদেল কাস্ত্রোর কথা।

ওই তো রুদ্রবাবু ছেলেটার হাতে তুলে দিচ্ছেন চে গেভারা-র ডায়েরি। ওই তো ছেলেটা। আঁকাবাঁকা হাতে পোস্টার লিখছে...রাজনীতির জন্য সারাদিন দৌড়ে বেড়াচ্ছে...রাত্রিবেলা পড়তে বসছে রুদ্রবাবুর বাড়িতে...ওই তো ছেলেটা। ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে।...

ওই তো ছেলেটা। রুদ্রবাবুর হাতে তৈরি আপোশহীন একটা মানুষ। কবে যে এই আপসহীনতার গুরুমন্ত্র শেষ হবে, ছেলেটা আজও জানে না। জানে, রুদ্রবাবুর ওই শিক্ষার জোরে এই যুদ্ধবাজ ২০০৩-এও তাকে আলাদা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, লিখতে হবে...

একদিন ঝড় থেমে যাবে / পৃথিবী আবার শান্ত হবে / বসতি আবার গড়ে / আকাশ আলোয় উঠবে ভরে...

কী বললেন? অমল রুদ্র কোথায় আছেন? কেমন আছেন?

জানার দরকার নেই। আজ নচিকেতা যখন মাঝে মাঝে স্মৃতির অনুরণনে সেই ছেলেটা হয়ে যায় বা হতে চায়, তখন সত্যি কথা বলতে কী, ব্যক্তি অমল রুদ্র কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা জানতে চাওয়া সে আদৌ আবশ্যক মনে করে না।

কারণ একটাই!

নচিকেতার মস্তিষ্কের কোশে কোশে আজও যে গুরুমন্ত্র ধ্বনিত হয়, তা অমল স্যারেরই কণ্ঠস্বর। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি...'।

I LUV কখগ > 1111

মোবাইল একটি অপরিহার্য যন্ত্র এই মুহূর্তে। আপনার মোবাইল না থাকলে সোজা চলে যান আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, তার পর পছন্দমতো একটা খাঁচা বেছে নিন, তার পর থাকতে শুরু করুন। কারণ, অসভ্য বণ্যপ্রাণী ছাড়া প্রায় সব প্রাণীই এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে (হাচ-এর কুকুরটাও)। কেউ ব্যাবসার কারণে মোবাইল ব্যবহার করেন, কেউ প্রেম করার জন্য; কেউ জোক্‌স পাঠানোর জন্য, আবার কেউ ব্যবহার করেন এসএমএস-এ ভোট দেওয়ার জন্যে।

মোবাইল দিয়ে সব কিছুই করা যায়। মোবাইল দিয়ে ছবি তোলা যায়, সে ছবি দূরদূরান্তে পাঠিয়েও দেওয়া যায়। মোবাইলে গান শোনা যায়, সে গান মোছাও যায়। মোবাইলে এসএমএস দিয়ে মতামত জানানো যায়—সেরা বাঙালি, সেরা সেক্সি, সেরা কিপটে বা সেরা বাতেলাবাজও নির্ধারণ করা যায় এসএমএস-এ।

নানা কাজের মধ্যে থাকার জন্যে আমার খুব একটা টেলিভিশন দেখা হয় না। হঠাৎই একদিন টিভি খুলে দেখলাম একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেটি গানের এবং প্রতিযোগিতামূলক। বেশ ভালো লাগল কয়েক জন বিচারক বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিভা বাছছেন। তার পর আর দেখা হয়নি বহুদিন। আর-একটি চ্যানেলে এই জাতীয় আর-একটি অনুষ্ঠান। সেটিতেও কয়েক জন বিচারক দক্ষতার সঙ্গে প্রতিভা বাছলেন। কিন্তু ও মা, প্রাথমিক রাউন্ডের পরেই আমাদের অনুষ্ঠানে অনুপ্রবেশ ঘটল এই আধুনিক গুপিযন্ত্রটির। মোবাইল-এর কথা বলছি। হঠাৎই একদিন চ্যানেল জানাল—এবার আর বিচারক নয়, জনগণই বিচারক হবেন। এসএমএস দিয়েই জনগণ জানাবেন 'কে থাকবে' বা 'কে বাদ যাবে'। এবং ফাইনালি 'কে হবে চাম্পিয়ন'। বহু বিতর্ক হল, কিন্তু হুকুম নড়ল না—এটাই নাকি ট্রেন্ড। এখন থেকে নাকি জনগণই এসএমএস দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু ঠিক করবে—নিউক্লিয়ার সায়েন্সে কে হবে সেরা সায়েন্টিস্ট, কে হবে সেরা চিত্রকর, কে হবে আপনার মেয়ের বর, মায় আপনার বাবা কি আদর্শ বাবা? এটাও আপনাকে বলতে হবে এসএমএস-এর ভোটের ভিত্তিতে। হয়তো আগামী দিনে কে অর্থনীতিতে নোবেল

প্রাইজ পাবে তা-ও দেখবেন নির্ধারণ করতে জনগণ। যে জনগণ মাস ফুরোলে ধার করতে হয়নি দেখে, নিজেকে সেরা অর্থনীতিবিদ ভাবেন।

শুরু হল পরের রাউন্ড। দর্শকের এসএমএস-এর বিচারে প্রথমেই বেরিয়ে গেল এমন একজন প্রতিযোগী—তিন জন প্রশিক্ষক এবং চ্যানেলের প্রায় সবাই যাকে ভেবেছিলেন চ্যাম্পিয়ন হবে। সবাই মর্মাহত। এগিয়ে চলল অনুষ্ঠান। একটা জিনিস ক্রমে ক্রমে বোঝা যাচ্ছিল, যারা ভালো গান গাইছিল তারাই ক্রমাগত বাদ পড়ে যাচ্ছে। তারপর একটু খোঁজ নিতে শুরু করলাম। টিভি-র অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো দেখতে শুরু করলাম নিয়মিত। দেখে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। চ্যানেল একটি অনুষ্ঠানকে হাইপ করে বা একটি অনুষ্ঠানকে বার বার দেখিয়ে মানুষের কাছে অনুষ্ঠানটির বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে চাইছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে মানুষ বোকা হচ্ছে দু'রকম ভাবে। এক, বাজে গান শুনে। দুই, এসএমএস করে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে। আর চ্যানেল লাভ করছে অজ্ঞাতকুলশীল কিছু গাইয়েকে প্রোমোট করে। যাদের কোনও পারিশ্রমিক নেই। লাভ করছে স্পনসরারদের থেকে, লাভ করছে মানুষের দেওয়া এসএমএস-এর টাকা মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়ে। এই আসল খেলা। আর মোবাইল হাতে আপনি একটি দুটি এসএমএস করে ভাবছেন, কী মহান কাজই না করেছেন—ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভাবছেন আর বোকাবাক্সের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে মোবাইল ঝাঁকিয়ে এসএমএস বার করে চলেছেন।

এবার প্রশ্ন, কেন এসএমএস? মানুষ কেন এসএমএস করেন? এঁরা সেই মানুষ যাদের মতামত রাষ্ট্র নেতারা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে কোনও দিন চায়নি। এঁরা সেই মানুষ যাঁরা দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জাঁতাকলে পিষে চলেছেন, এই জাঁতাকলে থাকতে তাঁদের কেমন লাগছে তা-ও কেউ জানতে চায়নি। এঁরা সেই মানুষ যাঁদের মাতৃদুগ্ধের বাতেলাবাজি দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়েই ৬ বছর ইংরেজি শিক্ষার থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। একটা গোটা জেনারেশন পিছিয়ে পড়ল কেন? এঁদের এখন কী অবস্থা, এঁদের মতামত চাওয়া হয়নি! এঁরা সেই মানুষ যাঁদের যখন যা খাওয়ানো হচ্ছে, তাই খাচ্ছে; কখনও পঁচিশে বৈশাখ তো কখনও ডিস্কো থেক, কখনও গানমেলা কখনও ফ্রি-সেক্স। এঁরা পোষা প্রাণীর মতো মাথা নীচু করে বিনা প্রতিবাদে খেয়ে চলেছেন। এঁরা কেন খাচ্ছেন? ধোলাইয়ের ভয়ে? না কি অভ্যেসে? কেউ মতামত চায়নি! আজ এত বছর বাদে হঠাৎ যদি এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের হাতে মোবাইল নামক একটি 'বান্টু' এসে পড়ে, তার ফল যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। এত দিনে যাঁদের মতামত কেউ চায়নি, কোনও দিন তাঁদের যদি হঠাৎ বলা হয় 'মতামত দিন', লাখে লাখে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে মতামত দিতে। 'সেরা বাঙালি, সেরা কাঙালি'—এই সব আপাত বৃহৎ আসলে অত্যন্ত সামান্য বিষয়ের ক্ষেত্র।

কেউ কিন্তু বলছে না, 'আসুন এসএমএস দিয়ে নির্ধারণ করি রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন?' সে মতামত কিন্তু আপনাকে দিতে দেওয়া হবে না। ধরুন বলা হল, 'পেট্রোলের দাম বাড়বে কি বাড়বে না? আসুন এসএমএস দিয়ে ঠিক করি'। সে গুড়ে বালি। সে মতামত দেওয়ার মতো যোগ্যতা আপনার হয়নি। ওটা ঠান্ডা ঘরে বসেই ঠিক হবে, নির্ধারণ করার আলাদা লোক আছে। এখন প্রশ্ন, সবচেয়ে বেশি এসএমএস করে কারা? আমার পর্যবেক্ষণ বলে, কিছু বালখিল্যের দল, গড় বয়স যাদের ১৫ থেকে ১৮। এদের হাতে হাতেই ঘুরছে মোবাইল। বাচ্চাদের হাতে দশ-বারো হাজার টাকার কোনও জিনিস তুলে দিতে বাবা-মায়ের কোনও আপত্তি হয় না। প্রশ্ন করলে বলেন, 'যা দিনকাল পড়েছে, কোথায় আছে, কী করছে, সব খবরটাও তো পাওয়া যায়।' ভাবি, আমাদের বাবা মায়ের বোধহয় কোনও দুশ্চিন্তাই ছিল না। যা-ই হোক, এইসব বালখিল্যদের হাতেই এখন মতামত, মানে মোবাইল। সকাল থেকে একে-ওকে এসএমএস করে চলেছে, অধিকাংশই 'টেক কেয়ার' গোছের; আর দিচ্ছে মতামত, 'কে হবে আইডল'— সেটা কিন্তু গানের বিচারে নয়, কারণ এরা গানের কী বোঝে?

গান গাওয়ার যেমন একটা প্র্যাকটিস আছে, গান শোনারও একটা প্র্যাকটিস থাকে। হঠাৎ করে যদি আপনাকে বিলম্বিত খেয়াল শোনানো হয় আপনার ভালো লাগবে না, আপনি কিছুই বুঝবেন না কোথায় তাল আর কোথায় সুর। বেশ কিছু দিন শোনার পরে ভালো লাগবে, আত্মস্থ করতে পারবেন। এটা প্র্যাকটিস। বাচ্চাদের ছোটবেলায় ছড়া পড়ানো হয় কেন? যাতে বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে এই প্র্যাকটিসটা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু গানের বেলায় নয় কেন? এটা কোনও শিক্ষা নয়? কেন গানের ক্ষেত্রেই সাংগীতিক ভাবে মূর্খ কিছু মানুষ নির্ধারণ করে দেবে, কে সেরা সংগীতশিল্পী? ভোট দেওয়ার সপক্ষে এই বালখিল্যদের যুক্তিও আমি কিছু কিছু শুনেছি, 'তুই অমুককে ভোট না দিয়ে তমুককে দিলি কেন?' 'ওর মুখটা দেখেছিস? মা গো, ভরতি ব্রণ!' 'আমি ভাই অমুককে দিয়েছি, কী সেক্সি!' এই তো হল সেরা সংগীতশিল্পী মাপার বিচারক। মাপ করবেন, এই বিচারকদের আমি বিশ্বাস করি না। দিনে প্রায় বারো ঘণ্টা গানের জন্যে পরিশ্রম করতে দেখেছি অনেককে, গালের ব্রণ সম্পর্কে ভেবে রেওয়াজ নষ্ট করে না যারা, আমি তাদের বিচারের ভার অশরীরী কিছু বিচারকের হাতে দিতে পারব না, যাদের বিচারের পেছনে কোনও যুক্তি নেই, কোনও দায়িত্ব নেই, আছে শুধু কতকগুলো সংখ্যা।

মানুষ ভোট দিয়ে কিছু নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী নির্ধারণ করতে করতে যদি ভেবে ফেলেন, শিল্পী-সাহিত্যিক নির্ধারণ করবেন, তা হলে মানুষের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ঃ প্লিজ, আপনারা একটু ক্ষান্ত হোন, শিল্প-সংস্কৃতির জায়গাটাও রাজনীতির মতো মরুভূমি বানাবেন না।

চাপে ছোট মাপে বড়

প্রতিভার সন্ধানে আমি কোনও দিনই আকুল হয়ে পথে নামিনি। তবে হ্যাঁ, এর সাক্ষী হয়েছি বহুবার! অর্থাৎ প্রতিভার সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছে চ্যানেল বা প্রোডিউসার, আমি তখন তাদের হয়ে সঞ্চালনা করেছি। এই 'ট্যালেন্ট হান্ট' অনুসন্ধানে বোধহয় আমিই সবথেকে বেশিদিন ও বেশিবার সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেছি—সেই 'সা থেকে সা', 'এ তো নয় শুধু গান' থেকে 'দাদা না দিদি' পর্যন্ত। এতগুলো অনুষ্ঠান, এত বছর ধরে আমার করার এবং দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

আপনারা বলবেন, প্রতিভা কি খুঁজে পাননি? আমি বলব নিশ্চয়ই পেয়েছি—পেয়েছি শুভমিতাকে, পেয়েছি জয়তীকে, সুদেষ্ণাকে, শুভঙ্কর ভাস্কর, উদয় এবং আরও অনেককে। একটা সময় ছিল, যখন প্রতিভা নির্ধারণ করতেন শিক্ষিত বিচারকরা। একটা সময় এল, যখন প্রতিভার বিচার করার গুরুদায়িত্ব তুলে নিলেন আমজনতা। এসএমএস-এর মাধ্যমে। আর একটা সময় এল, যখন জুরি-রা দায়িত্ব নিলেন জনতার মতামতকে প্রভাবিত করার—অথচ তাঁরা হয়তো সে-অর্থে গানবাজনার লোকই নন। এ ঠিক মারাদোনার হাতে একটা ইংলিশ ফ্লুট ধরিয়ে দেওয়ার মতো—মারাদোনাকে এই বাঁশির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে হবে, তা উনি পারুন বা না পারুন। কিন্তু আমার কিছুই করার থাকে না, বা থাকত না। কারণ আমি সঞ্চালক মাত্র, আমার কাজ নাম ঘোষণা করা, একটু গাওয়া, আর একটু রসিকতা করা, একটু উৎসাহ দেওয়া।

যাই হোক, যা বলছিলাম—এই 'ট্যালেন্ট হান্ট' ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ নয়। বহু অনামি শিল্পী এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে 'ওয়ান-টু-ওয়ান' মোলাকাতের সুযোগ পাচ্ছেন—মাঝখানে কাউকে দরকার হচ্ছে না। যেমন, পাড়ার যুবতী মেয়েটার গান শুনে জনৈক সুন্দরদা মেয়েটাকে চোখ দিয়ে জরিপ করতে-করতে বলেন, 'একদিন চলে এসো, তোমায় একটা চান্স করিয়ে দেব, অমুককে বলে।' এক্ষেত্রে এসব সুন্দরদাদের বাড়া ভাতে ছাই। কারণ 'ট্যালেন্ট হান্ট'-এর প্ল্যাটফর্ম শিল্পীকে সরাসরি জনগণের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে 'ট্যালেন্ট হান্ট' যুগ-যুগ জিও।

কিন্তু 'ট্যালেন্ট হান্ট'-কে ধিক্কারও দিতে ইচ্ছে করে। যখন দেখি বাচ্চাদের নিয়ে এই বাঁদরামিটা শুরু হয়েছে। বাঁদরামি আমি এই কারণে বলছি, কারণ, আমি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে, আর এ তো শ্রমেরও ঊর্ধ্বে! কোনও শিশুশ্রমিককে এতটা মানসিক চাপ নিতে হয় না, যতটা 'ট্যালেন্ট হান্ট' নামক জাঁতাকলে শিশুদের নিতে হয়।

দেখতে পাই দু-হাজার প্রতিযোগীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও একজন প্রতিযোগী, যার বয়স আট কি নয়। সারাদিন রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে, ইস্কুল কামাই করে—যদি বা টেস্টে পাশ করে—তারপরে আছে বাছাই। তারপর গ্রুমিং, তারপর ক্যামেরার সামনে। এতগুলো স্তর পেরিয়ে এল যে, তার বয়স, আবারও বলছি, মাত্র আট কি নয়। এর মধ্যে বহু লোকের বাতেলা, বাবা-মা-র দাঁত-কিড়মিড়াড়ি—এগুলো ফাউ।

এটা কিন্তু একদিনের প্রক্রিয়া নয়, সুদূরপ্রসারী। যতদিন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকবে। ভাঙা-ভাঙা শিডিউল যতদিন প্রতিযোগিতায় চলতে থাকবে, ততদিন ধরে—তা প্রায় বছরখানেক তো বটেই। ভেবে দেখুন, এক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এই মানসিক চাপ আপনি-আমি নিতে পারব কি না সন্দেহ, অথচ এই বাচ্চাদের বাবা-মা-র বিনা দ্বিধায় সেই চাপের বোঝা বাচ্চাগুলোর দেহ মনে চাপিয়েই চলেছেন। জিগ্যেস করলে দাঁত বার করে অনেকেই বলেন, 'এ লাইনে তো একটু এরকম হবেই!'

কিন্তু বাচ্চাকে লাইনে দাঁড় করানোর অধিকার এদের কে দিয়েছে ভেবে পাই না। আসলে ইচ্ছেটা তো বাচ্চাদের নয়, ইচ্ছে নামক বিষটা তাদের বাবা-মা-র। সেটাকে তাঁরা ইনজেক্ট করেছেন বাচ্চাটার মধ্যে। অনেকে আবার খোলাখুলি বলেন, 'আমার হয়নি। তাই ওর মধ্যে দিয়েই...' ইত্যাদি প্রভৃতি।

বলতে ইচ্ছে করে, আপনার হয়নি আপনি অপদার্থ তাই। আপনার বাচ্চা কি আপনার ইচ্ছেটার মোট-বওয়া গাধা, যে ওকে আপনার ইচ্ছের মোট বইতে হবে?

বলতে ইচ্ছে করে, বাবা-মা হয়েছেন বলে কি যা ইচ্ছে তাই করবেন? কোনটা মানবিক, কোনটা অমানবিক বুঝবেন না? জন্ম দিয়েছেন বলেই কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আপনার বাচ্চা কি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল যে, আমায় জন্ম দাও, বিনিময়ে তোমাদের স্বপ্নের মোট বইব?

প্রতিযোগিতায় যদি কোনও বাচ্চা হেরে যায়, বাবা-মা-র সে কী শোকস্তব্ধ চেহারা! বাবা সাতদিন দাড়ি কামাবেন না, মা চারদিন উনুন ধরাবেন না। সাতদিন ধরে চলবে বাচ্চার কানের সামনে গঞ্জনা, 'তুই ভালো করে পারফর্ম করিসনি।' এ ছাড়া থাকে পাড়া-প্রতিবেশীর টিটকিরি। এসবই হজম করতে হয় একটা বাচ্চাকে, যার বয়স আট থেকে বারোর মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে, আপনাদের জানাই, জাতীয় নারী ও শিশুকল্যাণ কমিশন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন যে, এই ধরনের 'ট্যালেন্ট হান্ট' রিয়েলিটি শো শিশুশ্রমের সমান, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

আর একটা তথ্য দিই। কলকাতা তথা ভারতবর্ষের বহু স্কুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সেই স্কুলের ষোলো বছরের অনূর্ধ্ব কোনও স্টুডেন্ট কোনও 'রিয়েলিটি শো'-তে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যদি ষোলোর ঊর্ধ্বে কেউ অংশগ্রহণ করতে চায়, তা হলে কী ধরনের 'রিয়েলিটি শো' তা জানিয়ে স্কুলের অনুমতিসাপেক্ষে যোগদান করতে পারবে।

এবার আসছি গ্রুমিং-এর প্রসঙ্গে। একটি বাচ্চা যদি শিশুসুলভ সারল্য দিয়ে গান করে, বা নাচে—তা হলে চলবে না। তাকে বড়দের মতো গাইতে হবে। বড়দের মতো নাচতে হবে। বড়দের মতো হাবভাব করতে হবে।

ভেবে দেখুন, একটি গাছকে যদি কেমিক্যাল দিয়ে বয়স্ক বানানো হয়, তাতে গাছটির স্বাভাবিক বিকাশ কি থাকবে? তাকে গাইতে হবে নচিকেতার মতো, নাচতে হবে বিপাশা বসু-র মতো। আরে! নচিকেতা একটা দামড়া লোক। শিশুটি যদি তার মতো হাত-পা ছুড়ে তাকে নকল করে, সেটা কি খুব রুচিসংগত হবে? কিংবা বিপাশা বসু-র মতো চোলি আর ঘাগরা পরে কোমর দোলায়—সেটাও কি খুব শোভনীয়?

আমাদের পাড়ার একটি লোকের নাম মদন। একবার এক নাবালিকাকে দেখে সে বলে উঠেছিল, 'চাপে ছোট মাপে বড়।'

আমরা তাকে খুব মারধর করেছিলাম এর জন্য। আর এখন, এ ধরনের টিপ্পনিকেই বাচ্চাদের বাবা-মারা কম্‌প্লিমেন্ট বলে ভেবে ফেলছেন, আশ্চর্য!

'PAEDOPHILIA' বলে একটা শব্দ আছে ইংরেজিতে। এটি একটি মানসিক রোগ। এক কথায়, এর মানে 'শিশু যৌনাচার'। মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমরা যারা নিয়মিত এই ধরনের 'ট্যালেন্ট হান্ট'-এ ছোট-ছোট বাচ্চাদের পারফর্ম করতে দেখি, তারিয়ে-তারিয়ে তাদের আইটেম ডান্স উপভোগ করি এবং আনন্দ পাই, সেই আমরা কি সবাই আসলে পিডোফিলিয়ায় ভুগছি?

উপন্যাস

ক্যাকটাস

কলিংবেলটা বেজে উঠল একটা শব্দে। এ নিশ্চয়ই হোম ডেলিভারি দেওয়ার ছেলেটা। কিন্তু এখন তো মাত্র আটটা বাজে! আর খাওয়াতো সেই দশটায়!

গজগজ করতে করতে প্রভাসবাবু দরজা খুললেন। ঠিক তাই, টিফিন কেরিয়ার হাতে ছোকরা দাঁড়িয়ে। খাবার নিয়ে প্রভাসবাবু দরজা দিলেন। ঘড়িতে দেখলেন, রাত আটটা পাঁচ। এতক্ষণ খাবার গরম থাকবে তো?

এসব ভাবতে ভাবতে তিনি খাবারটা ডাইনিং টেবিলে রেখে বিছানার দিকে এগোলেন। বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে সদ্য কেনা স্টিফেন কিং-এর একটি বইয়ে মনোনিবেশ করলেন।

বছরখানেক হল এটা তাঁর নতুন এক ভালো লাগা। আগে কখনও এ ভালো লাগার ব্যাপারটা উনি আবিষ্কার করেননি নিজের মধ্যে। স্ত্রী দীপা মারা যাওয়ার পর এ একেবারে নেশার মতো চেপে বসেছে। বই পড়া। তাও যে সে বই নয়, রহস্য-রোমাঞ্চ! তা অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, হেডলি চেজ, স্টিফেন কিং, দীনেন্দ্রকুমার রায় থেকে শরদিন্দু, সত্যজিৎ মায় অনীশ দেব অবধি সবার রহস্য গল্প উনি রীতিমতো গিলছেন। এই একবছরে উনি প্রায় ৩৫০টা বই কিনে ফেলেছেন। অর্থকষ্ট ওঁর নেই, ভালো চাকরি করেছেন। সঞ্চয় তো আছেই, মোটা টাকা পেনশনও পান।

বয়েস হলে যা-যা হয় ওঁর তাই হয়েছে। পিতৃসূত্রে হাঁপানিটা পেয়েছেন আর আর্থারাইটিসে হাঁটু দুটোর অবস্থা ভালো নয়। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বেশ জ্বালায়।

ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে। বিয়ে করে ওখানে আছে বছরদশেক। আসেও না, আসার প্রয়োজনও মনে করে না। মাঝে মাঝে ফোন করত।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে প্রভাসবাবু টেলিফোনটা ছেড়ে দেন। সুতরাং ছেলের ফোনের কোনও আশাই থাকল না। তা ছাড়া টেলিফোন রেখেই বা কী করবেন? আত্মীয়স্বজন তো কেউ নেই, বন্ধুবান্ধবও নেই বললেই চলে। আর টেলিফোন থাকলে বই পড়ার বড্ড অসুবিধে হয়।...

সারাটা জীবন সরকারি অফিসে চাকরি করেছেন আর-পাঁচজন কেরানির

মতো। জীবনও কাটিয়েছেন সাদামাটা। বলা যায় একটু কিপটেরই মতো। শেষ বয়েসটা স্বামী-স্ত্রী ভারত ভ্রমণ করবেন এই আশায়। কিন্তু বাধ সাধল দীপা। দুম করে দু-দিনের জ্বরে 'গুডবাই' না বলেই চলে গেল। দু-বছর আগে।

প্রতিবেশী হৃষীকেশবাবু বললেন, প্রভাস এবার ধর্মে কর্মে মন দাও। পরমেশ্বরে আশ্রয় ছাড়া কোনও গতি নেই এ বয়সে।

প্রভাসবাবু মাসখানেক এক ধর্মসভায় নিয়ম করে যাওয়া শুরু করলেন হৃষীকেশবাবুদের সঙ্গে। পরিচয়ও হল আরও অনেক বৃদ্ধের সঙ্গে। কিন্তু দেখলেন, ধর্মগুরুরা অতিরঞ্জিত করে যা যা বলছেন, তা অত্যন্ত ক্লিশে কিছু কথা, যা যে-কোনও মানুষই ছোটবেলা থেকে জানে।

প্রভাসবাবুর মোহমুক্তি ঘটল। সেই যে একদিন চলে এলেন, আর ও-মুখো হননি।

একাকিত্বের দশমণি বোঝা ঘাড়ে নিয়ে প্রভাসবাবু একবারে জেরবার হয়ে মারা পড়ছিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁকে একটি বই পড়তে দেন। ফ্রেডরিক নট-এর 'ডায়াল এম ফর মার্ডার'। বইটা পড়ে ওঁর শরীরের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেল। ভাবলেন, এত রোমাঞ্চও লুকিয়ে আছে পৃথিবীতে! তারপর থেকেই উনি গ্রন্থকীট।

এক-একটি বই পড়তে ওঁর সময় লাগে প্রায় তিন দিন। বই পড়া শেষ হলে তিনি বাইরে বেরোন। শীতকাল হলে মাংকিটুপি, সোয়েটার আর মোজা পরে, গরমকালে খদ্দরের বড় ফতুয়া আর ধুতি পরে।

প্রতিবেশী বুড়োদের একটা আড্ডা বসে সামনের একটা রোঁয়া ওঠা পার্কে। প্রভাসবাবু সেখানে যাওয়া শুরু করলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার কথা শোনেন। ভাবেন এরা যেন কেমন। এদের জীবনে আর কোনও বৈচিত্র্য নেই, রোমাঞ্চ নেই। এরা সবাই বলিপ্রদত্ত কোনও পশুর মতো নিজেদের সঁপে দিয়েছে বার্ধক্যের হাতে! কখন মৃত্যু আসে খাঁড়া হাতে, তার অপেক্ষায়।

একসময় সন্ধে লাটাইয়ের সুতো ছাড়ে। একে-একে পার্কের বুড়োরা ঘরমুখো হয়। কিন্তু প্রভাসবাবু বসে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর এক বুক নিশ্বাস নিয়ে উৎফুল্ল মনে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাড়িতে তাঁর জন্য সদ্য কিনে আনা এক রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছে, এই ভেবে।

এ হেন সুখের দিনও একদিন ফুরোল। বই পড়তে বেশ কয়েকদিন ধরে কষ্ট হচ্ছিল। পাড়ার হরেন ডাক্তার জানালেন, ছানি হয়েছে—কিন্তু এখনই অপারেশানের অবস্থায় নেই। সময় লাগবে ছানি পাকতে।

প্রভাসবাবু পড়লেন ফাঁপরে। একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেননি অনেকদিন। এবার বেচারা বড় একা হয়ে পড়লেন। সারাদিন ব্যালকনির চেয়ারটায় বসে দূরের মানুষদের দেখা আর রাতে শুয়ে শুয়ে সিলিং-এর সাদা দেওয়ালের যেসব জায়গায়

নোনা ধরেছে তাদের নানা আকৃতির প্রাণী ভেবে ঘুমের অপেক্ষা...।

এর মাঝে বিকেলবেলা মাংকি ক্যাপ, চাদর-সহ রোঁয়া-ওঠা ত্রিকোণ পার্কে বুড়োদের সঙ্গে সময় কাটানো। রাত্রি ঘন হলে এখন আর ওঁর বাড়ি ফেরার জন্য মন ছটফট করে না। কারণ, বাড়িতে রোমাঞ্চে ঘেরা বৈচিত্র্য ওঁর জন্য আর অপেক্ষা করে না। মাঝে-মাঝে ওঁর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাঁদতে পারেন না। কেন, কে জানে। বুকের কাছটায় একটা ব্যথা অনুভব করেন। ভাবেন, এইভাবেই তিনি আর-পাঁচটা মানুষের মতো জরাগ্রস্ত হয়ে বৈচিত্র্যহীন এক মৃত্যুর দাস হবেন।

ভাবতে-ভাবতে হাত-পা শিথিল হয়ে যায়...। নিজেকে আবিষ্কার করেন নিজের চারতলার ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরের বিছানায়। বৈচিত্র্যহীনভাবে শুয়ে আছেন, আবার একটি বৈচিত্র্যহীন ভোরের অপেক্ষায়। সেই ভোর আবার একটি ম্যাড়মেড়ে রাত্রি আনবে। সে আবার আর একটি একইরকম ভোর। প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা...নাহ্!। এভাবে খামখেয়ালি মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে প্রভাসবাবুর আর ইচ্ছে করছিল না।

একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচে বলে বসলেন, 'আসলে এসো না! এত ভ্যানতাড়ার কী আছে, অ্যাঁ! আমি কি তোমার প্যায়ারের জামাই নাকি, যে সারাজীবন বসে থাকব, কবে তুমি আসবে? শালা শুয়ার!'

কেন যে তিনি এমন করলেন! ঘুমের চটকা ভাঙতে নিজেই সে-কথা ভেবে লজ্জা পেলেন।

তিনদিন পর প্রভাসবাবুকে কলকাতার বাসে-ট্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। বালি থেকে বালিগঞ্জ, টালা থেকে টালিগঞ্জ, সোদপুর থেকে খিদিরপুর, বিভিন্ন চায়ের দোকান, বাংলা মদের দোকান, চোলাইয়ের ঠেক, এ ধরনের সমস্ত জায়গাতেই দেখা গেল প্রভাসবাবু বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে চাপা গলায় কীসব বলে চলেছেন। কখনও তিনি সন্তোষজনকভাবে মাথা নাড়ছেন, কখনও বিমর্ষ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

এভাবে চলল টানা তিনমাস। এমনিতে প্রভাসবাবু বাড়িতে থাকলে ওঁর চারতলার ফ্ল্যাটের দক্ষিণের জানলাটা খোলা থাকে। এই তিনমাস বন্ধ ছিল। সেদিন দেখা গেল, জানলাটা খোলা। অর্থাৎ প্রভাসবাবু এখন বাড়িতেই।

তারপর অনেকদিন ধরে প্রভাসবাবুর বাড়িতে অনেক রাত অবধি আলো জ্বলতে দেখা গেল। প্রতিবেশীরাও খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কারণ বিপত্নীক বুড়োমানুষ, সমাজে ছেঁড়া পাপোশ-এর মতো। সেটা ভেজা না শুকনো—তাতে কার কী যায় আসে!

॥ ২ ॥

একটু বিপদেই পড়েছে আফতাব। আফতাব মানে আফতাব আখতার। বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে শরীরে মেদও লেগে গেছে। সারা মুখে বসন্তের দাগ, সারা শরীরে আরও উনচল্লিশটি দাগ। তার মধ্যে চারটি বুলেটের, বাইশটা বোমের স্প্লিন্টারের, আর বাকিগুলো ছড়ির। বিপদ সারাজীবনই তার প্রিয় বন্ধুর মতো পাশে-পাশে হেঁটেছে।

ভ্রূক্ষেপ করেনি আফতাব। কারণ এটাই তার কাজ। সে নিজে মানুষের মূর্তিমান বিপদ। তার জীবনে বিপদ থাকবে না, এ তো হতে পারে না! এ কথা মেনেই নিয়েছিল সে। কিন্তু এবারের বিপদটা একেবারে অন্যরকম। এই বয়েসে আর-একটি বিয়ে করা। প্রথম বউ রুকসানা, এবং যথাক্রমে পাঁচটি ছেলেমেয়ে। প্রথম ছেলের বয়স আঠাশ, ছোটমেয়ের বয়স পাঁচ। আর দ্বিতীয় স্ত্রী মুন্নি অষ্টাদশী। মাত্র একবছর হল তাকে নিয়ে আবার ঘর বেঁধেছে আফতাব।

বিপদ বেধেছে তিন ছেলে খুরশিদ, আলম আর কবীরকে নিয়ে। তারা এখন জোয়ান মদ্দ, তাদের শরীরে বইছে আফতাবের হিংস্র রক্ত। এরা আবার মা ঘেঁষা হয়েছে। ঘর চালানোর জন্য গত ছ'মাস আফতাব রুকসানাকে কোনও টাকা পাঠাতে পারেনি। দিনসাতেক আগে ছেলেরা এসে শাসিয়ে গেছে। এ মাসে টাকা না পাঠালে বেকসুর মায়ের বিরুদ্ধে সে যা পাপ করেছে, তার খেসারত দিতে হবে।

আফতাব তার তিন ছেলের কর্মকাণ্ডের কথাবার্তা কানাঘুষোয় শুনেছে। তাই একটু ভয়ে-ভয়েই আছে। ছেলেগুলো তার সত্যি-সত্যিই রত্ন হয়ে উঠেছে। একবছর আগে হলে মনে-মনে সে গর্ব অনুভব করত। কিন্তু কেন জানি না এখন সে ভয় পাচ্ছে। এদিকে কাজকর্মের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। কেউ জানে না, গত দু-বছর ধরে আফতাব পারকিন্‌সন্‌ রোগে ভুগছে। উত্তেজনা হলে হাত কাঁপে, হাওয়ায় দোলা বাঁশপাতার মতো। এ হাতে রিভলভার ধরা বা ছুরি ধরা বা টার্গেট স্থির করা নিতান্তই অসম্ভব। এখন তার দুই শাগরেদই ভরসা। কাল্লু আর মন্নু। কাজ করলে একটা ভাগ ওদেরও দিতে হয়। কারণ কাজটা মূলত ওরাই করে। আর বাকি টাকাটা মুন্নি বেগমের চাহিদা মেটাতেই খরচ হয়। আগের পরিবারে টাকা পাঠাবেই বা কী করে!

এ মাসে একটা কাজ হওয়া বড় দরকার। কারণ লোকাল থানার ওসিকে তার মাসিক পাওনা এক লাখ টাকা দিয়ে আসতেই হবে। এ টাকা তার গারদের বাইরে থাকার ক্ষতিপূরণ। যা সে গত কুড়িবছর দিয়ে আসছে। বছর বদলায়, ওসিও বদলায়, কিন্তু এ নিয়ম অনড়। এটা ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিল এলাকার প্রাক্তন এম-এল-এ আবদুল বাশার। কিন্তু এ মাসে একলাখ টাকা দিলে হাতে তো কিছুই থাকবে না!

বসে-বসে এসবই ভাবছিল আফতাব। তখনই শব্দ করে মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে।

সে ফোনটা তোলে।

হ্যালো।—ওপাশ থেকে চাপা স্বরে একজন বলে,—আমি কি আফতাব আখতারের সঙ্গে কথা বলছি?

আফতাব বলে,—হ্যাঁ, কী চান?

ওপাশ থেকে একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ ভেসে আসে,—আপনি আমার একটা কাজ করে দেবেন? তার জন্য আমি আপনাকে দু লাখ টাকা দেব।

আফতাবের কান খাড়া হয়ে ওঠে। বলে,—কী কাজ?

ওপাশ থেকে একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মানুষটা বলে,—একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে—।

আফতাবের মনে অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠল! অনেক সংশয় জমা হতে শুরু করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—রং নাম্বার। এবং ফোনটা কেটে দিল।

তারপর মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে রিসিভ্‌ড কল লিস্টে নাম্বারটা দ্যাখে। আরে! এটা তো এ দেশেরই নাম্বার নয়! শালা পুলিশের কোনও চাল নয় তো? নাকি কেউ ইয়ার্কি মারছে—?

টাকার অঙ্কটা নেহাত কম নয়। এসবই ভাবছিল আফতাব, এমন সময় আবার ফোনটা বেজে উঠল। একই নাম্বার থেকে।

আফতাব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফোনটা তোলে।

ওপাশের মানুষটা বলে,—ফোনটা কাটবেন না। আমি পুলিশের লোক নই বা রসিকতাও করছি না। আমি আপনার সম্পর্কে মোটামুটি সব তথ্যই জানি!

বলে দশমিনিট ধরে আফতাবের কুড়িবছরের কর্মকাণ্ডের মোটামুটি একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেল।

আফতাব স্তম্ভিত।

লোকটা এবার বলল,—আপনার যদি এখনও মনে হয়, আমি আপনার সময় নষ্ট করছি, তা হলে বলব আপনার বাড়ির সামনে যে লাল রং-এর পোস্টবক্সটা আছে তার ভেতর আপনি হাত দিলেই একটা বড় খাম পাবেন। তাতে পঞ্চাশহাজার টাকা আছে। সেটা আপনি রাখতে পারেন। অগ্রিম হিসেবে। বাকি কথা পরে বলছি।

বলেই লোকটা ফোনটা কেটে দিল।

আফতাব বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবে। ফোনে তাকে অনেকেই সুপারি দিয়েছে, কিন্তু তারা সবাই চেনা লোক ছিল। এ একবারে অভিনব অভিজ্ঞতা।

একসময় আফতাব ভাবে, একবার ডাকবাক্সটা দেখে এলে তো হয়! বাইরে

বেরোয়। একটু পরে আফতাব এসে ঘরে ঢোকে। হাতে একটা মোটা বড় খয়েরি রং-এর খাম।

খামটার ভেতর হাত ঢোকায়। ওর হাতে উঠে আসে পাঁচশো টাকার একটা বান্ডিল। এইসময় আবার ফোনটা বেজে ওঠে। ও ফোনটা তোলে।

এবার বিশ্বাস হয়েছে? আমি সত্যিই আপনার সাহায্য চাই।—ওপাশের গলা ভেসে আসে।

আফতাব বলে,—আপনি কে?

ওপাশ থেকে বলে, —আমি কে, সেটা আপনি কোনওদিনই জানতে পারবেন না। যে ফোন নাম্বারটা দেখছেন, এটা দুবাই-এর নাম্বার। আমি দুবাই-এর সিম কার্ড ভরে আপনাকে ফোন করছি। আপনি শুধু আমার কাজটা করে দিন। আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেব।

আফতাব বলে,—কিন্তু কাজ হয়ে গেলে আপনি যদি বাকি টাকা না দেন?

লোকটা বলে,—আপনিও তো পঞ্চাশহাজার টাকা নিয়ে কাজটা নাও করতে পারেন।

আফতাব কিছু বলতে যাচ্ছিল, লোকটা বলে ওঠে,—বেশ। আমি কাল আবার একইভাবে আরও পঞ্চাশহাজার টাকা রেখে আসব। বাকি টাকা কাজ হয়ে গেলে...রাজি?

আফতাব মনে-মনে ভাবে, আজকাল যা অবস্থা হয়েছে, কুড়ি-পঁচিশহাজারে লোকে সুপারি নিয়ে নিচ্ছে! একলাখ সেখানে অনেক। যদি কাজের পরে বাকি টাকা নাও পায়, এমনকিছু লোকসান হবে না।

আফতাব বলে,—টার্গেটটা কে, সেটা তো জানতে হবে!

ওপাশ থেকে বলে,—সে তো বটেই। আপনাকে আর-একটু কষ্ট করতে হবে। আপনি আবার ডাকবাক্সটায় হাত দিন। এবার পাবেন একটা লাল রং-এর বড় খাম।

বলেই ফোনটা কেটে দিল।

আফতাব আবার বেরোল। ফিরল লাল রং-এর একটা খাম হাতে। খামটা খুলল। একটা বড় ছবি ওর হাতে উঠে আসে। পিছনে নাম-ঠিকানা লেখা।

ফোন ফের বেজে উঠল।

—পেয়েছেন নিশ্চয়ই?

আফতাব ছবিটার দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলে—এ তো একটা বুড়ো।

ওপাশের লোকটা বলে,—একজ্যাকটলি! তবে শুধু বুড়ো নয়, বুড়ো ঘুঘু। এই বুড়োটাই আমার পয়লা নম্বরের শত্রু। এটাকে নিকেশ করুন।

আফতাব বলে,—দশদিনের মধ্যে আপনার কাজ হয়ে যাবে।

ফোনটা রেখে দিল।

॥ ৩ ॥

প্রথম দু দিন প্রভাসবাবু কিছু আঁচ করতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় দিনে বুঝতে পারলেন, ওঁকে ফলো করা হচ্ছে। একটা বেঁটে মতো লোক, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। প্রভাসবাবু যেখানেই যাচ্ছেন, ব্যাঙ্কে বা দোকানে—লোকটা একটা দূরত্ব রেখে প্রভাসবাবুকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

একদিন প্রভাসবাবু আঁতকে উঠলেন। সন্ধেবেলা রোঁয়া ওঠা পার্কে সব বুড়ো বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর উনি যথারীতি একা একা বসে ছিলেন।

হঠাৎ দেখলেন, নির্জন পার্কের রেলিং-এর ওপর লোকটা পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

প্রভাসবাবুর হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। ভাবলেন, দৌড় মারবেন। কিন্তু পা দুটো পাথরের মতো মাটি আঁকড়ে ধরে রইল।

লোকটা লাফ মেরে রেলিং থেকে নামল! ডানদিক, বাঁ-দিক দেখে নিল। তারপর ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল প্রভাসবাবুর বেঞ্চটার দিকে।

একটা প্রচণ্ড আতঙ্কে প্রভাসবাবুর বুকটা ফেটে যেতে চাইল।

—আরে, বুড়াবাবু! এত ঠান্ডামে বসিয়ে-বসিয়ে কী করছেন?

প্রভাসবাবুর ডানদিক থেকে কথাটা ভেসে এল। তাকিয়ে দেখলেন গয়লা রামদীন। কাঁধে বাঁক, জল নিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত দুধে মেশাবে। এই রামদীনেরই দুধ নেওয়া তিনি বন্ধ করেছিলেন, দুধে জল মেশায় বলে। এখন রামদীনকেই ওঁর জল কাঁধে ভগীরথ বলে মনে হল।

প্রভাসবাবুর চোখে জল এসে গেল। অনেক কষ্টে বললেন,—বাবা, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে? পা দুটোয় বড় ব্যথা।

রামদীন এগিয়ে এসে প্রভাসবাবুর একহাত এক কাঁধে তুলে নেয়। তারপর ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে।

প্রভাসবাবু আড়চোখে দেখলেন, ফলো করা লোকটা আস্তে-আস্তে পিছু হটছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লোকটার চোখদুটো চকচক করছে। শিকার ফসকে গেলে হায়েনার যেমন হয়!

॥ ৪ ॥

মুখোমুখি বসে আফতাব ও মন্নু। সামনে একটা রঙিন বোতল। প্লেটে বাদাম। মন্নু বলে,—ওস্তাদ, লোকটা বোধহয় বুঝতে পেরে গেছে যে, আমি ওকে খাল্লাস করতে চাইছি।

আফতাব চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে। শিকারের অজান্তে শিকার করা সহজ। কিন্তু সর্তক শিকারকে শিকার করা একটু কঠিন।

আফতাব বলে,—কিন্তু আমার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে। দশদিনের মধ্যে হাতে মাত্র দু দিন আছে। এ করলে কি ব্যাবসা চলে?

মন্নু এক চুমুকে গ্লাস প্রায় শেষ করে বলে ওঠে,—কিন্তু ওস্তাদ তুমি জানো না, মালটা বহুত সেয়ানা। তিনদিন আগে পার্কের মধ্যে শালাকে একা পেয়ে গেছিলাম। সেদিনই টপকে দিতাম। কিন্তু কোত্থেকে শালা একটা তাগড়া লোক চলে এল। তার পরদিন থেকে কী হল শোনো—!

বলে সে আর-এক চুমুক গলায় ঢালে,—আমি তো বিকেল থেকে পোজিশান নিয়ে পার্কে দাঁড়িয়ে। কখন সন্ধে হবে! ওমা, দেখি বুড়োটা একদল পাড়ার ছেলে নিয়ে পার্কে বাঁশ পুঁতে নেট লাগিয়ে বড় বড় আলো দিয়ে রাতে ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করছে! আমি তো চমকে দোদোমা। শালা সন্ধেবেলা দেখি, সারা পার্কে ঝাঁ চকচকে আলো। আর বুড়োটা ভলিবল কোর্টের পাশে বেঞ্চে বসে ছেলেদের উৎসাহ দিচ্ছে। ভাবো, অত আলোয় বিশ-পঁচিশটা ছেলের মধ্যে আমি শালা কী করে আমার কাজটা করি—! তবু ওয়েট করলাম, খেলা কখন শেষ হবে। ওমা! রাত ন'টা নাগাদ চার-পাঁচটা ছেলে বুড়োটাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিল। খেলা তখনও চলছে।

অস্থিরভাবে আফতাব বলে, কিন্তু মন্নু, কিছু একটা কর! একটা বুড়োকে খাল্লাস করতে যদি তোদের এই অবস্থা হয়!

মন্নু বিড়বিড় করে,—বুড়ো নয়! বুড়ো ঘুঘু।

আফতাবের মনে পড়ে গেল, ফোনের লোকটাও তাই বলেছিল...।

॥ ৫ ॥

সারাদিনে প্রভাসবাবু বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোন না। বিকেল থেকে রাত অবধি পার্কে থাকা। তাও একদল জোয়ান ছেলেদের ঘেরা পাঁচিলের আড়ালে। তাতে একটু খরচা হয়েছে যদিও। নেট-বল আর আলো কিনে দিতে হয়েছে। কিন্তু সুরক্ষার ব্যবস্থাটাও পাকা হয়ে গেছে। তা ছাড়া বুড়োদের থেকে এই ছেলেগুলোর সঙ্গই অনেক ভালো লাগছে ওঁর। ইদানীং হাঁটুর ব্যথাটা প্রায় নেই বললেই চলে।

অসুবিধা হল আজ। পোস্ট অফিসে রাখা টাকা সংক্রান্ত একটি অফিসিয়াল ব্যাপারে ওঁকে একবার ধর্মতলা জিপিও-তে যেতেই হবে। গেলেনও। ইচ্ছে করেই ভিড় বাসে করে। কিন্তু সরকারি অফিস, কাজটা শেষ হতে হতে পাঁচটা বেজে গেল। আর শীতকালে পাঁচটা মানে তো অন্ধকার!

উনি বুঝতে পারছিলেন, ওঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছিল, সে কোথাও আছে

আশেপাশেই।

অফিস ফেরতা মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে উনি ধর্মতলার মোড়ে এলেন।

মসজিদের সামনে অনেক পসরা নিয়ে দোকানিরা বসে। এপারে দাঁড়িয়ে প্রভাসবাবু ভাবছিলেন, একটা মাফলার কিনবেন কি না। এমন সময় দেখলেন, একটু দূরে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে। চোখাচুখি হওয়াতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। একটা প্রচণ্ড আতঙ্কে প্রভাসবাবু কিছু না দেখেই আচমকা একটা নর্থ ক্যালকাটাগামী বাসে উঠে পড়লেন। অবশ্য উনি নর্থ ক্যালকাটাতেই থাকেন। টালার ট্যাঙ্কের পিছন দিকটায়।

প্রচণ্ড জ্যাম পেরিয়ে বাসটা যখন শ্যামবাজারে এল, তখন তিনি জানলেন বাসটা সোজা ডানলপে চলে যাবে। অথচ ওঁর বেলগাছিয়ার পরের স্টপেজে নামলেই সুবিধে।

শ্যামবাজারে তখনও অনেক লোক। উনি নেমে পড়লেন। দেখলেন গেটের বাইরে সেই লোকটাও ঝুলছিল। ওঁকে নামতে দেখে সেও নেমে পড়েছে।

প্রভাসবাবু ঘামতে শুরু করলেন। এখন যে-কোনও বাসে উঠে বা মিনিবাসে উঠে ওঁকে নামতে হবে তো সেই বেলগাছিয়ার পরের স্টপ ত্রিকোণ পার্কে! সেখান থেকে বাঁ-দিকে ওঁর বাড়ি, হাঁটা পথে প্রায় দশ মিনিট।

জায়গাটা ভীষণ নির্জন। ল্যাম্পপোস্টে একটাও আলো নেই। থাকলেও খামখেয়ালি। এলাকার মানুষ আবার সামনের রিকশা স্ট্যান্ডটাও তুলে দিয়েছে। অসামাজিক কাজ-টাজ হয় বলে। এবার—?

উনি হাঁটতে লাগলেন বেলগাছিয়া ব্রিজের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে উনি চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কাছে। ঘড়িতে দেখলেন সাড়ে আটটা বাজে। পিছনে না তাকিয়েও দিব্যি বুঝতে পারছেন, সে আসছে। আরজিকর হাসপাতালের সামনে এসে উনি দেখলেন সামনে বেলগাছিয়া ব্রিজ। খা-খা করছে। ওটা তো অনুসরণকারীর স্বর্গরাজ্য! ভাবলেন তিনি। হঠাৎই তারপর হাসপাতালের এমারজেন্সির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

তখন প্রায় রাত ন'টা বাজে।

হাসপাতালের মধ্যে অনেক লোক। কেউ কেউ অলসতার জাবর কাটছে, আবার কেউ কেউ উদ্‌বিগ্নভাবে পায়চারি করছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম জটলা।

প্রভাসবাবু দেখলেন, এটাই ঠিক জায়গা! এখানে তিনি একা হবেন না। তিনি এক একটা জটলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। এরকম করতে করতে রাত সাড়ে দশটা বাজিয়ে দিলেন।

এদিকে হাসপাতালের চত্বরও খালি হতে শুরু করেছে। দশ বারোটা লোক ছাড়া সবাই চলে গেছে। তাদেরও মতিগতি ভালো ঠেকছে না। বোধহয় খেতে টেতে যাবে। তারপর গোটা চত্বরই শুনশান। চার পাঁচজনের একটা দল নিজেদের মধ্যে

কথা বলতে-বলতে বাইরের গেটের দিকে এগোতে থাকে। প্রভাসবাবু তাদের পিছন-পিছন চলতে থাকেন। বাইরে গেটের সামনে লোকটাকে দেখতে পান।

লোকটা ওঁকে দেখতে পায়নি।

লোকগুলো রাস্তা ক্রস করে। প্রভাসবাবুও তাই করেন। লোকগুলো তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলে আলাদা হয়ে গেল।

হঠাৎই এবার লোকটা আর প্রভাসবাবুর মধ্যে আর কেউই রইল না! মাঝখানের রাস্তা আর ট্রাম লাইনটা ছাড়া। লোকটা প্রভাসবাবুকে দেখতে পেয়ে গেছে। প্রভাসবাবু চট করে ঘুরে সামনের ওষুধের দোকানটায় ঢুকে পড়েন।

দোকানদার প্রশ্ন করে,—কী চাই?

॥ ৬ ॥

মন্নু অনেকক্ষণ হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই সামনে বুড়োটাকে দেখে মুহূর্তে সতেজ হয়ে ওঠে।

—এবার তুমি কী করবে শালা? বাড়ি তো তোমায় ফিরতেই হবে! ত্রিকোণ পার্ক থেকে ফ্ল্যাট। সেই পথে আজ তোমায় কে বাঁচাবে, চাঁদু?

মন্নু রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে দ্যাখে, একটা ডবল ডেকার আসছে। তেত্রিশ নম্বর বাস...সম্ভবত লাস্ট বাস...ডিপোয় ফিরছে। পাইকপাড়া।

মন্নু একটু দাঁড়িয়ে যায়। বাসটাকে যেতে দেয়।

বাসটা চোখের সামনে থেকে সরে গেলে মন্নু আচমকা দেখতে পেল, বুড়োটা তিরবেগে ছুটছে বাসটাকে ধরবে বলে। মন্নু হকচকিয়ে গেল। বুড়ো মানুষকে এত জোরে ছুটতে সে কখনও দেখেনি। সংবিত ফিরে পেতে পেতে সে দেখতে পায়, বুড়োটা ছুটন্ত বাসের সামনের গেটে উঠে পড়েছে। পাদানির ওপরে বসেও পড়েছে। বোধহয় শালার হাঁপ ধরেছে।

মন্নু ছুটতে থাকে।

বাসটা এবার স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনে বেলগাছিয়া ব্রিজ। বাসটা ব্রিজের দিকে গর্জন করে এগোচ্ছে! মন্নু ছুটছে, দেখতে পাচ্ছে বুড়োটা পাদানি থেকে উঠে বাসের ভেতরে ঢুকছে। মন্নুকে দেখছে ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে। বাসে একটাও লোক নেই। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। কন্ডাকটর বোধহয় ড্রাইভারের কেবিনে—এই বাসেই যা করার করতে হবে।

মন্নু ছুটছে। সামনের গেটের একতলাটা দেখতে পাচ্ছে। সে হাত বাড়ায়। এই হাতের ওপরে তার অগাধ আস্থা। মানুষ খুন করতে তার অস্ত্র লাগে না। হাতের চাপেই ঘাড় মটকে দেয়। বাসের মধ্যে বুড়োটাকে এক্ষুনি সে তাই করতে যাচ্ছে।

আর দু-কদম!

মন্নু গতি বাড়ায়...হাতের আঙুলে হাতলটা ধরা যাচ্ছে...হাতলটা ধরে ফ্যালে। এবার একটা লাফ!

কিন্তু কী হল, কীরকম গোলমাল হয়ে গেল মন্নুর! শূন্যে লাফ মেরে ভাসতে ভাসতে তার মনে হল, বাসটা...হাতলটা...বুড়োটা যেন সময়ের মতো হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে।

আর কিছু ভাবার সুযোগ পায়নি মন্নু। ডবল ডেকারের পেছনের চাকা মন্নুর কোমরের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিল।

দশমিনিট পরে প্রভাসবাবুকে রোঁয়া ওঠা ত্রিকোণ পার্কের নির্জন রাস্তা দিয়ে মন্থর গতিতে বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। রুমাল দিয়ে উনি ভীষণভাবে হাত মুছছিলেন। তারপর রুমালটা একটা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আরও একটা জিনিস আর্বজনার স্তূপে ফেলে দিলেন। সেটা কুড়িমিনিট আগে ওষুধের দোকান থেকে কেনা একটা বড় ভেসলিনের কৌটো। যেটা এখন খালি।

॥ ৭ ॥

ঘটনাটা ঘটার চারদিনের মাথায় প্রভাসবাবুর বাড়িতে হঠাৎ মানিক চন্দ্রের আবির্ভাব। মানিক প্রভাসবাবুর ভাইপো। ছেলে আমেরিকা চলে যাওয়ার পর প্রভাসবাবুরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় একা হয়ে পড়েছিলেন। মানিক সেসময় ওদের বড় কাছে এসে পড়েছিল। সময়ে অসময়ে ওদের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমনিতেই মানিককে প্রভাসবাবু ছোট থেকেই একটু বেশি স্নেহ করতেন। বৃদ্ধ বয়েসে ছেলের প্রবাস গমন মানিয়ে নিতে ওঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হত, যদি না মানিক তখন ওদের পাশে থাকত। দীপা মারা যাওয়ার পর মানিক এই প্রথম ওঁদের বাড়িতে এল। তবে এ মানিকের সঙ্গে আগের মানিকের চেহারার কোনও মিল নেই।

সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা পোশাক, অবিন্যস্ত চুল। চোখ দুটোয় আগের সারল্য আর নেই। বরং চোখ দুটোয় ক্রূরতা ছেয়ে আছে। সব সময় যেন ঘুরছে।

ঠিক কেন যে মানিক এল, সেটা প্রভাসবাবু বুঝতে পারলেন না। অসংলগ্ন কিছু কথাবার্তা বলে মানিক হঠাৎই চলে গেল। মানিক থাকে চন্দননগরে। বিয়ে-থা করেনি। একটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ওর বাপ-মা মারা গেছে বহুদিন।

মানিক উশখুশ করতে করতে হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কাকাবাবু, আজ যাই। অফিসের কাজে এদিকে এসেছিলাম—দেখে গেলাম আপনি কেমন আছেন।

এটা গেল সকাল ন'টার কথা।

বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎই কলিংবেল। তিনজন লোক দরজায়। প্রভাসবাবু দরজা খোলেন।

—আপনি প্রভাসবাবু? মানিক দাস মজুমদারের কাকা?

প্রভাসবাবু মাথা নাড়েন।

একজন লোক বলে,—একটু ভেতরে আসতে পারি। জরুরি কথা আছে।

ভেতরে ড্রইংরুমের সোফাতে লোকগুলো বসল। একজন বলল,—আমরা ভবানী ভবন থেকে আসছি। আপনার ভাইপো মানিকবাবু ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় দু লাখ টাকা চুরি করে ফেরার।

তারপর লোকগুলো কী বলে গেল, প্রভাসবাবুর কানে কিছুই ঢুকছিল না। একটা কথাই উনি ভাবছিলেন ঃ মাত্র দু-লক্ষ টাকার জন্য কেউ এত বড় ঝুঁকি নেয়!

প্রভাসবাবুর সারাজীবনের রোজগার এবং এই ফ্ল্যাট সবমিলিয়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার একমাত্র ওয়ারিশ তো মানিকই! দু-বছর আগে নিজের হাতে প্রভাসবাবু সে-উইল বানিয়ে ছিলেন। সেখানে দু-লাখ টাকার কী এমন দরকার হয়ে পড়ল?

লোকগুলো একসময় চলে গেল। কিন্তু সারাদিন ওঁর মাথায় একই প্রশ্ন ঘুরতে লাগল ঃ কেন? কেন? কেন? কী এমন এমারজেন্সির জন্য মানিক ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙে ফেরার হল?

॥ ৮ ॥

সাধারণত দুপুরবেলার দিকে প্রভাসবাবুদের ফ্ল্যাটবাড়িটা খালিই থাকে। আটটা ফ্ল্যাটের সাতটা বিক্রি হয়ে গেছে। বাকিগুলোর মধ্যে দুটো তালা বন্ধ। দুজন প্রবাসী ফ্ল্যাট কিনে তালা দিয়ে রেখেছেন। ন'মাসে ছ'মাসে আসেন। বাকি পাঁচটায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের চারজন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন। তাঁদের বাচ্চাদের স্কুল। আর একতলায় বসাকবাবু প্রভাসবাবুর চেয়ে অনেক বৃদ্ধ, নড়াচড়াই করতে পারেন না। ফ্ল্যাটবাড়ির মূল দরজার বাইরে যদিও বড় বড় করে লেখা আছে সেল্‌সম্যান বা গার্লদের প্রবেশ নিষেধ, তবুও মাঝে মাঝে দু-একজন এসে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

সেদিনও প্রভাসবাবুর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাল কলিংবেল। অপরিমিত রাগ সম্বল করে প্রভাসবাবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ম্যাজিক হোলে চোখ রাখলেন। একজন কালো কোলো মানুষ ওপারে। তার বুকপকেটজুড়ে অনেক খাম, কাঁধে একটা ব্যাগ। তার মুখ উপচে অনেক ঘাম। বুকপকেটে পেন, ক্লিপ দিয়ে

আটকানো। হাতে একটা খাম।

প্রভাসবাবু নিশ্চিন্ত হলেন, পোস্টম্যান। কারণ, পোশাক খয়েরি।

দরজা খুলবেন বলে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হঠাৎই 'পোস্টম্যান অলওয়েজ রিংস টোয়াইস' গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। উনি এবার খুঁটিয়ে দেখবেন বলে আই-হোলে চোখ রাখলেন। লোকটার চেহারায় পোস্টম্যানের ছাপোষা বিরক্তি নেই। বরং দু-চোখে দ্রুত কম্পমান এক উত্তেজনা রয়েছে।

আবার বেল বাজাল লোকটা। এবার লোকটার চোখ আর প্রভাসবাবুর দরজায় নেই। তার চোখ ঘুরছে একবার উলটো দিকের ফ্ল্যাটের দরজায়। আর-একবার সিঁড়ির নীচের দিকে।

শঙ্কাগ্রস্ত প্রভাসবাবু আই-হোলে নজর আরও সাবধানে নিবদ্ধ করেন।

লোকটার কাঁধের ব্যাগটার দিকে তাকালেন। ব্যাগটার খোলা মুখ দিয়ে অনেক চিঠির খাম উঁকি মারছে। কিন্তু ব্যাগটার তলার দিকটা অনেক ভারী! কেন? কাগজের চাপে ব্যাগটা এতটা তো ঝুলে পড়বে না। বা কোনও পার্সেলের চাপেও নয়। কারণ, কোনও পার্সেল আড়াই ইঞ্চি মোটা ব্যাগের মধ্যে এত চাপ সৃষ্টি করতে পারে না, যা পোস্ট করে পাঠানো যায়। যদি না সেটা কোনও ভারী ধাতুর হয়।

দরজা খোলার জন্য এগিয়ে যাওয়া হাতটা প্রভাসবাবু এবার টেনে আনলেন স্ববশে।

কিন্তু চোখ নিবদ্ধ রইল আই হোলে।

প্রভাসবাবুর ফ্ল্যাটের মূল দরজায় কোলাপসিব্‌ল গেট নেই। দরজাটাই ভীষণ মজবুত। তাই বাড়তি খরচা করেননি উনি। দরজায় গোদরেজের একটা লক আছে। সেটা ডবল লক। এতে সুবিধে একটাই। দরজা লক করা মানুষটা ভেতরে না বাইরে, তা বোঝা মুশকিল।

লোকটা আবার বেল বাজায়। তারপর...কিছুক্ষণ পরে, বিরক্ত হয়ে বাড়িতে কেউ নেই ভেবে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়।

প্রভাসবাবু ধীরে ধীরে ঘরে এসে ওঁর খাটে শয়ান হন। মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্নের সাইক্লোন! লোকটা যদি পোস্টম্যান হয় তা হলে নীচে ওঁর যে-লেটার বক্স আছে তাতে কেন চিঠিটা রেখে গেল না?

আর যদি রেজিস্ট্রি চিঠি হয় তা হলে ওর হাতের খামে একটা কাউন্টার পার্ট থাকত। সেটা লোকটার হাতে তো ছিল না! শুধু একটা সাদা খাম। তাতে যা লেখা ছিল কালো অক্ষরে সেটা মাত্র এক ইঞ্চি। অথচ শুধু যদি নামই লেখা থাকে তা হলেও দু-ইঞ্চি মিনিমাম জায়গা লাগবে। 'প্রভাস কুমার দাস মজুমদার।'

নির্বান্ধব আত্মীয়হীন ওঁর মতো মানুষকে কে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠাবে? ছেলে? না সে সম্ভাবনা জিরো। কারণ, ছেলে-বাবার সম্পর্ক ভালো নয়। আর একই পাড়ার

প্রতিবেশী মিত্রবাবুর ছেলে ডালাসে প্রভাসবাবুর ছেলের প্রিয় বন্ধু। সুতরাং ছেলের সমস্ত হালফিল খবরও প্রভাসবাবুর নখদর্পণে। এমনকী ছেলের পাইল্‌স অপারেশন অবধি!

সুতরাং এ কার চিঠি হতে পারে? নাকি...?

পরদিন সকালে প্রভাসবাবুকে দেখা গেল স্থানীয় পোস্টঅফিসে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওঁর নামে কোনও চিঠিই আসেনি, যেটা ফেরত আসতে পারে।

॥ ৯ ॥

কাল্লু কলিংবেলটা বাজাল।

শুয়ারের বাচ্চা বুড়োটা যদি আজও দুপুরে বাড়ি না থাকে, তা হলেই পুটকি জ্যাম! আফতাবভাইকে মুখ দেখানোর আর কোনও জায়গাই থাকে না।

কারণ, তিন দিনে কাজ সেরে ফিরে আসবে, এ-কথা ড্রিঙ্ক করে অন্তত আঠাশবার বলে ফেলেছে সে আফতাবভাইকে। সে মন্নুর মতো আতাক্যালানে নয়, সেকথাও অন্তত পঁচিশবার বলেছে। কিন্তু এ-বুড়োটা দুপুরে কোথায় মারাতে যায়? টানা মিনিটতিনেক বেল বাজিয়ে কাল্লু সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। আজও শালা কোথায় দুপুরে টোংকাবাজি করে বেড়াচ্ছে, কে জানে! এ কথা বিড়বিড় করতে-করতে...।

কিন্তু সে জানতেও পারল না, দরজার ওপারে আই-হোলে চোখ রেখে একজন বৃদ্ধ তার মুখের সমস্ত অভিব্যক্তি লক্ষ করেছে।

॥ ১০ ॥

এরপর দুটো দিন ছিল শনি আর রবি। প্রভাসবাবু জানতেন, লোকটা এ দু-দিন আসবে না, কারণ ফ্ল্যাটে সবারই ছুটি। এ দু-দিন উনি অনেকগুলো কাজ সেরে রাখলেন। দোকান থেকে একটা বাটালি কিনে আনলেন। হাতুড়ি বাড়িতেই ছিল।

দীপা বেঁচে থাকাকালীন, বাড়িতে তখনও জেনারেটর আসেনি—লোডশেডিং-এ প্রাণ ওষ্ঠাগত হত। কলিংবেল কাজ করত না। তাই দীপা একটা মেটালের কড়া কিনে এনেছিল। কলিংবেল কাজ না করলে কড়া নাড়লে যাতে ভেতর থেকে শোনা যায়।

দরজার ওপরদিকে সেটা লাগানো হয়েছিল। একজন মহিলার আবক্ষ একটি ছোট্ট মূর্তি, গলায় একটি মালা। সেটাই কড়া।

শনিবার দিন সারা সকাল ধরে বাটালি দিয়ে উনি ভেতর থেকে দরজা চেঁছে কড়ার এক্সটেনশন দুটো পেরেক অবধি পৌঁছে গেলেন। আগে পেরেক দুটো দেখা যাচ্ছিল না, এখন চাঁছার ফলে দেখা যাচ্ছে, এবং ধরাও যাচ্ছে। এরপর কলিংবেলটা ডি-অ্যাক্টিভেট করলেন, যাতে ওটা আর না বাজে।

রবিবার দিন উনি খাটের নীচ থেকে জং ধরা, অব্যবহারে জীর্ণ, ইলেকট্রিক ইস্ত্রিটা বের করলেন। তারপর ইস্ত্রির সঙ্গে জোড়া তারটা খুলে ফেললেন। প্লাগ পয়েন্টসমেত তারটা রেখে ইস্ত্রিটা আবার খাটের তলায় পাচার করে দিলেন।

তারপর, সোমবার সকাল থেকে, শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা।

সময়-ঘড়ির কাঁটা যেন হিমালয়ের মতো। নড়তেই চায় না। সকাল পাঁচটায় ঘুম ভেঙেছে প্রভাসবাবুর। এখন সবে ন'টা। এর মধ্যে উনি প্রায় দেড়শোবার ঘড়ি দেখে ফেলেছেন।

॥ ১১ ॥

কাল্লুর ঘুম ভেঙেছে সকাল পাঁচটায়। সাধারণত রাতে বেশি মদ খেলে সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায় ওর। তারপর বিশ্রী একটা মাথা ধরা সারাদিন আচ্ছন্ন করে রাখে। তা হলে আজ ওর সকালে ঘুম ভাঙল কেন? কাল তো সে মদ ছোঁয়ওনি। কারণ, সে কাল রাত্রে নিজের মেয়ে মুন্নির সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। মুন্নির মা অনেক দিন হল অন্য মানুষের সঙ্গে ঘর করছে। মুন্নিকে সঙ্গে নিয়ে গেছে সে।

অপদার্থ লোকটার কাছে তার রোগে ভোগা মেয়েটাকে সে রাখতে চায়নি। কাল্লু কিছু বলেনি, শুধু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করেছিল। তার মন চাইছিল, সে ফরজানার পায়ে পড়ে যায়। তাকে অনুনয় করে, না যাওয়ার জন্য।

কিন্তু কেন জানি না, শরীরটা পাথরের মতো মাটি আকড়ে দাঁড়িয়েই ছিল, যতক্ষণ না ওরা ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে প্রায় বছরদুয়েক হয়ে গেল।

আনোখেলাল লোকটা খারাপ না। ফরজানার সঙ্গে এখন ঘর করে। একটা দোকানে চাকরি করে। মুন্নিকেও ভালোবাসে। মাঝে-মাঝে তাড়ির দোকানে আনোখের সঙ্গে কাল্লুর দেখা হয়—দুজনে সুখদুঃখের কথা বলে। আনোখে বলেছিল, আমার খোলিতে চলে আসবি। মুন্নি তো তোরই মেয়ে! আসল বাপ তো আসলি বাপই হয়!

তারপর থেকে কাল্লু মাঝে মাঝে আনোখের ঝুপড়িতে যেত।

মেয়ে তো প্রথমদিন বাপকে দেখে কেঁদেকেটে একসা। প্রচুর আদর করেছিল তাকে কাল্লু। কাঁদতে কাঁদতে কাল্লুর চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসময়

মুখ তুলে দেখেছিল, ঘরের কোণে ফরজানা দাঁড়িয়ে। মুখে ওড়না ঢেকে সেও কাঁদছে।

কাল্লুর বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। তা হলে কি আজও...ফরজানা ওকে একদম ভুলে যায়নি!

তারপর থেকে সপ্তাহে একদিন হলেও কাল্লু মেয়ের কাছে যেত। চলে আসার আগে ফরজানা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দু-তিনটে রুটি আর আচার কাল্লুর সামনে রেখে চলে যেত ঘরের কোণে। প্রথম দিন সে খেতে চায়নি। কিন্তু তার পাঁচবছরের রোগা-ভোগা মেয়েটা তার গলা জড়িয়ে বলে ওঠে, খা লে না, বাপু। কাল্লুর কান্না গলার কাছটায় আটকে যায়। ঘরের কোণ থেকে ফরজানার চাপা গলা শোনা যায়, খা লিজিয়ে না।

কাল্লু কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই সে আবিষ্কার করে, সে খেতেও শুরু করছে। সেই থেকেই ওর মাথায় একটি নতুন ভাবনার উদয় হয়।কিন্তু কিছুতেই সে সেটা ফরজানাকে বলে উঠতে পারছে না।

আসলে সে একটা বড় কাজের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা বড় কাজ মানেই অনেকগুলো টাকা। তারপর...।

কাল রাতে সে মেয়ের কাছে যখন গেল আনোখে তখন বাড়িতেই ছিল। কাল্লুকে দেখে রোজকার মতো ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে যায়।

কাল্লু মেয়ের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ঘরের অন্য প্রান্তে, যেখানে ফরজানা খাবার বানাচ্ছে। একসময় অনেক সাহস সঞ্চয় করে সে উঠে দাঁড়ায়।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে ফরজানার সামনে চলে যায়।

ফরজানা উঠে দাঁড়ায়।

কাল্লু ফরজানার চোখের দিকে তাকিয়ে একনিশ্বাসে বলে ফেলে, চল, আমরা আবার গ্রামে ফিরে যাই।

বলেই সে আশা করছিল, একটা অশান্তি হতে পারে। কিন্তু দ্যাখে, ফরজানা তার চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল্লুর হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকে। সে বুঝে যায়, প্যার আভি ভি জিন্দা হ্যায়।

সে দ্রুতপায়ে মেয়ের কাছে যায়। মেয়ের কপালে একটা চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেরিয়ে দেখতে পায়, দাওয়ার পাশে আনোখেলাল মাথা নীচু করে বসে আছে। সে সবটাই শুনেছে। আনোখের জন্য কাল্লুর দুঃখ হল। কিন্তু একটা নিষ্ঠুর বিজয়-উল্লাসকেও সে আটকাতে পারছিল না। তাই হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দেয়।

দুপুর দুটো। কাল্লুকে কাঁধে চিঠির থলিটা নিয়ে ত্রিকোণ পার্কের সামনে দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল।

একসময় কাল্লুকে দেখা গেল একটা ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলায়। একটা ফ্ল্যাটের

বন্ধ দরজার সামনে। সে বেল বাজায়, কিন্তু কোনও শব্দ হল না।

আবার বাজায়। আবার।

এবার তার চোখ গেল ধাতব কড়াটার দিকে। ঠিক তক্ষুনি তার পোলিওতে ভোগা মেয়ে মুন্নির মুখটা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল ফরজানার কথা। চোখের সামনে ভাসতে লাগল তার ধুলো ওড়া গ্রাম।

কিন্তু কড়াটা স্পর্শ করেই সে বুঝতে পারে তার আর গ্রামে ফিরে যাওয়া হল না।

তার শরীরটা কাঁপতে শুরু করেছে। কারণ, বন্ধ দরজার ওপারে কড়ার পিছনের প্রান্তের দুটো পেরেকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রির দুটো তার বাঁধা, আর প্লাগটা হাই ভোল্টের ফ্রিজের প্লাগ পয়েন্টে আটকানো। সুইচটা আপাতত অন আছে।

পরের তিনটে দিন প্রভাসবাবুদের পাড়ায় এবং ফ্ল্যাটবাড়িতে মূল গেটে কোলাপসিব্‌ল গেট লাগানোর ধূম পড়ে গেল। কোনও কোনও ফ্ল্যাট বাড়িতে দারোয়ান রাখা শুরু হল। কারণ, প্রভাসবাবুদের ফ্ল্যাটের নীচে একতলায় একজনকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

লোকটি সম্ভবত মিটার চোর। কারণ, তার হাতে একটি স্ক্রু ড্রাইভার এবং পকেটে একটি প্লায়ার্স পাওয়া গেছে। একইসঙ্গে বসাকবাবুদের মিটারটা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

লোকটা সম্ভবত মিটার চুরি করতে এসে ইলেকট্রিক শক খেয়ে অচৈতন্য হয়ে যায়। পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে লোকটা হয়তো বাঁচবে না। বাঁচলেও বাকি জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে।

॥ ১২ ॥

আজ আফতাবের মেজাজটা ভীষণই খারাপ। ঘরে প্রচণ্ড অশান্তি করে সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অশান্তি এতদূর অবধি গেছে যে, সে মুন্নিবেগমের গায়ে পর্যন্ত হাত তুলে ফেলেছে। আসলে মানুষ বুড়ো হলে একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে যায়। ঘরে অষ্টাদশী বউ থাকলে...।

নইম নামে এক ছোকরা ইদানীং বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে। সে নাকি মুন্নিবেগমের দূরসম্পর্কের এক ভাই। বউয়ের ভাই মানে তো শালা! আফতাবও প্রথম-প্রথম তাকে বেশ খাতির করেছে। কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের নয়। সেই নিয়েই অশান্তি। এমনিতেই আফতাবের মনের অবস্থা ভালো নয়।

তার দু-দুটো হিটম্যান আজ অকেজো। সংসারে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। অথচ কোনও কাজের দেখা নেই। এদিকে নতুন মাস পড়তে চলেছে। থানার ওসিকে

এক লাখ টাকা না দিলেই নয়। এ-টাকা আসবে কোথা থেকে? ভাবতে-ভাবতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে যদি গৃহ-অশান্তি দেখা দেয়, মাথার ঠিক থাকে?

অশান্তি করে ঘর থেকে বেরিয়ে সে সোজা গেছিল ব্যবসায়ী কড়োরিমলের গদিতে। তার কাছ থেকে কিছু টাকা পাবে, এ আশ্বাস নিয়ে।

সে বাড়ি ফিরছিল, তখন সন্ধে ঘনাতে শুরু করেছে। ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলো জ্বলে উঠেছে। তা যেন অন্ধকার দূর করতে নয়। আরও অন্ধকারকে স্বাগত জানাতে। অন্ধকারে পথ চলছিল, হঠাৎই গলির সামনে তিনটে ছায়া। সাদা পাঠান সুট পরা, ওরা তিনজন।

প্রথম কথা বলল খুরশিদ, আপনি এখনও মা-কে কোনও টাকা পাঠাননি। আজ মা-কে আমরা তিন ভাই কথা দিয়েছি, কিছু নিয়ে আসবই।

আফতাব বিহ্বল চোখে দেখছে তার বড়ছেলে খুরশিদকে। একদম উর্দু সায়েবদের মতো দেখতে। সত্যি বড় মিষ্টি করে কথা বলছিল। মনে হচ্ছিল, যেন ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কিন্তু আফতাব ঘামছিল। কারণ এ-ছেলের দুর্নাম তার কানে এসেছে অনেক দিন হল।

খুরশিদ দু-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফের হেসে বলে, ক্যায়া ভাই? মাম্মিকে লিয়ে কুছ তো লে জায়েঙ্গে!

দুই ভাই মাথা নাড়ে।

হুড়মুড় করে আফতাব নিজের ঘরে ঢুকে হাঁপাতে থাকে। ত্রস্ত কুকুরের মতো।

মুন্নি ছুটে এসে চিৎকার করে ওঠে,—ইয়া আল্লা! ইতনা খুন?

আফতাব রক্তাক্ত মুখটা ফাঁক করে কোনওরকমে বলে,—শালোনে মেরা কান কাট লিয়া।

॥ ১৩ ॥

এপাশের ব্যালকনিটা বেশ খোলামেলা। সামনে কোনও বাড়ি নেই। ওপর থেকে ত্রিকোণ পার্কটা দেখা যায়। যদিও প্রভাসবাবু কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। কারণ, তাঁর চোখের অবস্থা ভীষণ খারাপ। দু হাতের নাগালের জিনিস ছাড়া উনি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

নীচের ত্রিকোণ পার্কটা একটা সাদা পাতায় কিছু রেখার মতো মনে হচ্ছিল তাঁর। আজ ওঁকে এক অবসাদ গ্রাস করছে ভীষণভাবে। উনি ব্যালকনিতে একটা

দোল-খাওয়া চেয়ারে বসে আছেন। মাঝে মাঝে দুলে উঠছে চেয়ারটা। দিগন্তও দোল খাচ্ছে। ও ক্ষীণদৃষ্টি চোখে ঝাপসা, সাদা।

আজ উনি জানতে পেরেছেন—ওঁর ছেলে রিসেসনের জন্য আমেরিকা থেকে দেশে চলে এসেছে। আজ নয়, প্রায় তিনমাস আগে। এসে এই কলকাতায় আছে। যাদবপুরে। এ-কথা প্রভাসবাবুকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি সে।

প্রভাসবাবু একটা অদ্ভুত রাগ, খানিকটা হতাশা, খানিক অভিমান নিয়ে দোল খাচ্ছিলেন। একসময় ভাবলেন, ঠিকই আছে, কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র। তারপর গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, তাতল সৈকত বারি বিন্দুসম্ সুত মিত রমণী সমাজে।

মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। উনি চোখ বুঁজে রইলেন। কিন্তু উনি জানেন দিগন্ত দোল খেয়েই চলেছে। উনি দেখুন, বা না দেখুন।

নীচের পার্কে বাচ্চারা খেলছে। উনি শুনতে পাচ্ছেন। এখন কানই ওঁর চোখ। দোলনার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, মায়েদের একপ্রস্থ চিৎকার, বুঝিয়ে দিচ্ছে বাচ্চারা দোলনায় দুলছে।

একটা ডুগডুগির আওয়াজ শোনা গেল। তার মানে জিন্দালাল এসেছে। জিন্দালালের আসল নাম হরিদাস। সে বলে, বাবু, নাম না নিলে মানুষ দাম দেয় না।

হরিদাস একজন মাদারি। বাতের ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ, ধনেশ পাখির তেল, ভালুকের লোম, কেউটে সাপের খোলস, নেউলের লেজ থেকে তৈরি গুপ্ত রোগের মলম, এইসব বেচে আর একটু-আধটু ভোজবাজি দেখায়।

প্রভাসবাবু চোখ বুজে ভাবেন, জিন্দালালের মতো জীবনটা হলেই বোধহয় ভালো হত।

॥ ১৪ ॥

আফতাব খাটের ওপরে বসে। সামনের দেওয়ালে একটা আয়না। সে বসে-বসে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের ব্যান্ডেজ বাঁধা কানটা দেখছিল। প্রচণ্ড একটা রাগে তার হাতদুটো কাঁপছিল। কাঁপা-কাঁপা হাতেই সে সামনে রাখা রঙিন গেলাসটা তুলে নেয়। আর-এক ঢোঁক খেয়ে নেয়। পেটে পানীয় পড়ার পর তার মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়। তখনই সে অনুভব করে, তার শরীরের ভেতরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তার শীতও করছে।

এবার সে বুঝতে পারে, আসলে সে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

তার চোখের সামনে খুরশিদের ঢুলুঢুলু দুটো চোখ ভাসছে। তার ছেলে তিনটে

এখন তারই প্রতিদ্বন্দ্বী! ব্রিজলালের আন্ডারে কাজ করে। মানে, হিটম্যানের কাজ করে।

ব্রিজের এখন রমরমা বাজার, তার তিন ছেলের হাতযশে। তিনটেই আস্ত খুনে হয়ে উঠেছে। তারা বলে গেছে, আবার আসবে। আবার 'কিছু' নিয়ে যাবে।

আফতাবের ভয়ে পেচ্ছাপ পেয়ে যাচ্ছে। ভয় কাটাতে সে আবার গেলাসে পানীয় ঢালল।

মুন্নি বাড়িতে নেই। বাপের বাড়ি গেছে বলেছে। নাকি ওই ছোকরার সঙ্গেই কোথাও গেল? যাক গে! ওসব নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। এখন এই আশু বিপদের হাত থেকে কী করে বাঁচা যায়, তাই ভাবতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আফতাব।

প্রথমে সে শুনতে পায়নি। পরে শুনতে পেল, ফোনটা বাজছে।

নেশা জড়ানো হাতে বালিশের তলা থেকে ফোনটা তুলে কানে নেয়।

—হ্যালো।

ওপাশ থেকে চেনা একটা গলা ভেসে এল।

—আপনি তো আমার কাজটা করলেন না দেখছি!

আফতাবের মাথা গরম হয়ে যায়।

—আপনি যদি একটা ভূতুড়ে লোকের সুপারি দেন, যাকে টপকাতে গিয়ে আমার লোকেরাই টপকে যায়, সেখানে আমি কী করব?

ওপাশের গলাটা একটু নরম হয়, আপনি রাগ করবেন না। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি। শুধু মনে করিয়ে দিলাম আপনার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে।

আফতাব আরও রেগে যায়,—আপনার বেশি মাথাব্যথা আমার খেলাপে? দরকার হলে আপনার সব টাকা ফেরত নিয়ে যান।

বলেই ভয় হল, সত্যি যদি টাকা ফেরত চায়, দেবে কোথা থেকে?

ওপাশের মানুষটা বোধ হয় তার ভয়ের গন্ধ পায়। লোকটা চাপা স্বরে হাসে, বলে,—না না আমি ফেরত চাইছি না। বরং আপনার যদি দরকার হয় তবে আরও পঞ্চাশহাজার টাকা দিচ্ছি।

আফতাবের এক কান খাড়া হয়ে যায়। সে চুপ করে থাকে।

ওপাশের মানুষটা বলল,—আপনি আগের মতোই আপনাদের বাড়ির সামনের লাল ডাকবাক্সটার মধ্যে একটা কালো রং-এর খাম পাবেন। যান, নিয়ে নিন। আমি পরে ফোন করছি।

আফতাব বাড়ি থেকে বেরোল। দ্রুতপায়ে আবর্জনার স্তূপের পাশে লাল ডাকবাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এ-টাকাটা কালকেই খুরশিদকে সে দিয়ে আসবে।

ভাবতে-ভাবতে ডাকবাক্সটার মধ্যে হাত ঢোকায়।

শীতের মাঝরাত। রাস্তায় কোনও লোক নেই। দু-চারজন রিকশাওয়ালা ফুটপাথে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

আফতাব ডাকবাক্সটায় পুরো হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে। হঠাৎই পিন ফোটানোর যন্ত্রণা।

সে হাতটা দ্রুত বের করে আনল। হাতের তালুটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দেখা গেল সেখানে লাল বিন্দুর মতো দু-ফোঁটা রক্তের দাগ।

আফতাব কাঁপতে থাকে। কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায়। ছটফট করতে থাকে। একসময় শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

ফুটপাথে শুয়ে থাকা মানুষগুলো এর কিছুই জানতে পারল না। ওরা ঘুমিয়ে ছিল। তাই দেখতে পেল না আফতাবের মৃত্যু। আর শুনতেও পেল না ডাকবাক্সটার ভেতর থেকে ভেসে আসা একটা 'হিসহিস' শব্দ।

মন দিয়ে অমিতাভ বচ্চনের 'দীবার' ছবিটা দেখছিল ব্রিজলাল। প্রায় দুশোবার ছবিটা সে দেখেছে। প্রতিটি ডায়লগ প্রায় মুখস্থ। তবু সে দ্যাখে। কারণ, সে হচ্ছে বচ্চনের ডাই হার্ড ফ্যান। আজ সে তার ব্যাবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কারণ, তিনমাস আগে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আফতাব আখতার মারা গেছে। এখন সে বেতাজ বাদশা। সে এখন তার ব্যাবসাটাকে কর্পোরেট লেভেলে নিয়ে গেছে। ইনটারনেটে তার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে তার কথা হয়। অবশ্যই কোডে। আফতাবের তিন ছেলেকে সে মাইনে দিয়ে রেখে দিয়েছে। এ ছাড়াও অনেক হিটম্যান, শ্যুটার তার আন্ডারে।

এবারেই সেই ঐতিহাসিক সিন, 'মেরে পাস সব হ্যায়'।

ঠিক তক্ষুনি ফোনটা বেজে উঠল।

দূর শালা, এই সময়েই ফোন...! —বলে ব্রিজ রিমোট তুলে পজ্ বোতামটা টেপে। মোবাইল তুলে নেয়,—হ্যালো।

ওপাশ থেকে একটা চাপা গলা শোনা গেল,—আমি কি ব্রিজলালের সঙ্গে কথা বলছি?

ব্রিজ বলে, হ্যাঁ। কী চান?

ওপাশ থেকে দ্বিধাজড়ানো গলা শোনা গেল, আপনি আমার একটা কাজ করে দেবেন? তার জন্যে আমি আপনাকে তিন লাখ টাকা দেব।

ব্রিজ নড়েচড়ে বসে,—কী কাজ?

ওপাশ থেকে আবার দ্বিধাজড়ানো গলায় ভেসে এল,—একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ব্রিজের মনে হল, এটা কারুর চাল না তো!

সংশয় বুকে চেপে সে বলে ওঠে, রং নাম্বার।
তারপর বন্ধ ফোনটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ঠিক সেই সময়ই শহরের অন্য প্রান্তে একটা আধো অন্ধকার ঘরে একজন মানুষকে দেখা যায়। খাটের ওপর বসে। তার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। সারামুখে উত্তেজনার ঢেউ বাঁধ ভেঙেছে। মানুষটা হাসছে। হাসছে হাতে রাখা ফোনটার দিকে তাকিয়ে।

মানুষটা এবার মুখ তোলে। ঘরের কোণে তেপায়া একটা টেবিলের ওপর চোখ রাখে। সেখানে রাখা একটা বেতের বাক্স। মানুষটা মনে-মনে ভাবল, খালি বাক্সটা ফেরত দেবে বলে সে কথা দিয়েছিল জিন্দালালকে।

মানুষটা ফোনের রি-ডায়াল বোতামটায় চাপ দেয়। ওপাশের ফোনটা ফের বেজে ওঠে।

হ্যালো?—মানুষটা বলে, ব্রিজলালজি ফোনটা রাখবেন না। আমি পুলিশের লোক নই। বা ইয়ার্কিও মারছি না। আমি আপনার সম্পর্কে মোটামুটি সব তথ্যই জানি...।

জানলার বাইরে রাতের অন্ধকার। জানলার চারতলার নীচে একটা রোঁয়া ওঠা পার্ক। সেখানে একটা বিরাট বটগাছ। সে-গাছের ছায়ায় একঝাঁক ঝুপসি আঁধার আস্তানা গেড়ে ছিল। তারা দূর থেকে আধো-অন্ধকারে ঢাকা ঘরটার জানলার দিকে দেখছিল। ঘরের মধ্যে মানুষটা কী কথা বলছে, তা তারা শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু হালকা আকাশি ঘরের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার দেখা যাচ্ছিল।

সেটা একটা ক্যাকটাসের ছবি। ক্যাকটাসটা যেন বালির মধ্যে শরীর গেঁথে দিয়ে দু-হাত তুলে আকাশের পানে নির্নিমেষে চেয়ে আছে।

ঝুপসি আঁধারেরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ করে কথা বলে। হয়তো বলে, সবাইকেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই কিছু-না-কিছু পেতে হয়। ক্যাকটাসকে যেমন জল, কাউকে আবার বৈচিত্র্য।

ঠিক তখনই শহরের অন্যপ্রান্তে ব্রিজলালকে দেখা গেল রাতের অন্ধকারে একটা লাল ডাকবাক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা লাল রং-এর খাম বের করে নিতে।

জন্মদিনের রাত

লোকটা ফোনে কথা বলছিল।

ফরসা গোল আলুর মতো চেহারা। গায়ে চকচকে একটা জামা, আকাশি ট্রাউজার। মাথায় চুল কম—একটা লাল টুপিতে ঢাকা। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা।

প্রথম দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখলে মনে হবে ট্যুরিস্ট। কিন্তু আপনার যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে তা হলে দেখবেন, ওর চোখ দুটো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুঁজে মুগ্ধ হওয়ার মতো নয়, বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া বাকি সবকিছুই খুঁজে চলেছে চোখদুটো। কিন্তু মুখের হাসিটা দেখলে যে-কেউই ভাববে যে, মানুষটা বেশ আমুদে।

যে-হোটেলে লোকটা আছে সেখানে সে বলেছে, স্বাস্থ্য ফেরাতে এসেছে। কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে লোকটা যা-যা করছে, তা যদি কেউ দেখত তা হলে নিশ্চিত বুঝত লোকটা স্বাস্থ্য ফেরাতে আসেনি। প্রায় তিন মাস লোকটা এখানেই পড়ে আছে! এখানকার আঞ্চলিক ভাষা 'টুলু'টাও মোটামুটি জেনে ফেলেছে।

জায়গাটার নাম 'কাপু' (Kapu)। জায়গাটা বেঙ্গালুরু থেকে ৪৫০ কিমি দূরে, আর ম্যাঙ্গালোর থেকে ৪৫ কিমি দূরে আরবসাগরের তীরবর্তী একটা বেলাভূমি। এটা উডুপী জেলার অন্তর্ভুক্ত। জায়গাটার আসল নাম 'কাপ' (Kaup), কিন্তু আঞ্চলিক টুলু-ভাষায় জায়গাটার নাম কাপু। জায়গাটার বিশেষত্ব একদিকে পাহাড়, একদিকে সমুদ্র। মূল আকর্ষণ—একটা লাইট হাউস।

জায়গাটা ভীষণ নির্জন। নীচে দাঁড়িয়ে লাইট হাউসটাকে একটা দৈত্যের মতো মনে হয়। মনে হয়, ওর ভয়ে সমুদ্রটা আর এগোতে পারছে না।

এখানে লোকবসতি ভীষণ কম। ট্যুরিস্টও খুব কম আসে। সেজন্য হোটেলও প্রায় নেই বললেই চলে।

পাহাড়ের গায়ে একটা মিশনারি স্কুল আছে, যার ছাত্র সংখ্যা বেশ কম। স্কুলের কাছাকাছি একটা বাজারমতো আছে। একটা না-চলা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আছে। আছে কিছু কুটির, যাতে বাস করে কিছু আঞ্চলিক মানুষ। তাদের সেই অর্থে কোনও পেশা নেই। কখনও মাছ ধরে, কখনও জঙ্গলের কাঠ বেচে, আবার কখনও ট্যুরিস্টদের খাবার বিক্রি করে।

ট্যুরিস্ট বলতে কিছু তরুণ-তরুণী এখানে আসে। সকালে সমুদ্রে দাপাদাপি করে, দুপুরে জঙ্গলের নরম অন্ধকারে মিশে যায়, তারপর বিকেল হলেই চলে যায়। পড়ে থাকে কৃষ্ণাভ মেঘের মতো বিশাল পাহাড়, সাদা ওড়নার মতো সমুদ্র, আর দৈত্য লাইট হাউস।

লোকটা তখন সমুদ্রের ধারে, একটা দোকানে। বাঁশ দিয়ে তৈরি ফাঁক-ফাঁক বেঞ্চে বসে কথা বলছিল ফোনে। দোকানটাকে দোকান বললে দোকানের অপমান হয়। চাটাই আর পাতা দিয়ে তৈরি একটা শেড, আর মাঝে একটা পাকাপাকি উনুন আছে। আছে চা বানানোর একটা বড় পাত্র আর ছাঁকনি। কয়েকটা ঘষা কাচের নোংরা গ্লাস আর পাঁচ-ছটা বোয়েম, ভেতরে অতি প্রাচীন কিছু বিস্কুট, যাদের জন্ম তারিখ তারা নিজেরাই ভুলে মেরে দিয়েছে।

দোকানি একজন আঞ্চলিক মানুষ। মাঝবয়েসি। সে এখন চা বানাতে ব্যস্ত। কাস্টমার মাত্র একজন। চকচকে জামা পরা একটা লোক। এইমাত্র চা এসে পৌঁছোল তার হাতে। ঘষা কাচের গ্লাস এক হাতে, অন্য হাতে ফোন। সেটা এখন কানে।

লোকটা ফোনে বলছে, 'আপনার ইনফরমেশান ঠিক নয়। এখানে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ থাকে না। যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থাও নেই। মানে, ওদের কোনও ল্যান্ডলাইন ফোন নেই, মোবাইলও নেই। থাকলেও অবশ্য কোনও কাজে লাগত না, কারণ পাহাড়ের ওপরে কোনও ফোনেরই নেটওয়ার্ক কাজ করে না। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মি. আয়ার আর মিসেস আয়ার মাঝে-মাঝে পাহাড়ের ওপরে গেলে, ওদের সঙ্গে দেখা করেন। লনে বসে গল্প করেন। আর মিশনারি স্কুলের বাচ্চারা মাঝে-মাঝে ওপরে চলে যায়, তাও কদাচিৎ। এ ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। অন্তত তিন মাসে তো দেখলাম না। এলাকার লোকও অন্য কাউকে কোনওদিন বুড়োবুড়ির সঙ্গে দেখা করতে আসতে দেখেনি। আমি সব খোঁজ নিয়েই দেখেছি, দু-সপ্তাহে একবার বুড়ো নীচের বাজারটাতে আসে। দু-হপ্তার বাজার করে লোকাল একজন মুটে নিয়ে সেই যে মালপত্র সমেত ওপরে উঠে যায়, দু-হপ্তা আর নামে না।'

ফোনের ওপাশে অধৈর্য কণ্ঠস্বর, 'কেউ আসে না? কোনও পোস্টম্যান?'

চকচকে জামা-পরা লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, কোনও লোক যায় না। বুড়ির দৌরাত্ম্যে সেখানে কাক পর্যন্ত বসতে পারে না। স্কুলের বাচ্চারা মাঝে-মাঝে ওদের বাগানের বেড়া ডিঙোলেই বুড়ি লাঠি হাতে অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে সবাইকে তাড়ায়। বুড়োটা সেই তুলনায় শান্ত। বুড়ি না থাকলে সে মাঝে-মাঝে বাগানের ফুল ফল বাচ্চাদের দিয়ে থাকে। নইলে বুড়োটাও বুড়ির দাপটে চুপসে থাকে।'

ফোনের ওপাশের কণ্ঠস্বর চুপ।

চকচকে জামা পরা লোকটা বলল, 'হ্যালো'।

ওপাশের কণ্ঠস্বর, 'শুনছি।'

লোকটা বলল, 'আমার কাজ তাহলে শেষ। আজ আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেব। বাকি পেমেন্টের চেকটা আমার এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেবেন।'

ওপাশের কণ্ঠস্বর একটু অন্যমনস্ক।

'বুড়োটা দু-হপ্তার বাজার করে—ওপরে উঠে যায়—তা কী-কী বাজার করে?'

এপাশের লোকটার বিরক্তির বাঁধ ভেঙে গেল, 'কী আবার? আপনি আমি যা খাই—যা-যা ব্যবহার করি।' বলেই একটু চুপ করে ফের বলল 'ও! একটা কথা জানাতে ভুলে গেছিলাম। এক হপ্তা আগে বুড়ো-বুড়ি মিস্টার আইয়ারকে একশো গ্রাম বেকিং পাউডার শহর থেকে আনতে বলেছিল।'

ফোনের কণ্ঠস্বর চুপ। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'শর্মা, পেমেন্টের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলে না? তোমায় যদি এক পয়সাও না দিই, তা হলেও কোনও অন্যায় হবে না।'

চকচকে জামা পড়া ডি. কে. শর্মা তোতলায়, 'কে...কেন?'

ফোনের লোকটা ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, 'নিজেকে বিরাট প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাবো, তাই না? গাধা! তুমি একটা নিরেট গাধা! দুজন আশি পেরোনো বুড়ো-বুড়ি এই জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে কী বানাতে চায়?'

ডি. কে. শর্মা আমতা-আমতা করে বলে, 'বোধহয় কেক।'

ওপাশের লোকটা বলে, 'ইডিয়ট! কেন জোনাথন গোমস আর মেরি গোমস কেক বানাবে? পঁচিশে ডিসেম্বর তো পার হয়ে গেছে। তুমি তো বললে ওদের কাছে কেউ আসে না। কেউ যোগাযোগ করে না। তা হলে কেন বেকিং পাউডার, কেন কেক? অপদার্থ! কেস হিস্ট্রিটা পর্যন্ত ভালো করে পড়োনি। তোমাকে এক পয়সাও দেব না। তোমায় যাকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম সেই ফ্রান্সিস গোমসের ডেট অফ বার্থটাও জানো না!'

ডি. কে. শর্মা মিউমিউ করে, 'জানব না কেন? ১৫ জানুয়ারি।' বলেই চমকে উঠে বলে, 'মানে, মানে আগামীকাল।'

ওপাশের কণ্ঠস্বর একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল, 'ইয়েস পথে এসো। কেকটা ফ্রানসিস গোমসের জন্যে বানানো হচ্ছে। যাকে আমরা চার বছর ধরে পাগলা কুকুরের মতো খুঁজে চলেছি। যাক, তোমার কাজ শেষ। এবার তুমি ফিরে যেতে পারো। তোমার টাকা পৌঁছে যাবে। এবার আমাদের কাজ শুরু।

লোকটা ফোনটা কেটে দিল।

*

শীতকালে এখানে সন্ধেটা তাড়াতাড়ি হয়। বোধহয় পাহাড়ের ঘুম পায়, নীচে সমুদ্রের শিরশির শব্দ ঘুমপাড়ানি গানের কাজ করে।

পাহাড় এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা রাস্তায় একটা পুলিশ চেকপোস্ট আছে। তাতে একজন কনস্টেবল থাকে। আজ রাতে ছেদিলালের ডিউটি। সন্ধের আগে থেকেই সে গাঁজার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তার সেই অর্থে কোনও কাজই নেই, ঘুমোনো ছাড়া।

এ-অঞ্চলটায় পাহারা দেওয়ার মতো কিছুই নেই। শুধু পাশের পাহাড়টায় একটা ডেয়ারি আছে। এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে যাওয়ার একটা লিংক রোড আছে। ডেয়ারিটা এখন প্রায় রুগ্ন। কিন্তু একসময়ে এই ডেয়ারিটার বেশ রমরমা ছিল। সে প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেই কারণেই এই চেকপোস্ট তৈরি হয়েছিল। আজ ডেয়ারিটার অবস্থা হরপ্পা সভ্যতার মতো। সারাদিনে দুবার গাড়ি এ-পাহাড়ের রাস্তা থেকে ও-পাহাড়ে যায়। একটা সকাল ছ'টায় আরেকটা রাত এগারোটায়।

তার জন্য চেকপোস্ট বা গার্ডের কী প্রয়োজন? এই যুক্তিই সাজিয়ে নিয়েছে এ যাবৎ চেকপোস্ট গার্ডরা। তাই গাঁজা খাও, ঘুমোও, চেকপোস্টের বিরক্ত গার্ডদের ভাষায়—'খাও, ঘুমোও, বত্তি বুঝাও।'

ছেদিলাল সেদিন যখন তার লোকাল দোস্ত রাজনের ঝুপড়িতে বসে আলু পোড়া দিয়ে গাঁজায় দম মারছিল, তখন কালো রং-এর একটা সুমো গাড়ি নিঃশব্দে গুড়ি মেরে পাহাড়ের অন্ধকারে উঠে গেছিল। সেটা বোমভোলা ছেদিলাল জানতে পর্যন্ত পারেনি।

চলুন, এবার আমরা পাহাড়ের ওপর দিকটায় উঠব। নির্জনতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছোলে কীরকম অনুভূতি হয় জানা নেই, তবে বোধহয় এখানকার থেকে খুব একটা কম একা লাগে না।

পাহাড়ের ওপরটায় অনেকটা সমতল জায়গা। তারই এককোনায় খাদের গা ঘেঁষে পুরোনো বাংলোটা। বাংলোর বয়েস একশোর বেশি। কোনও এক কালে ইংরেজরা বানিয়েছিল। বছরচারেক আগে মি. জোনাথন গোমস এই বাংলোটা এবং পুরো পাহাড়ের ওপরটা কিনে চলে এসেছিলেন। জোনাথনের বয়েস পঁচাশি—তার স্ত্রী মেরির বয়েস আশি। মেরির বাগান করার শখ। তাই বাংলোর সামনেটায় একটা সুন্দর বাগান কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। বুড়োবুড়ি সারাদিন বাগানের কাজ করে কাঁপা-

কাঁপা হাতে। আর বিকেলবেলা ওদের বানানো খাদের ধারের বেঞ্চটায় এসে বসে। সূর্যাস্ত দেখে কাটায়।

আদর্শ অবসর জীবনযাপন। এরা কোথা থেকে এসেছে, কেউ জানে না। গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার মিস্টার আয়ারই একমাত্র ওদের সঙ্গে মেশে। এখানে তো আর কোনও মানুষই নেই, যাদের সঙ্গে কথা বলা যায়। সেই কারণেই মিস্টার আয়ারকে মাঝে-মাঝে বুড়োবুড়ির কাছে আসতে হয় একঘেয়েমি কাটানোর জন্য। মি. আয়ার কথায়-কথায় জানতে পেরেছিল, গোমসরা আগে গোয়ার বাসিন্দা ছিল।

সুমো গাড়িটা প্রায় নিঃশব্দে সমতল জায়গাটায় উঠে এল। তারপর একটা বটগাছের আড়ালে নিজের জায়গা করে নিল। গাড়িতে চালক ছাড়া, আরও দুজন মানুষ—তিনজনই গাড়ি থেকে নামল।

সামনে খাদের ধারে বাংলোটা—ভেতরে ক্ষীণ একটা আলো জ্বলছে। সেখান থেকে প্রায় একশো ফুট দূরে তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে। বাংলোটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা মুমূর্ষু যক্ষ্মা রোগী। যে-কোনও সময় যার চোখে অন্ধকার নামতে পারে।

তিনজন লোক এবার এগিয়ে যায়। বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ে শব্দহীন ভাবে। তখন সন্ধে সাতটা।

বাতাসের বিরামহীন গুনগুন গান আর দূষণহীন কালো আকাশের কৌতূহলী তারাদের উঁকিঝুঁকির মধ্যে নির্জন পাহাড়টা দাড়িয়ে রইল, আগের মতোই।

গোটা পাহাড়টাকে পাইথনের মতো শক্তভাবে জড়িয়ে আছে পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটা, যেন একটা সময়ের জন্য রাস্তাটা অপেক্ষা করছে—কখন পাহাড়টা নিস্তেজ হয়ে পড়বে—আর ও পাহাড়টাকে গিলে নেবে। এভাবেই প্রতিদিন রাতে নির্জন পাহাড়টা নিস্তেজ হয়ে যায়—আর পাইথন রাস্তাটা চুপিচুপি পাহাড়টাকে গিলে নেয়—কেউ জানতে পারে না।

এখন সময় সাড়ে সাতটা। আধ ঘণ্টা আগে তিনজন আগন্তুক সামনের বাংলোটার মধ্যে ঢুকেছিল। এবার আমরা বাংলোর ভেতরে উঁকি দেব।

বাংলোটার মধ্যে ঢুকলেই ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম। তার চার কোণে চার ঘর, এক পাশে কিচেন। ড্রয়িং রুমটা পুরোনো আসবাব দিয়ে সাজানো। বিরাট-বিরাট সোফা মেহগনি কাঠে তৈরি। একটা বড় ডাইনিং টেবিল আর কয়েকটা পুরোনো লোহার ভারী চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো।

এইমুহূর্তে বৃদ্ধা মেরি গোমসকে দেখা যাচ্ছে একটা পুরোনো চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। বৃদ্ধ জোনাথন গোমস বোধহয় সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর একটা হাত স্টিলের হ্যান্ডকাফ দিয়ে সোফার হাতলের সঙ্গে বাঁধা। ঘরের মধ্যে আদ্যিকালের পুরোনো একটা ল্যাম্প শেড আছে। সেটার ভেতর দিয়ে

অশরীরী আত্মার মতো ক্ষীণ একটা আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে ঘরে আলোর চেয়ে অন্ধকারই ক্রমে গাঢ় হচ্ছে।

বৃদ্ধ জোনাথনের ঘুম ছুটে গেছে। এখন সে হাত বাঁধা অবস্থায় সোফায় উঠে বসেছে। খানিকটা হতবাক অবস্থায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘটনার সূত্র বোঝার চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধা মেরি ফোকলা দাঁতে কুৎসিত গালাগাল করে চলেছে।

তিনজন আগন্তুকের একজন দরজার পাশে, আর একজন ব্যালকনিটার দিকে ছায়ায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে বসে আছে।

চেয়ারে বসা লোকটা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নড করল। তারপর হেসে বলল, 'গুড ইভনিং, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গোমস। আপনাদের একটু ডিসটার্ব করতে হল বলে দুঃখিত। কী করব বলুন? বড় শিকার ধরতে টোপের সাহায্য তো নিতেই হয়। এক্ষেত্রে আপনারা টোপ। শুধু টোপই বা বলি কেন, আপনারাই আমার তুরুপের তাস। আপনারা ছাড়া আপনাদের গুণধর ছেলে ফ্রানসিস গোমসকে ধরার যে আর কোনও উপায়ই নেই!'

বুড়ি বাঁধা অবস্থায় নড়েচড়ে বলল, 'ছেলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। চারবছর হয়ে গেছে, সে কোথায় আমরা জানি না। সে-ও আমাদের খোঁজ নেয় না। আমরাও নিই না।'

চেয়ারে বসা লোকটা হাসল, মাথা নাড়ল। ল্যাম্পশেডের আলোয় লোকটার চোখ দুটো দেখা যায়। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম নিষ্ঠুর, 'সত্যি বলছেন? আপনি বিদেশে থাকলে অস্কার পেতেন অ্যাকটিং-এ।'

বুড়ি খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভদ্রভাবে কথা বল্ ইয়ের বাচ্চা। বয়স্কদের সঙ্গে এ কেমন ধারা কথা? বাপ-মা শেখায়নি? নাকি ও-পাট ছিলই না?'

চেয়ারে বসা লোকটা এবার সপাটে বুড়ির গালে একটা চড় কষাল। নির্জন পরিবেশে শব্দটা নির্জনতাকে চমকে দিল।

বুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

এবার বৃদ্ধ জোনাথন মুখ খুলল, 'ওকে ছেড়ে দিন। ছেলের সঙ্গে আমাদের সত্যিই যোগাযোগ নেই।'

চেয়ারে বসা লোকটা হঠাৎই উঠে এসে জোনাথনের মুখে সপাটে একটা ঘুসি চালাল। জোনাথনের নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

লোকটা দুজনের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'যদি যোগাযোগই না থাকে তবে ছেলের জন্মদিনে ডাইনিং টেবিলে রাখা কেকটা কী করছে? কে কাটবে

বলে কেকটা অপেক্ষা করছে?'

বুড়ো আর বুড়ি চোখ চাওয়াচাওয়ি করে, চুপ করে থাকে।

লোকটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল, 'চার বছর তোমাদের ছেলের খবর তোমরা জানো না। আর চার বছর আগেই তোমরা গোটা পাহাড়ের চূড়াটা কিনে গোয়ার গণ্ডগ্রাম থেকে এখানে চলে এলে। সঙ্গে এতবড় একটা বাংলো! এত টাকা তোমাদের কাছে এল কী করে?'

বুড়ি খনখনে গলায় বলল, 'পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে গেছিলাম।'

চেয়ারে বসা লোকটার সঙ্গে বাকি দুই আগন্তুকও হেসে ওঠে। চেয়ারে বসা লোকটা বলে, 'তোমার আশি আর ও পঁচাশি। কার বাবা এতদিন বেঁচে থেকে সম্পত্তি আগলাচ্ছিল?'

বুড়ো-বুড়ি চুপ করে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর বুড়ো শান্ত গলায় বলে, 'আমাদের কাছে কী চাও?

লোকটা বলে, 'তোমাদের ছেলে আমাদের তিনশো কোটি টাকা ঝেড়ে দিয়েছে। সে-টাকা ফেরত চাই। ব্যস।'

বুড়ো বলে, 'তো আমার ছেলের কাছেই যাও। আমাদের বুড়ো-বুড়ির ওপরে এ অত্যাচার কেন?'

চেয়ারে বসা লোকটা হেসে উঠল কদর্যভাবে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'তাই তো এখানে এসেছি। আজ তোমাদের ছেলে নিশ্চয়ই এখানে আসবে। নইলে এত ঘটা করে কেক বানানো কেন? সারা ঘরে এত রঙিন রিবন ঝোলানো কেন? গত চার বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেছি। আজ শালাকে ধরবই।'

বুড়ো বলল, 'তারপর? তারপর কী করবে?'

লোকটা বলে, 'তারপর একটু-একটু করে ওর সমস্ত বডিটা কুচিয়ে কাটব। শালা বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে! নইলে তো জন্মদিন পার হয়ে যাবে। কী বলো!'

বুড়ি বলে ওঠে, 'আর যদি না আসে?'

লোকটা বলে, 'তাহলে তোদের কাটব।'

বৃদ্ধ অস্ফুটে বলে, 'এমনি কি আর ছেড়ে দেবে!'

লোকটা লজ্জিতভাবে হাসে। ভাবটা এমন, যেন বুড়োটা ধরে ফেলেছে।

বুড়োটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা হলে আর কী! বারোটা অবধি অপেক্ষা করো।'

লোকটা বলল, 'উপায় নেই। ও না আসা অবধি তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই

হবে। তোমাদের ছেলে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না জানি, কিন্তু মানতে পারছি না। কারণ, সে ছিল আমাদের মধ্যে গুডবয়! পিতৃভক্তি এবং মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা। মায়ের কথা বলতে গিয়ে তার চোখ ভিজে যেত। আমাদের মধ্যে ও-ই ছিল সবচেয়ে হোমসিক্। প্রতি মাসে বাড়ি আসা চাই। একেবারে লালু লাল—মায়ের গোপাল। ন্যাকা পুষু!'

বুড়ি গালাগাল দিয়ে উঠল, 'অ্যাই চোপ্! আমার ছেলের নামে বাজে কথা বলছিস! সামনে এসে দাঁড়ালে তো মুতে দিবি রে!'

লোকটা মারবে বলে হাত তুলল।

বুড়ো বলে ওঠে, 'ওকে মেরো না। ওর ব্লাড প্রেশার খুব হাই। ওই টেবিলে কালো শিশিটার একটা ওষুধ ওকে দেবে? ওষুধ খাওয়ার সময়টা পার হয়ে যাচ্ছে। প্লিজ।'

লোকটা বলে, 'আমাদের চাকর পেয়েছ? চুপ করে বসো, নইলে পাছার ছাল ছাড়িয়ে নেব।'

বুড়ো চাপাস্বরে বলে, 'আমারও গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।'

সামনে বসা লোকটা শুনতে পায়। বলে, 'আহা! কী আহ্লাদ! তাহলে কি পানীয় দেব?'

বুড়ো বলে, 'হলে মন্দ হয় না। আমিই না হয় তোমাদের খাওয়াই। ওই বুক শেল্‌ফটার নীচটা খুললে দু-বোতল স্কচ পাবে। আমায় একটু দিয়ে তোমরা বাকিটা মেরে দিতে পারো।'

সামনে বসা লোকটা বাকি দুজনকে নির্দেশ দেয়। একজন শেল্‌ফের নীচ থেকে একটা বোতল বের করে লোকটার সামনে এনে রাখে। লোকটার চোখ চকচক করছে। মুখে মৃদু হাসি। বাকি দুজনের উদ্দেশে বলে, 'তোরাও খা। কিন্তু দেখিস, মাতাল হয়ে যাস না।'

বুড়িটা বলে ওঠে, 'তোর তো সে ভয় নেই। কারণ, তুই তো পিপে-পিপে মদ গিলেও সোজা দাঁড়িয়ে থাকিস। তোর কথা আমি সব জানি।'

লোকটা বোতলের ছিপি খুলেছিল। হাত থেমে গেল। বলল, 'কী জানিস তুই আমার সম্বন্ধে?'

বুড়িটা কদর্য একটা গালি দিয়ে বলল, 'তুই তো সুমন ভাল্লা। আমার ছেলের গ্রুপের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলি। আমার ছেলের সঙ্গে র-তে চাকরি করতি। তারপর তোরা একসঙ্গে চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করতে গেছিলি হংকং। তোকে চিনব না? এক নম্বরের বজ্জাত তুই। আস্ত মদের পিপে। চব্বিশ ঘণ্টা মদ খাস।'

লোকটা একটু তেরছাভাবে হাসল, 'ও বাবা! সব খবরই তো জানা! এর

পরও বলবি ছেলের সঙ্গে তোর যোগাযোগ নেই?'

বুড়ি চুপ করে থাকে।

সুমন ভাল্লা একটা গ্লাসে স্কচ ঢালে। তারপর বোতলটা বাড়িয়ে দেয় দুই শাগরেদের দিকে।

আবার বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'বল্ দেখি কী জানিস?'

গ্লাসে একটা চুমুক দিল।

বুড়ি বলল, 'তুই তো আমার ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিলি। গুলি করেছিলি।'

সুমন বলল, 'না। সেটা আমি না। তবে সে আমারই লোক।'

বুড়ি বলল, 'সে একই হল। তোর লোকেরা তো তোরই মতো, নেড়ি কুত্তা। আমার ছেলেকে গুলি করে তোরা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলি।'

সুমন সজোরে মাথা নাড়ল, 'ওটা একটা ভুল বোঝাবুঝি। আমি এর মধ্যে ছিলাম না।'

বুড়ি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'লোকগুলোকে কে অ্যাপয়েন্ট করেছিল? তুই, না তোর বাবা? দায়িত্ব এড়ালে চলবে?'

তারপরেই বুড়ি চোখ নাচিয়ে মজা করার মতো করে বলল, 'তারপর আমার ছেলে তোদের কেমন টাইট দিল সেটা বল!'

সুমন ভাল্লা গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে বলল, 'আর সেইজন্যেই তো বনেবাদাড়ে বুনো হাঁস তাড়া করে বেড়াচ্ছি।'

পরিবেশটা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। এমন সময় সুমন ভাল্লার দুই শাগরেদের একজন বলল, 'কী হয়েছিল ব্যাপারটা?'

সুমন ভাল্লা একটু ইতস্তত করে শুরু করল, 'আমরা ভারত সরকারের সুরক্ষা বিভাগে চাকরি করতাম। আমি, ফ্রান্সিস, রতনলালা আর ওয়াংদি শেরপা। বহু দুঃসাহসিক অভিযানে আমরা জয় করেছি, আহত হয়েছি, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। একসময় ঠিক করি, চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করব। চলে যাই হংকং-সিকিউরিটি সার্ভিসের বিজনেস করতে। আসলে আমরা ঠিক করেছিলাম, চাকরি করব না। চাকরিতে আমরা যে পরিমাণে ঝুঁকি নিই, তা নিজেদের জন্য নিলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়। সেই কারণেই ব্যাবসা করতে যাওয়া।

'দু-বছর কাটল হংকং-এ। কিন্তু ব্যাবসা জমল না। তখন আমাদের আন্ডারওয়ার্ল্ড কানেকশান থেকে রতনলালা খবর নিয়ে এল যে, ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির প্রায় তিনশো কোটি টাকার সোনা হাইতিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিনিমাম সিকিওরিটিতে। আমরা ঠিক করলাম জাহাজটা লুঠ করব।

'দল তৈরি হল, ফ্রান্সিস গেল মূল অপারেশনে। আমি রইলাম যোগাযোগে। সবই ঠিকঠাক যাচ্ছিল। জাহাজ থেকে সোনা নিয়ে ওরা তুলেও ফেলেছিল। কিন্তু বিপদ বাধল অন্যদিকে। আমাদের জানা ছিল না যে, জাহাজটাতে একঝাঁক মেয়ে ছিল। তারা যাচ্ছিল হাইতিতে ছুটি কাটাতে। অস্ত্র হাতে অতগুলো জোয়ান মদ্দ নিজেদের আর সামলাতে পারেনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

'সোনা ততক্ষণে পাচার হয়ে গেছে বোটে। ফ্রান্সিস সেই কাজটাই করছিল। হঠাৎ জাহাজ থেকে মেয়েদের হইহল্লা শুনে বোট থেকে জাহাজের ডেকে উঠে যায়। এবং মেয়েগুলোকে ছেড়ে সবাইকে বোটে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তখন বাধ্য হয়ে ফ্রান্সিস বলে, মেয়েগুলোকে ছেড়ে না দিলে গুলি চালাব। গুলি চলল। তবে গুলি করল ওয়াংজি শেরপা। ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে।

'গুলি খেয়ে ফ্রান্সিস ডেক থেকে ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। আসলে জঘন্য উত্তেজনায় সশস্ত্র লোকগুলোর মাথা কাজ করছিল না। তাই কেউ খেয়াল করল না, গুলিটা লাগল ফ্রান্সিস-এর কাঁধে। বুকে নয়। আর ওর নাম ফ্রান্সিস গোম্‌স। ভারত সরকারের সুরক্ষা বিভাগের জাঁহাবাজ অফিসার। আমাদের গ্রুপের টপ স্কোরার। যে-কোনও অবস্থাতে মাথা ঠান্ডা রাখার ট্রেনিং ওর ছিল। মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল বহুবার। ওকে মারা অত সোজা নয়। অত সহজে, অত তাড়াতাড়ি ও মরতে পারে না।

লোকগুলোর মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছিল। না হলে লোকগুলো খেয়াল করল না, সোনা ভরতি বোটটা রওনা হয়ে উলটো দিশায় চলতে শুরু করে দিয়েছে।

লোকগুলো বুঝতেই পারল না সমুদ্রের জলে ফ্রান্সিস সাঁতার কেটেছে। অলক্ষে সোনা ভরতি বোটে উঠে বোটটা দখল করে নিয়েছে। বোটে একটাও লোক ছিল না। সবাই জাহাজে ফুর্তি করছে, নাচানাচি করছে। সেই সুযোগে ফ্রান্সিস জাহাজ ভরতি জঙ্গিদের মাঝসমুদ্রে ফেলে সোনাভরতি বোট নিয়ে চম্পট। এবং যাওয়ার সময় ওয়ারলেসে কোস্ট গার্ডদের জানিয়ে দেয়, জাহাজে ডাকাতি হচ্ছে!

'দু-ঘণ্টার মধ্যে সবাই গ্রেপ্তার হল। আমি ছিলাম অন্য জায়গায় ওদের রিসিভ করার জন্য। তাই আমি ধরা পড়লাম না। বাকি সবাই এখন জেলের ঘানি টানছে। আর আমি সেই থেকে গত চার বছর ধরে ফ্রান্সিসকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

একদমে এতটা বলে সুমন ভাল্লা আবার গ্লাসে স্কচ ভরতি করল।

জোনাথন গোম্‌স বলে ওঠে, 'আমাকে একটু দেবে?'

সুমন ভাল্লা ইশারা করে। তার এক শাগরেদ একটা গ্লাসে স্কচ ঢেলে দেয়।

বুড়ো গ্লাসে চুমুক দিয়ে গলা খাঁকরায়। এমনিতেই বুড়ো থেমে-থেমে কথা বলে। আরও থেমে-থেমে বলল, 'চার বছরে ওকে তোমরা খুঁজে পেলে না? পৃথিবীটা

তো এখন কত ছোট হয়ে গেছে। ইন্টারনেট, ফেসবুক কত কী! আর তোমরা ওকে খুঁজে পেলে না!'

সুমন নির্বিকার স্বরে বলল, 'কী করে পাব? ও প্লাস্টিক সার্জারি করে গোটা মুখটা বদলে ফেলেছে।'

বুড়ো বলল, 'যে-ডাক্তার করেছে, তার কাছে যাও। তার কাছে নিশ্চয়ই রেকর্ড আছে।'

সুমন ভাল্লা বলে, 'তাও গেছিলাম। ডক্টর লি। হংকং-এ প্লাস্টিক সার্জারি করে। লোকটা আমাদের টর্চারে মরে গেল! তাও বলল না।'

বুড়ো-বুড়ি দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। বুড়ি বলে উঠল, 'জানোয়ার! একটা নিরপরাধ ডাক্তারকেও মেরে ফেললি তোরা?'

সুমন ঠোঁট উলটে বলল, 'কিছু করার ছিল না।'

সুমন ভাল্লার দুই শাগরেদের একজন বলে উঠল, 'বস, খুঁজে দেখব? এখানে যদি ওর এখনকার মুখের ছবি থাকে?'

সুমন ভাল্লা ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক, ঠিক। খোঁজ।'

দুই শাগরেদ তৎপর হয়ে উঠল।

যে-জায়গা থেকে আমরা বাংলোটার মধ্যে ঢুকেছিলাম, সেখানে এখন অন্ধকার ডানা মেলেছে। পাইথন সড়কটা পাহাড়টাকে আস্তে-আস্তে গেলা শুরু করেছে। বাতাস ফিশফিশ করে মৃত্যুপথযাত্রী পাহাড়টাকে অনেক-অনেক পুরোনো গাথা শোনাচ্ছে। হয়তো পাহাড়টার জন্মের কথা অথবা আদি সভ্যতার কথা। সে-গাথায় কত যুদ্ধ, কত সৃষ্টির কথা! কত মানব, কত অতিমানবের কথা।

মৃতপ্রায় পাহাড়টা হঠাৎই বাতাসের কাছে জানতে চায়, 'অজ্ঞাতবাসে আছে কে?'

বাতাস চাপাস্বরে বলে, 'ওদের ছেলে। তবে ও কথা থাক। আমি তোমাকে শোনাব আরও আদিম আদি পর্বের কথা।'

পাহাড়টা বলে, 'আরও আদি অজ্ঞাতবাসের কথা? মানে পাণ্ডবদের কথা?'

বাতাস খিলখিল করে রহস্যময়ীর মতো হেসে উঠল। বলল, 'না, পাণ্ডব নয়। আদি পাণ্ডবের কথা।'

পাহাড় জানতে চায়, 'কে আদি পাণ্ডব? চেনা-চেনা লাগছে, স্মরণে ধরা দিচ্ছে না।'

বাতাস ফিশফিশে গলায় বলে ওঠে, 'সেটাই তো জানবে, সেটাই তো জানব।'

পাহাড়টা যেন বলে, 'জানব মানে? তুমিও জানো না?'

বাতাস বলে, 'আমি জানি। কিন্তু আজ আমরা দুজনেই নতুন করে জানব।'

এখন রাত্রি দশটা। আমরা আবার ঢুকছি বাংলোটার মধ্যে। ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুমের ভিতরে সুমন ভাল্লা বুড়োর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা চৌকো নীচু টেবিল। তার ওপরে রাখা আছে গ্লাস ও খালি স্কচের বোতল।

সুমন ভাল্লার একজন সঙ্গী বেসমেন্ট থেকে উঠে আসে। হাতে একতাড়া অ্যালবাম। সুমন একটা অ্যালবাম হাতে নিল।

অলসভাবে একটার পর একটা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলে, 'ও কি একটাও ছবি রাখবে? ওর নাম ফ্রান্সিস গোম্‌স। ও এত বোকা নয়।'

বুড়ি বলে ওঠে, 'জানিসই যখন, তাহলে খুঁজছিস কেন?'

সুমন ভাল্লা বলে, 'যদি ভুল করেও একটা সূত্র রেখে যায়, তাই খুঁজছি।'

বুড়ি বলে ওঠে, 'আমার ছেলের ভুল হয় না। ও তোর মতো মদখোর কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। এই মদ খেয়েই তো আসামে কী কাণ্ড বাধিয়েছিলি মনে আছে? টেররিস্টদের হাত থেকে আমার ছেলেই তো তোকে কাঁধে করে হেঁটে বেস ক্যাম্পে এনে বাঁচিয়েছিল।'

সুমন বলে, 'সবই তো জানো দেখছি! তারপরেও বলছ যোগাযোগ নেই?'

বুড়ি অহংকারের সঙ্গে বলল, 'আমার ছেলে আমায় সব বলে।'

সুমন ভাল্লা অ্যালবাম থেকে মুখ তোলে। বলে, 'তার মানে স্বীকার করছ যে, তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার এখনও যোগাযোগ আছে। অর্থাৎ, তোমার ছেলে আজ আসছে। তার জন্মদিনের কেক কাটতে। আর তো দেড় ঘণ্টা বাকি বারোটা বাজতে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে। কী বলো?'

বুড়ি বলে, 'আমি জানি না।'

বৃদ্ধ জোনাথন মৃদুস্বরে বলল, 'যদি সত্যিই আসে! সামলাতে পারবে?'

সুমন ভাল্লা বলল, 'এইটা একটা কাজের কথা বলেছ। তোমার এই পয়লা নম্বর তুখোড় ছেলেকে সামলানো, সত্যিই মুশকিল! এই যে তোমায় বেঁধে রেখেছি, তোমার ছেলে হলে কী আর বেঁধে রাখতে পারতাম হ্যান্ডকাফ দিয়ে?'

তারপর বুড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'এটা নিশ্চয়ই তুমি জানো, তোমার ছেলে অপারেশন করে হাতের বুড়ো আঙুল দুটো ডিসকোলেট করে রেখেছিল? যাতে প্রয়োজনমতো বুড়ো আঙুলটা টানলেই হাতের মুঠোটা সরু আর ছোট হয়ে যায়। ওকে কে যেন বলেছিল, সেকালের ম্যাজিশিয়ান হুডিনি নাকি এইভাবেই হ্যান্ডকাফ খুলে বেরিয়ে আসতে পারত। আমাদেরও বলেছিল এই অপারেশনটা করাতে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব পেইনফুল, তাই গা করিনি।'

বুড়ি নিরুত্তাপ।

সুমন ভাল্লা বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এক্ষেত্রে তোমার ছেলেকে সামলানোর ব্যাপারে আমাদের একটা সুবিধে হল যে, সে জানে না যে আমরা তার খোঁজ পেয়ে গেছি। ও এখানে আচমকা এসে আমাদের দেখে নিজেকে সামলাতে না সামলাতেই, আমরা ওকে পেড়ে ফেলব। আর ওর প্রাণভোমরা ওর মা আমাদের কবজায়। যে মা ওর জন্যে সারাজীবন নাকি কত কষ্ট করেছে, যে-মায়ের জন্যে ন্যাকাটার সারাক্ষণ মন কাঁদে, যে মা-কে ছাড়া ও একদম থাকতে পারে না, সেই মা-কে আজ মৃত্যুমুখে দেখে আমাদের তিনশো কোটি টাকা নিশ্চয়ই ও ফিরিয়ে দেবে, কী বলো?'

বুড়ো-বুড়ি দুজনে দুজনার দিকে তাকায়। চুপ করে থাকে।

সুমন ভাল্লা মাথা নীচু করে অ্যালবামের পর অ্যালবামের পাতা উলটে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে নড়ে চলেছে।

সময় রাত এগারোটা।

সুমন ভাল্লার দুই সঙ্গী অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে। ঘরে দমবন্ধ করা অবস্থা। লোহার সোফার সঙ্গে একহাতে হ্যান্ডকাফ বাঁধা অবস্থায় বসে বুড়ো জোনাথন গোম্‌স জুলজুল করে দেখে চলেছে।

চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় বুড়ি মেরি গোম্‌স ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। সময় যেন আর কাটছে না।

এমন সময় তীব্র একটা আলো ঘরের মধ্যে ঝলসে উঠল। নীচের বাঁক থেকে একটা গাড়ি ওপরে উঠছে। তারই আলো বাংলোর মধ্যে এসে পড়েছে।

সুমন ভাল্লার এক শাগরেদ দরজার দিকে উঁকি মেরে বলে, 'বস! ওপরে একটা গাড়ি উঠছে। এটা নিশ্চয়ই সে।'

সুমন ভাল্লা চটপট পকেট থেকে রিভলভারটা বের করল। শাগরেদদের উদ্দেশে বলল, 'তোরা শিগগির একজন পাহাড়ের ঢালের আড়ালে, আরেকজন ওক গাছটার আড়ালে দাঁড়া। ঘরে ঢুকতে দিবি। ঘরে ঢুকলেই পেড়ে ফেলব।'

দুজন শাগরেদ বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

এবার সুমন ভাল্লা উঠে দাঁড়াল। তার কোল থেকে অ্যালবামগুলো মাটিতে পড়ে গেল।

অ্যালবাম থেকে একটা আলগা ছবি হঠাৎ ছিটকে পড়ে।

সেটা তুলে নিয়ে সুমন ভাল্লা কিছুক্ষণ কী যেন দেখে। তারপর হুড়মুড় করে ল্যাম্প স্ট্যান্ডটার দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে আলোয় খুঁটিয়ে ছবিটা দেখতে-দেখতে তার মুখটা হাঁ হয়ে যায়। দু-চোখে অবিশ্বাস এবং বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

একসময় সে মুখ তোলে। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে।

জোব্বায় ঢাকা বৃদ্ধ জোনাথন গোম্‌স তার ঠিক দেড় হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অবিকৃত অবস্থায় হ্যান্ডকাফটা লোহার চেয়ারের হাতলে ঝুলছে।

সুমন ভাল্লা চমকে ওঠার সময় পেল না। একটা হাত সজোরে তার কণ্ঠনালীর ওপরে আঘাত করল। সুমন বুঝতে পারল তার কণ্ঠনালী ভেঙে গেল। সে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারছে না।

পরক্ষণে সুমন টের পেল, ওর কিডনির ওপর সজোরে দুটো পাঞ্চ। জোব্বা পরা মানুষটা চরকির মতো ঘুরে গিয়ে ওর পিছনে এসে গেছে। সুমন বুঝল, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে ধীরে-ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে।

জোব্বা পরা মানুষটা এবার বিদ্যুৎগতিতে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে গেল এবং অন্ধকারে মিশে গেল।

সুমন ভাল্লার গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া কিছু বেরোচ্ছে না। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা।

মিনিট খানেকের মধ্যে জোব্বা পরা মানুষটা ঘরে ঢুকল। দ্রুত পায়ে টেবিল থেকে কেক কাটার ছুরিটা তুলে নিল। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারে বাঁধা মেরি গোম্‌স-এর দড়ি কেটে দিল।

বুড়ি বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার রিফ্লেক্স কমে যাচ্ছে! এত সময় লাগে?'

জোব্বা পরা মানুষটা সুমন ভাল্লাকে কাঁধে তুলে নিতে-নিতে বলল, 'এসে বলছি।'

তারপরেই নিমেষে ঘরের বাইরে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়। সুমনকে নিয়ে মানুষটা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকা সুমনদের কালো সুমো গাড়িটার কাছে আসে। দরজা খুলে সুমনকে ড্রাইভারের পাশের সিটটায় বসিয়ে দেয়।

সুমন মাথা ঘোরাতে পারছে না। চোখ ঘুরিয়ে দেখে, পিছনের সিটে তার দুই শাগরেদ আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে। সুমন ভাল্লার অভিজ্ঞ চোখ বুঝিয়ে দেয়, ওর দুই শাগরেদই আর বেঁচে নেই। সম্ভবত ঘাড় মটকে মারা গেছে।

জোব্বা পরা মানুষটা এবার একছুটে বাংলোর মধ্যে ঢুকে গেল। এবং খালি স্কচের বোতল নিয়ে তখনই বেরিয়ে এল।

এবার মানুষটা ড্রাইভার সিটে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিল। দ্রুত নীচে নামতে থাকে। গাড়ির স্পিড একটুও কমায় না।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে যখন গাড়িটা চেকপোস্টের কাছে আসে, মানুষটা একহাতে স্টিয়ারিং ধরে এবং অন্যহাতে স্কচের বোতলটা তুলে নেয়।

চেকপোস্টের বাইরে হেলান দিয়ে নেশাগ্রস্ত ছেদিলাল তখন ঘুমের চেষ্টা

করছে। এমন সময় সে দেখল, একটা গাড়ি বিদ্যুৎগতিতে পাহাড়ের গা দিয়ে নামছে।

পাহাড়ে এত জোরে গাড়ি চালানো ঠিক নয়। ছেদিলাল ভাবে, এ কার গাড়ি! আহাম্মকের মতো এত জোরে চালাচ্ছে! ভাবতে-ভাবতেই গাড়িটা গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে গেল। যেতে-যেতে স্কচের বোতলটা তার সামনে ছুড়ে দিয়ে গেল। বোতলটা সশব্দে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ছেদিলাল ঘুম ভুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে বলে উঠল, 'মরবি! মরবি শালা মাতাল।'

কয়েকমিনিট পরেই দেখা গেল, গাড়িটা চেকপোস্ট থেকে অনেকটা দূরে একটা বিশাল খাদের পাশে দাঁড়িয়ে। জোব্বা পরা মানুষটা সুমন ভাল্লাকে ড্রাইভিং সিটে টেনে এনে বসাল।

তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িটাকে ঠেলতে থাকে খাদের দিকে। গাড়িটা শূন্য স্পর্শ করার আগে জোব্বাপরা মানুষটা জানলা দিয়ে সুমনকে বলে, 'গুডবাই মন।'

গাড়িটা শূন্য স্পর্শ করে। সুমন ভাল্লা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত হয়। তাদের সন্ধান সার্থক হয়েছে। এ-নামে তাকে একজনই ডাকত।

এবার দেখা গেল জোব্বা পরা মানুষটা আর রাস্তা নয়, পাকদণ্ডি বেয়ে ধীরে-ধীরে উঠছে। অনেক নীচে শব্দ করে আছড়ে পড়েছে গাড়িটা। আগুন ধরে গেছে।

জোব্বা পরা মানুষটা অনেকক্ষণ পরে বাংলোয় এসে ঢোকে। এই শীতেও সে দরদর করে ঘামছে। সারা গা ধূলি-ধূসরিত। সে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। এক সময় স্নান করে বেরোয়। তার শরীরে এখন অন্য একটি জোব্বা।

বুড়ি গজগজ করছে, 'প্রায় একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। তোমার রিফ্লেক্স কমে যাচ্ছে। এত সময় লাগালে কেন আক্কেলে?'

জোব্বাপরা মানুষটা শান্তস্বরে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'এগারোটা অবধি তো এমনিই অপেক্ষা করতে হত। ডেয়ারির গাড়িটা পাস করা পর্যন্ত। আর মৃত্যুর কারণ যদি মদ খেয়ে জোরে গাড়ি চালানোর জন্য হয়, তবে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে পেটে যথেষ্ট পরিমাণে মদ থাকারও দরকার আছে।'

তারপর জোব্বা পরা মানুষটা মেঝেতে পড়ে থাকা ছবিটা হাতে নিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুমি বলো! তোমাকে এই ছবিটা কবে নষ্ট করে দিতে বলেছিলাম? আর একটু হলেই হয়েছিল।'

বুড়ি অপরাধীর মতো কাঁচুমাচু মুখ করে।

জোব্বাপরা মানুষটা ছবিটা ফায়ারপ্লেসের আগুনে ছুড়ে দিল। ছবিটা চিত হয়ে পুড়তে থাকে।

ছবিটা একটা সমাধির। যার ওপরের প্রস্তর ফলকে লেখা আছে, 'এখানে চিরশায়িত জোনাথন গোম্‌স।'

সঙ্গে সাল ও তারিখ। চার বছর আগের এক জুন মাসের।

বাইরে তখন ঝুপসি অন্ধকার। অজগর রাস্তাটা পাহাড়কে প্রায় গিলে ফেলেছে। বাতাস একঘেয়ে সুরে হেঁয়ালি শুনিয়েই যাচ্ছে।

মৃতপ্রায় পাহাড়টা প্রশ্ন করে, 'তুমি কিন্তু বললে না, কে আদি পাণ্ডব?'

বাতাস পাহাড়টার গায়ে হালকা ছোঁয়া দিয়ে বলে, 'আদি পাণ্ডবের নাম পুরু। যার বাবা অনন্তযৌবন ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তখন পুরু বাবার বার্ধক্য গ্রহণ করে নিজের যৌবন বাবাকে দিয়েছিলেন। পুরুর বাবার নাম যযাতি।'

বাংলোর ভিতরে জোব্বাপরা মানুষটা তখন কেক কাটছে। ঘড়িতে তখন রাত্রি বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

ফোকলা দাঁতে বুড়ি হেসে বলছে, 'বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে, ফ্রান্সিস...।'

গান

লাল ফিতে সাদা মোজা

(নীলাঞ্জনা ১)

লাল ফিতে সাদা মোজা স্কু-স্কুল ইউনিফর্ম
ন'টার সাইরেন সঙ্কেত; সিলেবাসে মনোযোগ কম
পড়া ফেলে একছুট—ছুট্টে রাস্তার মোড়ে,
দেখে—সাইরেন মিস করা দোকানিটা দেয়
ঘড়িতে দম
এরপর একরাশ কালো কালো ধোঁয়া
স্কুল বাসে করে তার দ্রুত চলে যাওয়া
এরপর বিষণ্ণ দিন বাজে না মনোবীণ
অবসাদে ঘিরে থাকা সে দীর্ঘ দিন
হাজার কবিতা বেকার সবই তা
তার কথা কেউ বলে না—
সে প্রথম প্রেম আমার
নীলাঞ্জনা।।

সন্ধ্যা ঘনাত যখন পাড়ায় পাড়ায়
রক থাকত ভরে কিছু বখাটে ছোঁড়ায়
হিন্দি গানের কলি সদ্য শেখা গালাগালি
একঘেয়ে হয়ে যেত সময় সময়
তখন উদাস মন ভোলে মনোরঞ্জন
দাম দিয়ে যন্ত্রণা কিনতে চায়
তখন নীলাঞ্জনা প্রেমিকের কল্পনা
ও মনের গভীরতা জানতে চায়
যখন খোলা চুলে
হয়তো মনের ভুলে

তাকাত সে অবহেলে দু-চোখ মেলে—
হাজার কবিতা বেকার সবই তা
তার কথা কেউ বলে না—
সে প্রথম প্রেম আমার
নীলাঞ্জনা।।
অঙ্কের খাতা ভরা থাকত আঁকায়
তার ছবি তার নাম পাতায় পাতায়
হাজার অনুষ্ঠান প্রভাতফেরির গান
মন দিন গোনে এই দিনের আশায়
রাত জেগে নাটকের মহড়ায় চঞ্চল
মন শুধু সে ক্ষণের প্রতীক্ষায় ·
রাত্রির আঙিনায় যদি খোলা জানলায়
একবার একবার যদি সে দাঁড়ায়
বোঝেনি অবুঝ মন
নীলাঞ্জনা তখন
নিজেতে ছিল মগন প্রাণপণ
হাজার কবিতা বেকার সবই তা
তার কথা কেউ বলে না—
সে প্রথম প্রেম আমার
নীলাঞ্জনা।।

দেখে যা অনির্বাণ

অনির্বাণ আমার বন্ধু। অনির্বাণের সাথে যখন
আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল তখন সময়টা ছিল
বড় অদ্ভুত।। আমরা হাইওয়ের ওপর দিয়ে অনেক দূরে
একটা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। লাল আকাশ সন্ধে হয়ে
আসছে দু-পাশে ফাঁকা মাঠ। আমরা চা খাব বলে
গাড়িটা দাঁড় করিয়েছি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটা চায়ের
দোকানে।। এমন সময় দেখতে পেলাম লাল আকাশকে
পেছনে রেখে মাঠ পেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে
আসছে।। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল,
'চিনতে পারছিস?'
আমি বললাম,—'না।।'
বলল,
'ভালো করে দ্যাখ।।'
আমি সেই চুরি যাওয়া আলোতে
ওকে চিনলাম। আমার বন্ধু অনির্বাণ। আমার চোখের
সামনে পুরোনো দিনগুলো ছায়াছবির মতো ভেসে উঠছে।
আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'অনির্বাণ তুই এখানে?'
ও বলল, 'তাই তো কথা ছিল বন্ধু, আমাদের তো
এখানেই থাকার কথা ছিল।' আমার পায়ের নীচ থেকে
মাটি সরে যাচ্ছে।। আমি খুব বোকার মতো ওকে প্রশ্ন করলাম—
'অনির্বাণ, কী করছিস এখন?' ও বলল, 'যা কথা ছিল বন্ধু,
মানুষের মাঝখানেই আছি।।
আমি দাঁড়িতে থাকতে পারছি না, একটা অপরাধ বোধ
আমাকে গ্রাস করছে।। ও বলল—'তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।।'
আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম।। ও জানলার কাছে এসে

বলল 'এখন তো তোর নাম হয়ে গ্যাছে, তুই তো
বিখ্যাত হয়ে গেছিস, সুখেই আছিস—কী বল!'
আমার গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে, অনির্বাণ আমার
জীবন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, অনির্বাণের শেষ কথাগুলো
আজও আমার কানে আলপিনের মতো বেঁধে—
'সুখেই আছিস!' 'সুখেই আছিস!'

দেখে যা, যা, অনির্বাণ
কী সুখে রয়েছে প্রাণ
কী সুখে রয়েছি আমি
কী সুখে বেচেছি গান।।

সেদিনের মিটিঙের মাইক
সেদিনের কলেজের স্ট্রাইক
সেদিনের মাতাল পদক্ষেপ
বেঠিক সিদ্ধান্তের আক্ষেপ
আজকের এই মাপা পদচারণ
সেদিনের তালের কাছে ম্লান
দেখে যা যা অনির্বাণ
কী সুখে রয়েছে প্রাণ।।

শ্রমিকের মুক্তির গান
শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন
আজ তোর ঘামে
হয়তো সেথায় আমার হোতো স্থান
দেখে যা যা অনির্বাণ
কী সুখে রয়েছে প্রাণ।।

কৃষকের হাতিয়ারে শান
ঘৃণার প্রতিপালনেতে যত্ন
ভেজে যে পথের ধুলো

কোনো এক উলটোরাজা

কোনো এক উলটো রাজা উলটো বুঝলি প্রজার দেশে
চলে সব উলটো পথে উলটো রথে উলটো বেশে
সোজা পথ পড়ে পায়ে সোজাপথে কেউ চলে না
বাঁকা পথ জ্যাম হরদম জমজমাট ভিড় কমে না

(সে দেশে) করে পাশ এমএ, বিএ,
কেরানির জীবনযাপন
রাজনীতি করলে রে ভাই ডিগ্রির কী প্রয়োজন
জনগণ তুলে দেবে তোমার হাতেই দেশের শাসন
(সে দেশে) অর্থের কারচুপিতে সিদ্ধ যিনি অর্থমন্ত্রী
দেশের শত্রুমাঝে প্রধান যিনি প্রধানমন্ত্রী
(সে দেশে) ধার করে ভাই শোধে রাজা ধারের টাকা
মরে ভূত হল মানুষ লোকদেখানো বদ্যি ডাকা
(সে দেশে) অবহেলায় যখন ফোকলা সংস্কৃতির মাড়ি
বিদেশি চ্যানেল তখন পৌঁছে যে যায় বাড়ি বাড়ি
আনন্দ কী আনন্দ এসে গেছে কোকাকোলা
গেছে সব দেনার দায়ে বাকি আছে কাপড় খোলা
পায় না খেতে যারা গাইত খেয়াল টপ্পা ঝানু
গেয়ে গান হচ্ছে ধনী রাম-শ্যাম আর কুমার পানু।।

পারে না ধরতে পুলিশ সত্যি অপরাধী
যারা বাড়ছে সুখে
নিরীহ প্রেমিক-প্রেমিকাদের ধরে নিচ্ছে টাকা
লেকের ধারে পুজোর মুখে
এদিকে ধর্ম ধর্ম ধর্ম নিয়ে চলছে বাওয়াল

ধর্মকে তোয়াজ করে সব শালারাই সাদা বা লাল
রাজা দেয় প্রতিশ্রুতি হ্যান করেগা ত্যান করেগা
করেগা কচু আসলে ব্যাটা পকেট ভরেগা
এতো এক উলটোদেশের গল্প শুনলে এতক্ষণ
যদি কেউ এমন দেশের সন্ধান পাও তখন
জানিয়ে দিয়ো আমায় বলব সেই দেশের কথা
ঠিকানা আমার C/o ফুটপাথ নচিকেতা।।

যেদিন তুমি ভালোবেসেছিলে নিঃস্বার্থ

(পৌলমী)

যেদিন তুমি ভালোবেসেছিলে নিঃস্বার্থ
যেদিন তোমার বাবা আমায় বলেছিল অপদার্থ
যেদিন পেতেছিলাম সংসার করে স্বাক্ষর
যেদিন ভেঙেছিলাম সংসার করেই স্বাক্ষর
দিনগুলো পড়ে মনে
একলা নির্জনে
মনে হয় এই তো পাশে রয়েছ তুমি।।
ও পৌলমী——

প্রথম দেখা হয়েছিল কলেজ ক্যান্টিনে
প্রথম চুমু খাওয়া সেই ঝড় জলের দিনে
এরপর সিদ্ধান্ত করতেই হবে বিয়ে
চাকরির খোঁজে সারা পিঠে ডিগ্রির বোঝা নিয়ে
সকাল সন্ধে প্রাইভেট টিউশন
এর ফাঁকে দুজনের লুকিয়ে আলাপন
ইডেন স্বদেশভূমি।।
ও পৌলমী——

তোমার বাবা চাইত জামাই হবে কোনও ডাক্তার
নয়তো ওনাদেরই মতো কোনও ধনী ব্যাবসাদার
পেলাম আমি চাকরি ছোট্ট হাওড়ার জুটমিলে
করতে আমায় বিয়ে সবাইকে বিদায় দিলে
এরপর বেহালায় এক কামরার সংসার

সুখে দুখে ভালো মন্দে একাকার
দুজন আমি আর তুমি।।
ও পৌলমী——

এরপর একদিন হল লক আউট আমার কারখানা
তোমার বাবা এসে দিলেন আমাদের সান্ত্বনা
নিয়ে গেল তোমায় কিছু দিনের জন্যে বলে
সত্যি তুমি চাওনি তবু যেতেই হল চলে
একদিন এল চিঠি ডিভোর্স তুমি চাইলে
আদালতে আমায় দেখে নীরব হয়েই রইলে
এরপর একা হয়ে আমার পথ চলা
সময় গেল বয়ে এল গোধূলিবেলা
জানি না কোথায় তুমি।।
ও পৌলমী——

বারোটায় অফিস আসি

(সরকারি কর্মচারী)

বারোটায় অফিস আসি দুটোয় টিফিন
তিনটেয় যদি দেখি সিগনাল গ্রিন
চটিটা গলিয়ে পায়ে নিপাট নির্দ্বিধায়
চেয়ারটা কোনও মতে ছাড়ি
কোনও কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে
চারটেয় চলে আসি বাড়ি
আমি সরকারি কর্মচারী আমি সরকারি কর্মচারী।।

আমি অফিসেতে বসে বসে আনন্দলোক পড়ি
টাডা থেকে ছাড়া পেল সঞ্জয়
আর টেবিলেতে আমার ফাইল এসে জমে জমে
দূর থেকে মনে হয় হিমালয়
হপ্তায় হপ্তায় আন্দোলনের ঠেলা ডিএ টিএ বাড়ানোর জন্য
আর এরই মাঝে মাসে যদি একদিনও কাজ করি
অফিসটা হয়ে যায় ধন্য
কারও ফাইল পাশ করে নির্লজ্জের মতো হাতখানা পেতে দিতে পারি
আমি সরকারি কর্মচারী আমি সরকারি কর্মচারী।।

(মা—মাগো—জগজ্জননী অন্নদায়িনী মা আমার—
রক্ষা করো)—মন্তব্য
ঘুষ আমার ধর্ম ঘুষ আমার কর্ম
ঘুষ নিতে কী সংশয়
প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া এই দেশে অপরাধ

ঘুষ খাওয়া কখনওই নয়
তাই কারও ফাইল পাশ করে নির্লজ্জের মতো
হাতখানা পেতে দিতে পারি
আমি সরকারি কর্মচারী আমি সরকারি কর্মচারী।।

রাজশ্রী তোমার জন্য

(রাজশ্রী ১)

রাজশ্রী তোমার জন্য মুদ্রাস্ফীতি অস্ট্রেলিয়ায়
রাজশ্রী তোমার জন্য দুর্ঘটনা সোমালিয়ায়
বাড়ল সিগারেটের দাম
তছরুপের দায়ে সুখরাম
রাজশ্রী তোমার জন্য ওঠে সূর্য
চাঁদ ডুবে যায়
রাজশ্রী রাজশ্রী রাজশ্রী তোমার জন্য।।

রকে বসা কত যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায়
রাজশ্রী তোমার কথা ক্লিন্টন ভাবে আমেরিকায়
সুপার মেগাস্টার অমিতাভ গিটার হাতে নিতে চায়
নিয়ম করে স্নানের ঘরে জীবনমুখী গান গায়
দেশটা যায় রসাতলে
বেত্রবতী বানের জলে
আর প্রধানমন্ত্রী চুরির দায়ে
রাজশ্রী রাজশ্রী রাজশ্রী তোমার জন্য।।

তোমার কথায় সুচিত্রা সেন ফিল্মে আবার আসতে চায়
ছাড়া পেয়ে চার্লস শোভরাজ পৌরসভার ভোটে দাঁড়ায়
তোমার কথায় নদী আপন বেগে পাগল পারা
টাটা এবং বিড়লা সাহেব হতে চান সর্বহারা
সিবিআই-এর মাথারা সব
তোমার ছবি বুকে গুঁজে

হরিনামের মতো বলে
তোমার নাম দু'চোখ বুজে
টি. এন. শেষণ গান গায়
রাজশ্রী রাজশ্রী রাজশ্রী তোমার জন্য।।

জনতা জনার্দন

(জীবিত বিবাহিত)

জনতা জনার্দন শুনে হবেন বড় প্রীত
পুরুষ মানুষ দু-প্রকার
জীবিত বিবাহিত
পুরুষ মানুষ বেঁচে থাকে
বিয়ে করার আগে গো
বিবাহিত মানে প্রকারান্তরেতে মৃত
পুরুষ মানুষ দু-প্রকার
জীবিত বিবাহিত

জীবিত আছেন তারা হয়নি যাদের বিয়ে
মাঝে মাঝে ভাবি থাকি ওদের কাছে গিয়ে
কত সুখে আছেন ওরা লাগিয়ে গায়ে হাওয়া
হয়নি দিল্লির এই লাড্ডু যাদের খাওয়া
যিনি দাঁড়িয়ে ছাদনাতলায় পরেছেন মালা গলায়
সে মালা বকলস তিনি সারমেয়র মতো
এ কথা বুঝবেন যিনি আছেন আমার মতো
পুরুষ মানুষ দু-প্রকার—জীবিত বিবাহিত
ভালোবাসা সুখের ঘর কত প্রলোভন
আসলে কানার নাম পদ্মলোচন

ভুলোনা শুনে বিয়ের সানাই বাদন
বিয়ে হল বলির আগের ছোট্ট আয়োজন
যিনি বিয়ে করে বলেন—সুখী

স্ত্রী আমার চন্দ্রমুখী
সে কথা আমার কানে শোনায় গুলের মতো
এ কথা বুঝবেন যিনি আছেন আমার মতো
পুরুষ মানুষ দু-প্রকার
জীবিত বিবাহিত।

ছেলে আমার মস্ত মানুষ

(বৃদ্ধাশ্রম)

ছেলে আমার মস্ত মানুষ—মস্ত অফিসার
মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ওপার
নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি
সবচে কম দামি ছিলাম একমাত্র আমি
ছেলের আমার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম।

আমার ব্যবহারের সেই আলমারি আর আয়না
ও সব নাকি বেশ পুরোনো—ফ্ল্যাটে রাখা যায় না
ওর বাবার ছবি-ঘড়ি-ছড়ি
বিদেয় হল তাড়াতাড়ি
ছেড়ে দিলো—কাকে খেলো
পোষা বুড়ো ময়না
স্বামী-স্ত্রী আর অ্যালসেশিয়ান
জায়গা বড়ই কম
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম।

নিজের হাতে ভাত খেতে পারতো না কো খোকা
বলতাম 'আমি না থাকলে রে কী করবি বোকা!'
ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদত খোকা আমার কথা শুনে
খোকা বোধহয় আর কাঁদে না নেই বুঝি আর মনে
ছোট্টবেলায় স্বপ্ন দেখে উঠত খোকা কেঁদে
দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে রেখে দিতাম বেঁধে

দু-হাত আজও খোঁজে
ভুলে যায় যে একদম
আমার ঠিকানা এখন বৃদ্ধাশ্রম।

খোকারও হয়েছে ছেলে দু-বছর হল
আর তো মাত্র বছর পঁচিশ—ঠাকুর মুখ তোলো
একশো বছর বাঁচতে চাই এখন আমার ষাট
পঁচিশ বছর পরে খোকার হবে ঊনষাট
আশ্রমের এই ঘরটা ছোট—জায়গা অনেক বেশি
খোকা আমি দুজনেতে থাকব পাশাপাশি
সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি ভীষণ রকম
মুখোমুখি আমি খোকা আর বৃদ্ধাশ্রম।

তুমি আসবে বলেই

তুমি আসবে বলেই আকাশ মেঘলা
বৃষ্টি এখনো হয়নি
তুমি আসবে বলেই কৃষ্ণচূড়ার
ফুলগুলো ঝরে যায়নি
তুমি আসবে বলেই—
তুমি আসবে বলেই অন্ধ কানাই
বসে আছে, গান গায়নি
তুমি আসবে বলেই চৌরাস্তার পুলিশটা ঘুষ খায়নি।

তুমি আসবে বলেই জাকির হুসেন
ভুল করে ফেলে তালে
তুমি আসবে বলেই মুখ্যমন্ত্রী চুমু খেলো স্ত্রীর গালে
তুমি আসবে বলেই সোনালি স্বপ্ন ভিড় করে আসে চোখে
তুমি আসবে বলেই আগামী বলছে দেখতে আসব তোকে
তুমি আসবে বলেই
তুমি আসবে বলেই আমার দ্বিধারা উত্তর খুঁজে পায়নি
তুমি আসবে বলেই দেশটা এখনো
গুজরাট হয়ে যায়নি।
তুমি আসবে বলেই সন্ত্রাসবাদ
গুটিয়ে নিয়েছে থাবা
তুমি আসবে বলেই জ্যোতিষ ছেড়েছে
কত না ভণ্ড বাবা
তুমি আসবে বলেই পাড়ার মেয়েরা
মুখ করে আছে ভার
তুমি আসবে বলেই ঈশান কোণেতে জমেছে অন্ধকার

তুমি আসবে বলেই
তুমি আসবে বলেই বখাটে ছেলেটা
শিস দিতে দিতে দেয়নি
তুমি আসবে বলেই আমার কলম
এখনো বিক্রি হয়নি।

ও ডাক্তার

ও ডাক্তার ও ডাক্তার
তুমি কতশত পাশ করে, এসেছ বিলেত ঘুরে
মানুষের যন্ত্রণা ভোলাতে
ও ডাক্তার...
তোমার এমবিবিএস না না
এফআরসিএস বোধহয়
এ টু জেড ডিগ্রিটা ঝোলাতে
ও ডাক্তার...

ডাক্তার মানে সে তো মানুষ নয়
আমাদের চোখে সে তো ভগবান
কসাই আর ডাক্তার একই তো নয়
কিন্তু দুটোই আজ প্রফেশন
কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দিবালোকে
তোমার আছে ক্লিনিক আর চেম্বার
ও ডাক্তার...

ডাক্তার চাইবেন রক্ত রিপোর্ট
ক্লিনিকের সন্ধানও তিনিই দেবেন
একশত টাকা যদি ক্লিনিকের বিল হয়
অর্ধেক দালালি তিনিই নেবেন
রোগীরা তো রোগী নয়, খদ্দের এখন
খদ্দের পাঠালেই কমিশন
ক্লিনিক আর ডাক্তার কি টুপি পরাচ্ছে
বুঝবে না গর্দভ জনগণ

কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দিবালোকে
ওদের আছে ক্লিনিক আর চেম্বার
ও ডাক্তার...

নিজেদের ডাক্তার বলো কেন?
তার চেয়ে বলোনাকো ব্ল্যাকমেলার
রোগীর আত্মীয়দের ঘটি বাটি চাটি করে
করো সুযোগের সদ্ব্যবহার
সরকারি হাসপাতালের পরিবেশ
আসলে তো তোমরাই করছ শেষ
হাসপাতাল না থাকলেই জনগণ
নার্সিংহোমে যাবে অবশেষ
সেখানে জবাই হবে উপরি কামাই হবে
মানুষের সেবার কী দরকার
ও ডাক্তার...

বাঁচানোর ক্ষমতা তো তোমারই হাতে
তুমি যদি মারো তবে কোথা যাই
অসহায় মানুষের তুমিই তো সবকিছু
করজোড়ে নিবেদন করছি তাই
তোমার গৃহিনী যে গয়না পরেন
দেখেছ কি তাতে কত রক্ত
তোমার ছেলের চোখে দেখেছ কি
কত ঘৃণা জমা অব্যক্ত
তোমারও অসুখ হবে তোমারই দেখানো পথে
যদি তোমাকেই দ্যাখে কোনও ডাক্তার।
ও ডাক্তার...

আদিত্য সেন

আদিত্য সেন এক রাজনীতিবিদ
কলোনির ঘরে যার বাস
আদিত্য সেন এক সৎ মানুষ
আধপেটা খেয়ে বারোমাস
আদিত্য সেন পিঠ সোজা রাখেন
পার্টির হোলটাইমার
আধপেটা খেয়ে থাকবেন তবু
মুদির দোকানে নেই ধার
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
সূর্যের মতো যার ধার
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
আজ প্রয়োজন বড় আপনার।।
আদিত্য সেন ভাঙে প্রোমোটার রাজ
আদিত্য পুকুর বাঁচায়
আদিত্য সেন যেন স্বয়ং লেনিন
বিপদকে আঙুলে নাচায়
আদিত্য সেন বলে স্পষ্ট কথা
তত্ত্বের কী বা প্রয়োজন
মানুষের প্রয়োজনে যিনিই দাঁড়ান
তার আগে কি তত্ত্ব কথন
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
সূর্যের মতো যার ধার
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
আজ প্রয়োজন বড় আপনার।।
আদিত্য সেন লাল স্বপ্ন দ্যাখেন

সকলের সমান অধিকার
আদিত্য মানুষের খিদের শমন
যার ঘরেতে ঘোর অনাহার
আদিত্য তার শিশু সন্তানকে
লেনিনের গল্প শোনান
'উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে'
দৃঢ়তার সাথে তিনি গান
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
সূর্যের মতো যার ধার
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
আজ প্রয়োজন বড় আপনার।।

ওই যে দূরে যাকে দেখছো বসে
পাত্র হাতে ভিক্ষার
বহিষ্কৃত তিনি পার্টি থেকে
আদিত্য সেন নাম তার
অনেক অনেক টাকা তছরুপের
অভিযোগ তার মাথায়
তবে কেন আদিত্য ভিক্ষা করেন
পাঁচ বছর আমার পাড়ায়
রাজনীতি করতেন তার সাথে যারা
বাড়ি গাড়ি করে তারা সৎ
রাজনীতিতে নেই সততার ঠাঁই
একথার নেইকো দ্বিমত
তবু আদিত্য ভুলিনি কিছুই
আমরা প্রতীক্ষায়
এই নপুংসকের রাজনীতি ছিঁড়ে
কবে আপনার হবে উদয়
আদিত্য সেন আদিত্য সেন
সূর্যের মতো যার ধার
আদিত্য সেন আসুন ফিরে
আজ প্রয়োজন বড় আপনার।।

আমার সোনা

আমার সোনা চাঁদের কণা আর কী কী বলব
ডাক্তার উকিল তো নয় তোকে মন্ত্রী বানাবো
মন্ত্রী বানাবো রে তোকে মন্ত্রী বানাবো
তারপরে চারপুরুষ বসে বসে খাব

মন্ত্রীর ছেলে হলে শিল্পপতি হওয়া যায়
মন্ত্রীর বাবা হয়ে গোটা দেশটা চালাব
গোটা দেশটা চালাব রে শিল্পপতি কি হবো
একদিন তোর মা ছাড়া সবার পতি হবো

মন্ত্রী হওয়া সোজা সবচে মন্ত্রী হওয়া সোজা
পড়াশোনার বালাই নেই শুধু ফন্দিফিকির খোঁজা
আহা মন্ত্রী হওয়া সোজা
মন্ত্রী হলেই আমলারা তোর করে দেবে কাজ
তোর কাজ শুধু ধরা জনদরদীর সাজ
এসব আগের থেকেই রিহার্সাল করে রাখবো
দরকার হলে প্রাইভেট টিউটর এক্স মন্ত্রী রাখবো
চুরি করনা করনা চুরি করনা অগুন্তি
পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির পরেও কেউ হয় রেলমন্ত্রী
কী আর হবে বড়জোর বসবে কমিশন
সবাই জানি সে কমিশনের নেই কনক্লিউশন
ওরে গালাগালি একটু না হয় খাবি তাতে কী
ওরে মরা মানুষের চুল ছিঁড়লে ওজন কমে কি